সমকালীন
সমস্যা ও সমাধান

সমকালীন
সমস্যা ও সমাধান

মো. রুহুল আমীন

সমকালীন সমস্যা ও সমাধান
মো. রুহুল আমীন
প্রকাশকাল : অমর একুশে বইমেলা-২০২৩
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
বর্ণ বিন্যাস : ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ৪০০/- (চারশত) টাকা
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৩৭৮-০-৬
ISBN: 978-984-96378-0-6

Somokalin Somossa O Somadhan By Md. Ruhul Amin, Published by Chayyanir.Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900.Date of Publication: Amor Ekushey Boimela-2023, Copy Right: writer; Cover design: Tarunnya Tauhid, Book Setup: Chayyanir Computer, Price: TK. 400/- (Four Hundred Only) ; ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : ০১৬১১-৯১৩২১৪

উৎসর্গ

আমার পরলোকগত পিতা মো. মতিউর রহমান ও মাতা মোসা. রোকেয়া খাতুনের বিদেহী পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনায়
এবং
আমার প্রাণের স্পন্দন সন্তান
মো. আমীন শাহ্‌রিয়ার (তাজরিয়ান) ও তানজিলা তাবাস্‌সুম (অনন্যা) কে
স্নেহ আশির্বাদ স্বরূপ।

কিছু কথা

'সমকালীন সমস্যা ও সমাধান' গ্রন্থে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটি বিভিন্ন পত্রিকার একক সংখ্যায় ও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ লেখাসমূহের উদ্দেশ্য হলো- স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সকলকে উৎসাহী করা। একই সাথে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও কল্যাণে সুদূরপ্রসারী ফল লাভ করা। পেশাগতভাবে আমি প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে জড়িত। বইটিতে 'অন্য রকম বীমা' নামে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমানে 'ট্রাফিক জ্যাম' একটি গুরুতর জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এ সমস্যায় অপচয় হচ্ছে সময় ও শ্রমঘণ্টা। ট্রাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণে কিছু বাস্তবমুখী সুপারিশ করা হয়েছে। তেমনি একটি গুরুতর সমস্যা সড়ক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে যেমন মানুষ হতাহত হয়, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যানবাহন। আর সন্ত্রাসের কারণে জিম্মি হয়ে পড়ছে সংসার সমাজ ও রাষ্ট্র। প্রতিবছর ভয়াবহ অগিকাণ্ডে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে অনেকের জীবন হয় দুর্বিষহ। আর অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভুত হয় মূল্যবান সম্পদ। তেমনি সন্ত্রাসের দ্বারা এক বা বহু মানুষের মূল্যবান জীবন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। এ সকল বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে মানুষের চিন্তাচেতনা বিকারশূন্য-এ যেন নিয়তি। কথায় বলে- সাবধানের মার নেই, একটু সাবধান হলে বর্ণিত সমস্যাগুলোর সমাধান, প্রতিরোধ ও প্রতিকার কঠিন কাজ নয়। আমি সমস্যাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছি, জাপান সফরে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যাগুলোর বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছি এবং সেসব প্রতিরোধ প্রতিকার ও সমাধানের প্রস্তাব ও সুপারিশ করেছি। আমার বিশ্বাস, আমার লেখাগুলো চিন্তাশীল লেখক-গবেষক সমাজতাত্ত্বিকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে এবং শান্তি উন্নয়ন ও কল্যাণকামী সমাজকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করবে। উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানে, প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সরকার, সেবাধর্মী সংস্থা, সংগঠন ও নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মীগণ যথাযথ পদক্ষেপ নিলে সমাধান হবে। দেশ ও সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। সর্বত্র শান্তি সুষমায় ভরে যাবে। আর এলক্ষ্যে ২০১৪ খ্রি. এ বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে পাঠকের চাহিদা এবং আরও কিছু সমস্যা ও সে সবের সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করে বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। বইটির কোনো কোনো আর্টিকেলে জানুয়ারি-২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ এবং এতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহের বিষয়ে পাঠকের বিজ্ঞ মতামত সাদরে গ্রহণযোগ্য।

সমকালীন সমস্যা ও সমাধান বইটির তৃতীয় সংস্করণ বইমেলা ২০২১ উপলক্ষে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও মহামারি করনার কারণে কাঙ্ক্ষিত সময়ের পরিবর্তে বর্তমানে বইটি প্রকাশ করা হলো।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং---পৃষ্ঠা
১। অন্যরকম বীমা # ১১
২। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে জরুরী করণীয় # ২০
৩। টাঙ্গাইল শহরে যানজট নিরসনের নিমিত্ত কিছু সুপারিশ # ২২
৪। টাঙ্গাইল শহরকে উন্নত শহরে রূপান্তরে কিছু সুপারিশ # ২৭
৫। রাজধানীতে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান এবং জাতীয় উন্নয়ন # ৩৮
৬। রূপান্তরযোগ্য সম্পদ ময়লা আবর্জনা # ৪০
৭। জলাবদ্ধতা নিরসন # ৪৫
৮। নগর উন্নয়নে খাল নদীর গুরুত্ব # ৫১
৯। ফেরীঘাটে সৃষ্ট যানজট নিয়ন্ত্রণ # ৫৪
১০। সড়ক-মহাসড়কে যানজটের কারণ ও যানজট সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ # ৫৭
১১। সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার # ৭৪
১২। একটি সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্লেষণ # ৯২
১৩। সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকারের আরো কিছু সুপারিশ # ৯৪
১৪। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে যানবাহনের চালককে পুরস্কৃতকরণ # ৯৬
১৫। দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন উদ্ধার # ৯৬
১৬। সড়ক পরিহন আইন-২০১৮ # ৯৭
১৭। অগ্নিকাণ্ডের কারণ প্রতিরোধ ও প্রতিকার # ৯৯
১৮। সন্ত্রাস দমনে করণীয় # ১৩২

অন্যরকম বীমা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের যে কোন দেশেরই মোট জনসংখ্যার ১৫% প্রতিবন্ধী। সে পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশেরও ১৫% মানুষ কোন না কোন ভাবে প্রতিবন্ধী। এ হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ২.৪৭ কোটি। কিন্তু সাম্প্রতিকালের প্রতিবন্ধী জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১৬,১৬,১৯০ জন। এদের মধ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ১৫.১০ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ডাক্তার কর্তৃক শনাক্ত সম্পন্ন করে তাদের তথ্যাদি Disabilty information system এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।এ জরিপ অনুযায়ী প্রতিবন্ধীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১% (প্রায়)। যা সাধারণ হিসাব অপেক্ষা অনেক কম, এটা আশাব্যঞ্জক। কারণ প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তার চেয়ে অনেক কম ব্যয়েও বেশি পরিধিবিশিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ ও অনেক কম সময়েই দেশের সমগ্র প্রতিবন্ধী সেক্টরের উন্নয়নের জন্য পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। প্রতিবন্ধীদের কেউ জন্মগত, কেউ অপুষ্টি ও বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক ব্যাধির কারণে, কেউ অচিকিৎসা, অপচিকিৎসা, দুর্ঘটনা, সন্ত্রাস, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিনিয়তই প্রতিবন্ধিত্বের শিকার হচ্ছে। এদের কেউ অন্ধ, কেউ মূক-বধির, কেউ বা বিকলাঙ্গ, আবার কারও ঘটেছে অঙ্গহানি। পূর্বে শারীরিক অপূর্ণতার কারণে এদেরকে কর্মজীবী মানুষের সমপর্যায়ের গণ্য করা হতো না। ফলে এরা সাধারণত কোনো পেশায় নিয়োজিত হতে পারতো না। এরা অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করে অথবা কোনো দাতা সংগঠনের উপর নির্ভর করে অথবা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তাই প্রতিবন্ধীদেরকে একসময় সামাজিক পরগাছা হিসেবে গণ্য করা হতো। এরা ছিল সমাজের সর্বাপেক্ষা অসহায়, অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। অথচ মানুষ হিসেবে তাদের অন্য দশজনের মতো সমাজে মূল্যায়ন করা অন্য সকলের কতর্ব্য। প্রতিবন্ধীদের একদিকে অন্যের বোঝা হয়ে থাকার কারণে ও এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কোনো উৎপাদনমূলক দক্ষতা না থাকার কারণে এ দেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত। ফলে সামাজিক উন্নয়ন বিঘ্নিত হত। সর্বস্তরের মানুষকে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত করে সমাজ থেকে সামাজিক পরগাছার অভিশাপ দূর করার লক্ষ্যে মানুষকে প্রতিবন্ধীত্বের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধীদের উপর বিদেশে অনেক গবেষণা হয়। সেই গবেষণালব্ধ ফল থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, যথার্থ প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদেরকে অন্য দশজন সাধারণ সুস্থ সবল মানুষের মতো কর্মক্ষম করে তোলা সম্ভব। এলক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। সেই সাথে শুরু হয় প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক শিক্ষা প্রদানের প্রক্রিয়া। ৬০-৭০ বৎসর পূর্বে এদেশেও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে অন্ধদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত

হয়। তবে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের আধুনিকায়ন ও বিস্তৃতি ঘটে ১৯৮০'র দশকে। এই কার্যক্রমের ফলেই বর্তমানে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বহু সংখ্যক প্রতিবন্ধী শ্রমিক ও দক্ষ শ্রমিকের পদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। প্রতিবন্ধীদের এই পুনর্বাসন কার্যক্রমকে সার্বিক ভাবে সফল করার জন্য আমাদের মন-মানসিকতারও পরিবর্তন করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধীরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কেউ নয়। তারা আমাদের কারও ভাই-বোন, কারও বা সন্তান আবার কারও বা নিকট আত্মীয়। সুতরাং সমাজের অন্য দশজন মানুষের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ আছে, প্রতিবন্ধীদের প্রতিও তদ্রূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা আবশ্যক। একজন মানুষ যে সব সামাজিক সুবিধা ভোগ করেন, একজন প্রতিবন্ধীও সে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার রাখে। প্রতিবন্ধীদেরকে তাদের পূর্ণ অধিকার প্রদান ও সেই অধিকার বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন তাদের ভিতর সচেতনতা সৃষ্টি করা। যাতে তারা অন্য কারও দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে ঘৃণা করে। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের এই অবহেলিত অবিচ্ছিন্ন অংশটিকে সুশিক্ষার সুযোগ দেয়া। শিক্ষার মাধ্যমে ও প্রতিবন্ধীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে এই বিষয়টি বাস্তবায়ন হতে পারে। আমি জাপানে অবস্থান করার সময় একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী প্রতিবন্ধীর সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। যিনি ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ গ্রাজুয়েশন করেছেন। সেই ভদ্রলোকের সাথে পরিচিত হয়ে একটি বিষয় আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যদি আমরা উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে পারি, তাহলে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের পক্ষেও সম্ভব যে কোন শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। তাছাড়া প্রতিবন্ধীদের সমাজে পুনর্বাসন করার নিমিত্ত প্রয়োজন তাদের কারিগরি শিক্ষাদানসহ চাকুরীর ব্যবস্থা করা। এই কার্যক্রমের জন্য দরকার উপযুক্ত সংখ্যক ভকেশনাল ট্রেনিং এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা। প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে সরকারী পর্যায়ে যে সকল কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে তাদের বিবরণ উল্লেখ করা হল- গাজীপুর জেলার টংগীতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ই.আর.সি.পি.এইচ.), আসন সংখ্যা- ৮৫ ও ভর্তির জন্য প্রতিবন্ধীদের বয়স ১৫-২৫ বছর। এ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের শাখা ৫টি যথা- মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, আসন-৩০, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছর। দর্জি বিদ্যা প্রশিক্ষণ শাখা, আসন- ২৫, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছর। কাষ্ঠ প্রশিক্ষণ শাখা, আসন- ১০, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছর। খামার শাখা, আসন- ১০, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ মাস। নার্সারী শাখা, আসন- ১০, প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ মাস। শিক্ষাগত যোগ্যতা কারিগরি বিষয় অনুযায়ী কোন কোন শাখায় নূন্যতম ৫ম শ্রেনি পর্যন্ত চাওয়া হয়। মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে প্রতিবন্ধীগণ লেদ, মিলিং, সেপার মেশিনে ও ওয়েল্ডিং পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধাতব ও অধাতব কারিগরি দ্রব্য তৈরী করা এতদ্বসংশ্লিষ্ট অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। দর্জিবিদ্যা প্রশিক্ষণ শাখায় সব ধরনের জামা-কাপড় এবং কাপড়ের তৈরী অন্যান্য উপকরণাদী ও কাপড়ে অলংকরণ করার

প্রশিক্ষণ পায় এবং গার্মেন্টস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কাষ্ট প্রশিক্ষণ শাখায় চেয়ার, টেবিল বানানো থেকে গৃহ সজ্জার বিভিন্ন কাঠের উপাদান বানানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। খামার শাখায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগী পালন ও বাজারজাতকরণ শেখানো হয়। নার্সারী শাখায় গাছপালা রোপন, পরিচর্যা করা ও বাণিজ্যিকভাবে ফুলের চাষ করা শেখানো হয়। বর্তমানে বর্ণিত শাখাসমূহ ছাড়াও ব্যবসা করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ, টেলিফোন রিসেপসনিস্ট কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রের একটি উপকেন্দ্র- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের গ্রামীণ পুনর্বাসন কেন্দ্র (আর.আর.সি) বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় অবস্থিত, এর আসন সংখ্যা- ৩০। এ কেন্দ্রের ৩টি প্রশিক্ষণ শাখা যথা- মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, দর্জিবিদ্যা প্রশিক্ষণ শাখা এবং গবাদীপশু ও হাঁস মুরগীর খামার শাখায় (প্রত্যেক শাখায় ১০টি আসন) ১ বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ই.আর.সি.পি.এইচ কেন্দ্রের একই ক্যাম্পাসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতীয় অন্ধ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টি.আর.সি.বি, আসন- ৩০) প্রতিষ্ঠিত। এখানে ৬ মাস মেয়াদী ২টি শাখায় যথা মোবিলিটি, বাঁশবেত শাখায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীগণ চলাফেরা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং বাঁশবেতের দ্বারা আসবাবপত্র ও গৃহস্থালীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদী বানানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীগণ সম্ভাব্য অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। উপরোক্ত ৩টি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারিগণ জনপ্রতি ৪০০০/- করে পুনর্বাসন ভাতা পায়। আবার পুনর্বাসন সার্ভিসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারিগণের জন্য বিভিন্ন মিল-ফ্যাক্টরীতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। এই কেন্দ্রর অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্রেইল প্রেসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল বই মুদ্রণ করা হয় ও প্রেস থেকে সারা দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪টি অন্ধদের সাধারণ স্কুলে (৬৪০ আসন) ১ম থেকে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত ব্রেইল বইসমূহ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। একই ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্রে কৃত্রিম পা, হাত উৎপাদন করা হয়। এই কেন্দ্রে ক্রাচ, প্রোচ, সার্ভিক্যাল কলার, ওয়াকিং ষ্টিক ইত্যাদি এসিস্টিং ডিভাইস উৎপাদন করা হয় এবং খুব কম মূল্যে প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিক্রি করা হয়। ই.আর.সি.পি.এইচ. এর উৎপাদন ইউনিট মৈত্রীশিল্প সার্বিক উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বোর্ড অফ ট্রাষ্টিজ এর অধীনে ন্যাস্ত করা হয়েছে। এ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবন্ধীদের দ্বারা পরিচালিত। এ শিল্পে উন্নতমানের প্লাষ্টিক সামগ্রী ও বিশুদ্ধ পানি (মিনারেল ওয়াটার) উৎপাদন প্লান্ট রয়েছে। এছাড়াও রাজশাহী, খুলনা, রবিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, চাঁদপুর ও সিলেট জেলায় ৭টি বাক-শ্রবন প্রতিবন্ধীদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (আসন সংখ্যা- ৬২০)। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, গাজীপুর, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল জেলায় ৬টি আবাসিক বিদ্যালয় (আসন ২৪০) পরিচালনা করা হচ্ছে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য চট্টগ্রামের রউফাবাদে ১টি পুনর্বাসন কেন্দ্র (আসন সংখ্যা ৭৫) রয়েছে। এছাড়াও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের আর্থিক সহায়তায় সারাদেশে ৩০০ এর অধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিবন্ধীদের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসকল এন.জি.ও

কে সমাজ কল্যান পরিষদ বৎসরে কার্যক্রমের পরিধি অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। এছাড়া জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বৎসরে সংগঠন প্রতি ২০ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করে। প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে সারাদেশে মোট তিন লক্ষ প্রতিবন্ধীকে প্রতি মাসে জন প্রতি ৬০০/- হারে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি প্রতি মাসে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৫০০/০০ টাকা, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৬০০/০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৭০০/০০ টাকা এবং অধিকতর উচ্চ শিক্ষার জন্য ১২০০/০০ টাকা হারে প্রদান করা হয়। ভাতার অংক আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। । এ ছাড়াও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধীদেরকে ৫০০০ টাকা থেকে ২০০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ দেওয়ার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীগণ বৎসরে ৫% সার্ভিস চার্জ প্রদান করে। এটিও মওকুফযোগ্য হতে পারে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধীর সন্তানের শিক্ষা সকল সরকারি অসরকারি শিক্ষপ্রতিষ্ঠানেই অবৈতনিক করা যায়। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী পুনর্বাসন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আবার বর্ণিত সকল সুবিধা সমূহ সময়ের ব্যবধানে প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা বিবেচনাযোগ্য। প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সুবিধা ও প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের সেবা ও চিকিৎসা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীগণের জন্য চালুকৃত এ সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের নিমিত্ত সুযোগ সুবিধার বিষয়সমূহ প্রতিবন্ধীগণকে অবহিত করা যায়। পুনর্বাসন কার্যক্রম সার্বিক ভাবে সফল করার জন্য প্রয়োজন প্রতিবন্ধীদের চাকরির জন্য সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১০% কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতি সার্বিকভাবে বাস্তবায়ন। আবার সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সকলের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন, যাতে কেউ তাদের অধীনে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ করতে দ্বিধা না করেন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজন প্রতিবন্ধীদেরকে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে প্রতিবন্ধীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের আধুনিকায়ন ও ব্যাপক উন্নয়ন। সেই সাথে কর্মরত প্রশিক্ষকবৃন্দের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আধুনিকতর প্রশিক্ষণ দেয়া আবশ্যক। প্রতিবন্ধীদের যোগ্যতর করার জন্য সরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারি পর্যায়ে বাক-শ্রবন প্রতিবন্ধীদের ৭টি স্কুল (চট্টগ্রাম চাঁদপুর, সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহীতে অবস্থিত), অন্ধ বিদ্যালয় ৬টি (ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও গাজীপুরে অবস্থিত), সমন্বিত অন্ধশিক্ষা কার্যক্রম ৬৪ জেলায় ৬৪টি রয়েছে। এছাড়াও ৬ বিভাগে ৬টি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মুক-বধিরদের সাথে শিশু সদনের নিবাসীগণ কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। এ সব শিক্ষালয়ে প্রতিবন্ধীদের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধীদেরকে এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দকে উৎসাহী করা দরকার। এই বিষয়ে সমাজের সকলের মানবিক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসা

প্রয়োজন। প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম অবশ্যই একটি মহৎ উদ্যোগ। এই মহৎ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা ও উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি আনুষঙ্গিক সুবিধাসমূহ থাকা বাঞ্ছনীয়। যে কোন মানুষের স্বাস্থ্য তার সকল কর্ম উদ্দীপনার মূলে । স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিষয়টি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, ব্যায়াম অনুশীলন করা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে। যদিও সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের আবাসিক ভবনের ডাইনিং সুবিধা আছে, তথাপিও উক্ত ডাইনিংসমূহের খাবারের মান ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। খাবার ঘরের পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ সকল আসবাবপত্র ও তৈজসপত্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পুষ্টির মান ও পরিমাণ , যথার্থ পুষ্টিকর খাবার প্রভৃতি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। একজন প্রতিবন্ধী তার বয়স ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী পরিমিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্যালরি গ্রহণ করছে কিনা এ বিষয়ে সজাগ থাকা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে একজন পুষ্টিবিশারদের পরামর্শ নেয়া আবশ্যক হলেও কোনো পুষ্টি বিশারদ নিয়োগ করা হয় নাই। যার ফলে প্রয়োজনের তুলনায় কম পুষ্টি গ্রহণ করার কারণে একজন প্রতিবন্ধী শারীরিক দুর্বলতার শিকার অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পুষ্টি গ্রহণের কারণে নানাবিধ শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে উক্ত প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণে তার সম্পূর্ণ মনমানসিকতা নিয়োজিত করতে পারে না। ফলে তার প্রশিক্ষণ হয় অপূর্ণাঙ্গ। একই কারণে সারা বাংলাদেশের সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলসমূহে পুষ্টি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োজন বাধ্যতামূলকভাবে খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ও শরীরচর্চাবিদ উভয়ই নিয়োগ করা আবশ্যক। আবার হোস্টেল সমুহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আলোচনা হওয়া প্রয়োজন তা হলো- হোস্টেল বা পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের নিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া (এ.ডি.এল)। এই বিষয়টি হলো একজন মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার প্রশিক্ষণ। এর সাথে সম্পৃক্ত থাকে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বিষয়। একজন মানুষ তার কর্মজীবনের সকল পর্যায়ে যেন দৈনন্দিন কাজসমূহ নিজে সম্পন্ন করে নিজ আয়ের ভিতরে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে পারে, তার প্রশিক্ষণই হল এ.ডি.এল প্রশিক্ষণ (A.D.L= Activities for daily living.)। বিশেষত প্রতিবন্ধীদের জন্য এই প্রশিক্ষণটি অত্যন্ত জরুরী। কোন প্রতিবন্ধীকে সমাজে খুব উচ্চ পর্যায়ে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয় না। পুনর্বাসনে তার আয় হয় অত্যন্ত সীমিত। তার সীমিত আয়ের দ্বারা প্রাত্যহিক জীবনে যেমন- খাওয়া-দাওয়া প্রস্তুত করা, ঘর দুয়ার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জামা কাপড় পরিষ্কার রাখা, আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, মিতব্যয়িতা অনুসরণ করা, নিরাপদে, সততার সাথে জীবনযাপন, সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ না থাকার কারণে প্রতিবন্ধীরা অনেক ক্ষেত্রেই জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তাকে পুনর্বাসন করার কাজটি সফল হয় না। অন্যদিকে মিতব্যয়িতার

সাথে জীবনযাত্রা পরিচালনা না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা অসৎ পথ অবলম্বনের চেষ্টা করতে পারে। ফলে প্রতিবন্ধীদের প্রতি স্বাভাবিক সহমর্মিতার বিষয়টি বিঘ্ন হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি এ.ডি.এল কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে জড়িত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

প্রতিবন্ধীদের সরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রমের পাশাপাশি বহু সংখ্যক এনজিও ও এদেশে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হয়ে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রমকে সার্বিক ভাবে সফল করার জন্য প্রতিবন্ধীদেরকে ও তাদের অভিভাবকবৃন্দকে উৎসাহী করা আবশ্যক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা দরকার। কারণ বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত (বর্তমানে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান) ও প্রতিবন্ধীদের শারীরিক অসুবিধায় কারণে দূরবর্তী অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি হতে অনুৎসাহী হয়। এই সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে যদি বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে প্রতিবন্ধীগণ তাদের নিজ জেলাতেই অবস্থিত পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সহজতর সুযোগ পেতে পারে। উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ জেলা সমাজসেবা কার্যালয় অথবা শ্রম অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত হতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় সরকার এলাকার প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়া প্রতিটি সরকারি বা বেসরকারি ভকেশনাল ইনস্টিটিউটে সাধারণ সক্ষম প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এতে বিভিন্ন মুখী উপকার হতে পারে। যেমন প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন একজন প্রতিবন্ধী ও সাধারণ মানুষের কথাবার্তা চলাফেরা একজনের প্রতি আরেকজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হতে পারে এ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে পারে। এ ছাড়া এতে প্রতিবন্ধীদের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য দূর হওয়ার পথ অধিকতর প্রশস্ত হয়। একজন প্রতিবন্ধী উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে যে ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ সক্ষম মানুষের চেয়ে অনেক বেশী যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে, এটা প্রশিক্ষণ চলাকালীনই প্রমাণ হতে পারে। এতে দক্ষতার ভিত্তিতেই একজন প্রতিবন্ধীকে পুনর্বাসন করা সহজতর হতে পারে। অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল এবং রাজশাহী বিভাগে পুরুষ প্রতিবন্ধীদের জন্য ৬টি নতুন পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর এসকল প্রতিষ্ঠানে শিশু সদনের নিবাসী ও প্রতিবন্ধীগণ একই সাথে আধুনিকতর কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আরও একটি বিষয় আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । তা হলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধীদের বয়স। সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্রসমুহে প্রতিবন্ধীদের বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হয় ১৫-২৫ বৎসর। কিন্তু সরকারি চাকরির বয়সের সর্বোচ্চ সীমা ৩০ বৎসর আর বেসরকারি

পর্যায়ে বয়সের কোনো সীমারেখা মানা হয় না। সুতরাং একজন প্রতিবন্ধীকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তির বিষয়ে বয়সের সীমা আরও বৃদ্ধি করা যায়। সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা অধিদফতর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন বা প্রণয়নকৃত নীতিমালার প্রয়োজনবোধে সংশোধনপূর্বক বাস্তবায়ন করতে পারে। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা উভয়বিদ শিক্ষা প্রদান ও সমাজে পুনর্বাসনসহ প্রতিবন্ধীদেরকে দেশের সার্বিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজন তাদের সীমাবদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত করা। এ উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সব সুবিধা ও ব্যবস্থাদি তৈরি করা প্রয়োজন, আমরা সে বিষয়সমূহ তৈরি বা নির্মাণ করছি না অথবা এই বিষয়ে চিন্তা করছি না। এর অর্থ হলো- আমরা সমাজের এক অবিচ্ছিন্ন অংশের অধিকার বাস্তবায়ন অথবা মূল্যায়ন করছি না। এটা দুর্ভাগ্যজনক। যাতায়াত ব্যবস্থা প্রতিবন্ধীদের জন্য আরও নিরাপদ ও সহজতর করা প্রয়োজন। কারণ যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর ও নিরাপদজনক না হলে প্রতিবন্ধীদের পক্ষে নিজ ঘর থেকে বের হয়ে দূরে যাওয়া কষ্টকর হয়। এমন কি তার নিকটবর্তী পুনর্বাসন কেন্দ্রে যাতায়াতও কষ্টকর হয়। এ কারণে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে যেতে উৎসাহবোধ করে না। আমরা ফুটপাত নির্মাণ করি এমন ভাবে যাতে একজন সুস্থ সক্ষম মানুষ উক্ত ফুটপাতে হেঁটে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। এই ফুটপাত এমনভাবে নির্মাণ করা প্রয়োজন, যাতে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হুইলচেয়ার নিয়ে বা ক্র্যাচে ভর করে সহজে ফুটপাতে ওঠে আসতে পারে ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে। একজন অন্ধ ব্যক্তির জন্য ফুটপাত এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে সে ফুটপাত থেকে রাস্তায় গড়ে না যায়। এরজন্য ফুটপাতের পার্শ্ব বরাবর ১'-১.৫' ভিতরের ফুটপাতের কিনারায় সমান্তরালে এমন কিছু চিহ্ন রাখা উচিত, যাতে একজন অন্ধ ব্যক্তি ঐ চিহ্নে পা দিয়ে বা সাদাছড়ি দিয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পারে যে, এর ডানে বা বামে যাওয়া নিরাপদ নয়। একইভাবে বাসস্ট্যান্ড, বাস স্টপেজ, রেলস্টেশন প্রভৃতির প্লাটফরম এমন হওয়া দরকার, যাতে অন্ধ ব্যক্তি বা কোনো প্রতিবন্ধী ট্রেনলাইন বা বাস চলাচলের স্থানে পড়ে না যায় এবং প্লাটফরম থেকে খুব সহজে ট্রেনে, বাসে ও লঞ্চে ওঠানামা করতে পারে। রেলওয়ে, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। অন্ধদের নিরাপদে চলাচলের জন্য আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার তা হলো ট্রাফিক সিগনালে লালবাতি জ্বলে ওঠার সাথে সাথে একটি মিউজিক বা বেল বেজে ওঠার ব্যবস্থা করা, যাতে ঐ বেলের শব্দ শুনে অন্ধ ব্যক্তি রাস্তা পারাপারের সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এ বিষয়ে যৌথপদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, পুনর্বাসন কেন্দ্র ও বিভিন্ন অফিস আদালতে এ রকম ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে প্রতিবন্ধীরা কখনই কোথাও বিব্রতকর অবস্থায় না পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি কার্যক্রমে সাধারণ সক্ষম মানুষের সাথে একজন প্রতিবন্ধীও যাতে সহজে যাতায়াত করতে পারে, তার জন্য অফিস বা ভবনে ওঠার সিঁড়ির পাশে একটা র‌্যাম্প বা ঢাল নির্মাণ করা, যার মাধ্যমে একট হুইলচেয়ার বা

ক্র্যাচ ব্যবহারকারী ব্যক্তি অনায়াসে ভবনে ওঠে আসতে পারে। সাধারণ মানুষের ল্যাট্রিনের পাশাপাশি ২/১টি ল্যাট্রিন বা বাথরুমের স্পেস এমন রাখা দরকার যাতে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হুইলচেয়ার বা ক্র্যাচ নিয়ে সহজে প্রবেশ ও ব্যবহার করতে পারে। কমোড, প্যান, বেসিনসমূহ এমনভাবে স্থাপন করা যায়, যাতে ঐ গুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের কোনো অসুবিধা না হয়। বহুতল ভবনের দুইতলা বা ততোধিক উচ্চতায় প্রতিবন্ধীদের উঠানামা ও চলাফেরা করা খুবই অসুবিধাজনক (বিশেষত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য)। এছাড়া প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় তাদেরকে এসকল স্থান থেকে সহজে ও নিরাপদে স্থানান্তর করা খুবই কঠিন হয়। কাজেই বহুতলবিশিষ্ট ভবনের ২য়, ৩য় বা ততোধিক উচ্চতর তলায় প্রতিবন্ধীদের অবস্থান করা সময়ে মারাত্মক বিপদের কারণ হয়। তাই প্রতিবন্ধীদের সকল কার্যক্রমই গ্রাউন্ড ফ্লোরে হওয়া বাঞ্চনীয়। আলোচিত সুবিধাসমূহ নির্মাণ করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করারও প্রয়োজন নেই। শুধু প্ল্যান ও ডিজাইনের আধুনিকায়ন ও রি-মডেলিং- এ প্রতিবন্ধীদের সুবিধাসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে এর বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সুবিধাসমূহ তৈরি করা ব্যয়বহুল হতে পারে। সেক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে ধীরে ধীরে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়। এ দেশে কোনো কিছু নির্মাণের সময় বা কোনো উন্নয়নমূলক পরিবর্তনের সময় সেই নির্মিতব্য ভবন, সড়ক, ফুটপাত, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক ব্যবস্থায় সব ধরনের সুবিধার বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতার অনেক কিছুই উপেক্ষা করা হয়। যার কারণে তৈরি বা নির্মিত সকল সুবিধা বা ব্যবস্থাসমূহ হয় অপূর্ণাঙ্গ। অথচ আমরা যা নির্মাণ করি সেটা কোনো কোনো শ্রেণির মানুষ ব্যবহার করতে পারে বা এর মধ্যে আরও কোনো সুবিধা তৈরি করা যায় কিনা- এ বিষয়ে গবেষণা করলেও অনেক ক্ষেত্রেই একই ব্যয়ে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা তৈরি করা যায়। গবেষণা শুধু প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নয়, রাষ্ট্রের গৃহীত সকল কার্যক্রম সফল করার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রকৌশল কর্মকান্ডে নিয়োজিত প্রকৌশলীবৃন্দ ও অন্যান্য পরিকল্পনাবিদগণ উল্লেখিত বিষয়সমূহে যাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, প্রতিবন্ধীদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এটা বিনীত অনুরোধ। প্রতিবন্ধীদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। যেমন- অফিস-আদালতে, যোগাযোগ-যানবাহনে যাতায়াত, শিক্ষায়তনে ভর্তি- প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ । সেটি হলো বর্তমানে পুনঃ পরিসংখ্যান গ্রহণ করা। সমাজসেবা অধিদফতর স্থানীয় সরকারের সাহায্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে ও পরিসংখ্যান শেষে প্রতিবন্ধীদের সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার লক্ষ্যে আই.ডি কার্ড দেবার ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়াও সামাজিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধীদেরকে আই.ডি কার্ড দেওয়া প্রয়োজন (বর্তমানে প্রতিবন্ধীদের সুবর্ণ নাগরিক নামে আইডি কার্ড দেওয়া হয়)। ইতোমধ্যে ১০.০১

লক্ষ জন প্রতিবন্ধীর মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ প্রক্রিয়াধীন। আইডি কার্ড গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধীদেরকে প্রথমে স্থানীয় সমাজসেবা অফিসে নিবন্ধিত হতে হয়। পরবর্তীতে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রতিবন্ধী হিসাবে সার্টিফিকেট নিতে হয়। এই সার্টিফিকেট এর ভিত্তিতে সিভিল সার্জন শারীরিক পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। সিভিল সার্জন প্রদত্ব সার্টিফিকেট নিজ জেলার জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে দাখিল করতে হয়। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক প্রতিবন্ধীত্বের সনদপত্র প্রদান করেন। এই জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া সহজতর ও সংক্ষিপ্ত করার জন্য প্রতিবন্ধীর নিজ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অথবা উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিবন্ধীত্বের সার্টিফিকেট প্রদানের বিধিবিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়।

আজ যে মানুষটি সমাজের সুস্থ সক্ষম, আগামীকাল তিনি যে প্রতিবন্ধী হবেন না এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিছুদিন পূর্বেও আমেরিকার সাবেক প্রেডিডেন্ট বিল ক্লিনটনকেও ক্র্যাচ ব্যবহার করতে হয়েছে। আশরাফ চৌধুরী নামে আমার এক পরিচিত বিমানের (অব.) ক্যাপ্টেন ছিলেন; যিনি অসুস্থতার কারণে বহু বছর পঙ্গু জীবনযাপন করেছেন। এ রকমের আরও বহু উদাহরণ দেয়া যাবে, যার থেকে এটা প্রতীয়মান হবে যে, অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই অতীতে সুস্থ সক্ষম মানুষ ছিলেন। সুতরাং প্রতিবন্ধীদের জন্য কোনো সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন একটি সামাজিক ও মহত্তম মানবিক দায়িত্ব পালন করতে পারি, অন্যদিকে এই সৃষ্ট সুবিধা হতে পারে এমন একটি বীমা, যার দ্বারা দুদিন পর আজকের সুস্থ সক্ষম মানুষের অনেকেই উপকারভোগী হতে পারেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং তথ্য সংগ্রহঃ
১। সমাজসেবা অধিদফতর
২। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, বাগেরহাট।
৩। বিভিন্ন মিডিয়া।

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে জরুরী করণীয়

যে মানুষ তার করণীয় কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় শারীরিক স্থায়ী অনুপযুক্ততা বা সমস্যার কারণে করতে সক্ষম নয় সে-ই শারীরিক প্রতিবন্ধী। শারীরিক প্রতিবন্ধিতা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- ক) মূক, খ) বধির, গ) মূক ও বধির ঘ) শারীরিক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকলাঙ্গতা ইত্যাদি। এ লেখায় শুধু ১) মূক-বধির ও ২) মূকদের সমস্যা ও তাদেরকে সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। মূক-বধির ও মূক প্রতিবন্ধীরা স্বাভাবিক ও বোধগম্য উচ্চারণে কথা বলতে অক্ষম। ফলে তাদের সাথে স্বাভাবিকভাবে বা অবস্থায় কেউই কথা বলতে পারে না। এদের সাথে কথা বলার জন্য প্রয়োজন বিশেষ সাঙ্কেতিক ভাষার, যা হাত ইশারায় প্রকাশ হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখার কিছু অংশ মূক ও মূকবধির। তাদের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে ভাষাজনিত সমস্যার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ। আর দরিদ্র্য পরিবারের এ সকল সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নেই বললেই চলে। অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র সকল মূকবধির ও মূক প্রতিবন্ধীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই বললেই চলে। আবার এদের ভাষা অন্যের কাছে বোধগম্য না হওয়ায় এদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ। বর্তমানে বিভিন্ন মিল-কারখানায় এদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাসহ সমাজে পুনর্বাসন করা হলেও এ কার্যক্রমটি আশানুরূপভাবে সফল নয়। এ সমস্যাটি প্রধানত ভাষাজনিত। আর এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রতিবন্ধীদের (মূক-বধির, মূক ও বধির)- কে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে দ্রুত পুনর্বাসনে এটি একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা। একজন মূকবধির বা মূক ব্যক্তি কোনো প্রয়োজনে জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাগণের কাছে গেলে তার প্রতি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও এ অসহায় ব্যক্তির জন্য তেমন কিছু করা যায় না, শুধুমাত্র তার ভাষা না বুঝার কারণে। মূকবধির ও মূকপ্রতিবন্ধীরা কোনো সমস্যায় পড়লে বা তার প্রয়োজনে উচ্চতর কর্মকর্তা বা জনপ্রতিনিধির কাছে বা কোনো কার্যালয়ে যাওয়ার দরকার বোধ করলে, সে সর্বপ্রথম সহযোগিতা পাওয়ার জন্য আসতে পারে একজন সমাজসেবা কর্মকর্তার কাছে। এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষাজীবনে মূক বধিরদের ইশারা ইঙ্গিতে (Sign language-এ) কথা বলার বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ না থাকায় সমাজসেবা কর্মকর্তাও আগত মূকবধির বা মূক ব্যক্তির সমস্যা বুঝতে পারেন না। কাজেই তিনি দ্রুত ও সঠিকভাবে এতদসংক্রান্ত দায়িত্বও পালন করতে পারেন না। ফলে মূকবধির ব্যক্তির সমাধান হয় দেরিতে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রত্যেক স্কুল-কলেজেই বাধ্যতামূলকভাবে মূকবধিরদের ইশারা ইঙ্গিতে কথা বলার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। বিশেষত যারা সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম নিয়ে পড়াশুনা করেন, তাদের জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তবে যেহেতু মূকবধির ও মূক প্রতিবন্ধীরা নানাবিধ সমস্যার কারণে সমাজে অন্যদের মতো যে কোনো বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের কাছে আসতে পারে- তাই সকল বিভাগ/অধিদফতরের বিশেষত যারা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করেন ও

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে Sign language যথাসম্ভব দ্রুত প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করলে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের মহৎ উদ্যোগ অধিকতর ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে। সদাশয় সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

টাঙ্গাইল শহরের যানজট নিরসনের নিমিত্ত কিছু সুপারিশ

টাঙ্গাইল শহরের বিভিন্ন সড়কে প্রায়শই সৃষ্ট প্রকট যানজট সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কিছু সুপারিশ নিচে উল্লেখ করা হলো। মূল্যবান সময় নষ্টকারী, স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহতকারী, শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী ও জাতীয় উন্নয়নের গতি মন্থরকারী অস্বস্তিকর এ সমস্যা এ শহর ও পার্শ্ববর্তী জনপদ থেকে দূর হোক, এ ঐকান্তিক প্রত্যাশায়ই এ সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

১। শহরের সড়কসমূহ স্থান বিশেষে একমুখী, দ্বিমুখী ও সাময়িক একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হলো। বিশেষত শহরের যানবাহন চলাচলের মূলস্রোত একমুখী হওয়া অনিবার্য। এখানে মূলস্রোত বলতে মেইন রোডের উপর দিয়ে যাতায়াতকারী যানবাহনের প্রবাহকে বুঝানো হয়েছে।

২। টাঙ্গাইল শহরের বেবীষ্ট্যান্ড ও জলফই বাইপাসে দুটি বড় আকারের গোলচত্তর নির্মাণ করে নির্মিত গোলচত্তরের চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন লেনের মাধ্যমে যানবাহন ধীরগতিতে চালানোর ব্যবস্থা করা হলে এ সকল স্থান যানজটমুক্ত থাকতে পারে। নির্মিত গোলচত্তরের মধ্যে ফুলের বাগান ও পানির দৃষ্টিনন্দন ফোয়ারা নির্মাণ করা যায় এবং এসব স্থানে অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা করা যায়। জলফই বাইপাসে সড়ক মহাসড়ক পারাপারের জন্য র‌্যাম্পসহ ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা যায়। একইভাবে বেবীষ্ট্যান্ডেও মানুষজনের রাস্তা অতিক্রমের জন্য ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ করা যায়।

৩। সাময়িক একমুখী, দ্বিমুখী ও স্থায়ী একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কার্যকরী থাকতে পারে।

৪। কোনো পার্শ্ব সড়কের যানবাহন যাতে যানবাহনের মূলস্রোতকে বিঘ্ন না করে তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৫। যে সকল টার্নিং-এর কারণে অন্য কোনো দিকের যানবাহন চলাচলের প্রবাহ বিঘ্ন হয়, সে সমস্ত টার্নিং যথাসম্ভব পরিহার করা প্রয়োজন। প্রতিটি মোড়ের উভয় দিকে ৬০-৭০ ফুটের মধ্যে ভারী/হালকা যে কোনো ধরনের যানবাহন দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

৬। যানবাহন চলাচলের নতুন পদ্ধতি গাড়িচালকবৃন্দকে ও সাধারণ মানুষকে অবগত করানোর নিমিত্তে বিষয়টির ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে পোস্টারিং, মাইকে ঘোষণা ও পাবলিসিটি প্রদর্শন করা যেতে পারে।

৭। শহরের কোন সড়কের কোন দিকে একমুখী, কোন সড়কে দ্বিমুখী ও কোন সড়কে সাময়িক একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা করা যায়। এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী সম্বলিত নির্দেশিকা বোর্ড ঐ সড়কের প্রবেশ পথে স্থাপন করা আবশ্যক।

৮। যে সকল স্থানে দুই বা ততোধিক দিক থেকে যানবাহন অতিক্রম করবে, যে সব স্থানে সড়কের বাঁক যানজট মুক্ত রাখার নিমিত্তে নির্দিষ্ট সময় পরপর যানবাহন

চলাচলের দিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক পুলিশ অথবা স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভা কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তি নিয়োজিত থাকতে পারেন, যারা যানবাহন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরও উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯। তুলনামূলকভাবে অপ্রশস্ত দ্বিমুখী চলাচলের সড়কে ব্যস্ত সময়ে ভারী যানবাহন যেমন ট্রাক, লরি ইত্যাদি প্রবেশ করতে দিলে যানজট সৃষ্টি হতে পারে।

১০। মেরামতযোগ্য সড়ক ও গলিসমূহ মেরামত ও প্রয়োজনে নতুন গলি নির্মাণ করে সহজে এক সড়কের সাথে অন্য সড়কের সংযোগ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষও পৌরসভা যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

১১। তুলনামূলকভাবে অপ্রশস্ত রাস্তা/গলিতে একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা করা অধিকতর ফলপ্রসূ। এ ধরনের সড়কে ভারী বা মালামাল পরিবহনের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে যানজট সৃষ্টি হতে পারে।

১২। অপ্রশস্থ সড়কে একাধিক যানবাহন একত্রে পাশাপাশি বা বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করতে বা যাতায়াত করতে না দেওয়াই শ্রেয়তর। এক্ষেত্রে কোথাও কোন সড়কে একত্রে একাধিক যানবাহনে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকলে সে সড়কে ধৈর্য্যের সাথে সুশৃঙ্খলভাবে যানবাহন চালনা করার জন্য চালকগণকে উৎসাহিত করা যায়। অবশ্য ওভারটেক না করে ধৈর্য্যের সাথে যানবাহন পরিচালনা করা সকল সড়কই যানজটমুক্ত রাখার জন্য খুবই সহায়ক।

১৩। শুধুমাত্র নির্ধারিত স্থান ব্যতিত অন্য কোন স্থানে যানবাহন থামান বা যাত্রী উঠানামা করা যানজটের অন্যতম কারণ। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন থাকা প্রয়োজন।

১৪। সড়কের যে কোন স্থানে যানবাহন ঘুরানো বা টার্নিং নেওয়া যানজটের অন্যতম কারণ। এটি যাতে না হয় সে দিকে যানজট নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও যানবাহন চালক সকলের সচেতন থাকা বাঞ্চনীয়। আবার নির্দিষ্ট স্থানে যানবাহন টার্নিং নেওয়ার সময় যাতে নিয়ম/ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণ করা হয় সেটিও নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

১৫। সড়কের উপর ভারী/হালকা যে কোনো ধরনের যানবাহনের দাঁড়িয়ে থাকা বা মালামাল উঠানো-নামানো ও মালামাল ফেলে রাখা যানজটের অন্যতম কারণ। বিশেষত হালকা যানবাহনের জন্য রাস্তার বাইরে স্টপেজ নির্মাণ করা যায়। আর ভারী যানবাহন দিনের বেলায় শহরে দাঁড়ানো একেবারে নিষিদ্ধ করা যায়।

১৬। শহরের প্রধান সড়কের উপর দিয়ে শুধু উত্তর দিকে প্রবাহিত যানজটের মূলস্রোতকে আপাতত প্রয়োজনে ক্লাব রোডের সংলগ্ন চৌরাস্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে।

১৭। বিভিন্ন উপজেলা বা বিভিন্ন অঞ্চলের সকল ধরনের যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক যানবাহনের স্ট্যান্ড শহরের বাইরে সুবিধাজনক স্থানে নির্মাণ করলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শহরের মধ্যে বহু যানবাহনের গমনাগমন বন্ধ হতে পারে। এতে শহরের মধ্যে যানবাহনের আধিক্য বহুলাংশে হ্রাস পেতে পারে। এটি যানজট নিরসনে সহায়ক।

১৮। শহরের নির্মাণকৃত সকল রাস্তা/গলিসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, বর্তমানে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বা যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিচিত ও পূর্বে নির্মাণ করা সড়কগুলোই ব্যবহার করা হয়। এই প্রবণতা দূর করে যাতে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন সড়ক ব্যবহার করা হয়, সে বিষয়ে সকল ধরনের যানবাহনের চালককে উৎসাহীত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিভিন্ন রুট (Rout)-এর ব্যবস্থা করা যায়।

১৯। (ক) টাঙ্গাইল শহরে অধিকাংশ মানুষ কোনো স্থানে যাতায়াতের জন্য শুধু মেইন রোডটি ব্যবহার করে। অনেক সময়ই বহু সংখ্যক মানুষের মেইন রোডে কাজ না থাকলেও তারা এই মেইন রোড ব্যতীত অন্য কোনো সড়কে যাতায়াত করে না। ফলে মেইন রোডের উপর যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি ও এই সড়কের বিভিন্ন স্থানে ট্রাফিক জ্যাম হয়। মেইন রোড ব্যতীত অন্যান্য সড়কও যাতে সকল শ্রেণির মানুষ যাতায়াত করার জন্য ব্যবহার করে, সে বিষয়ে সকলকে উৎসাহী করা যায়। মেইন রোডে ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হলে সে সময়ে এর সমান্তরাল অন্যান্য সড়কে যানবাহন অনেক কম থাকে। এ সময় মেইন রোড থেকে যানবাহন অন্যান্য সড়কের মাধ্যমে চালানোর ব্যবস্থা করা যায়। টাঙ্গাইলের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজন ব্যতীত মেইন রোড ব্যবহার করার বিষয়টি সকলকে নিরুৎসাহীত করলে এমনিতেই যানজট অনেকাংশে কমতে পারে।।

(খ) আবাসিক এলাকার মধ্যে নির্মিত বহু রাস্তা অব্যবহৃত থাকে। এ সকল রাস্তায় একদিকে চলাচল পদ্ধতিতে যানবাহন চালনা করা যায়। যেহেতু এ রাস্তাসমূহ আবাসিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত। তাই এগুলো দিয়ে যানবাহন চলাচলের গতিসীমা সর্বনিম্ন রাখা আবশ্যক। আবাসিক এলাকায় তুলনামূলকভাবে কম প্রশস্ত রাস্তায় ভারী যানবাহন প্রবেশ নিষিদ্ধ করা যায়।

২০। কোনোভাবেই যেন শহরের কোথাও জলাবদ্ধতা না হয়। কারণ জলাবদ্ধ স্থানে যানবাহন ধীরগতিতে চালাতে হয়। কখনো একেবারে বন্ধ করতে হয় যানবাহন চলাচল। ফলে সংশ্লিষ্ট স্থানে যানজট হয়। আবার একস্থানে জলাবদ্ধতার কারণে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে এক সড়কের যানবাহন অন্য সড়কের মাধ্যমে চলাচলের প্রয়োজন হয়। ফলে অন্য সড়কে যানবাহনের আধিক্যের কারণে প্রকট যানজট হয়। উল্লেখ্য, শহরে পানি ঢোকা বন্ধের ব্যবস্থার সাথে সাথে শহরের বাসাবাড়ি, বিভিন্ন কর্মস্থল, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত পানি, বন্যা ও বৃষ্টির পানি দ্রুত ও সহজে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকাও অতি জরুরী। জলাবদ্ধতা নিরসনে শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও রাস্তা নির্মাণ কৌশল উন্নত করা সর্বোপরি নির্মিত সুবিধাসমূহের সঠিক ব্যবহার ও যত্ন নেয়া সর্বাধিক বিবেচনাযোগ্য।

২১। ঢাকা-টাঙ্গাইল রুটের ডাইরেক্ট গাড়িসমূহ বিশেষত ট্রাক, ধলেশ্বরী, ঝটিকা, যমুনা, মহানগর, প্রভৃতি বাস পুরান/শহর বাসস্ট্যান্ড হয়ে ঢাকা যাওয়া বন্ধ করে নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে শিববাড়ি হয়ে অথবা আরও উত্তরে দিকে বাইপাস সড়কে উঠতে পারে। অথবা এই রুটের গাড়িসমূহ কুমুদিনী কলেজের উত্তরপার্শ্ব দিয়ে

একদিকে চলার পদ্ধতিতে পূর্ব দিকে গিয়ে বাইপাস সড়কে ওঠতে পারে। তবে এ সকল গাড়ি টাঙ্গাইল পুরান বাসস্ট্যান্ডের মাধ্যমে ফেরত আসতে পারে। এক্ষেত্রে কুমুদিনী কলেজ মোড়, শিব বাড়ীর মোড়, পুরান বাসস্ট্যান্ডব মোড় আরও প্রশস্থ করা প্রয়োজন।

২২। নতুন পদ্ধতিতে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কোনো এলাকার বাসিন্দাগণকে একটু ঘুরে সামান্য সময় বেশী ব্যয় করে গন্তব্য পৌঁছতে হতে পারে। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র এই অসুবিধাটুকু প্রত্যেকেরই মেনে নেয়া উচিত। এ বিষয়ে জনগণ যাতে কোনো আপত্তি না করে, সে উদ্দেশ্যে প্রত্যেক এলাকার গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় সচেতন ব্যক্তিবৃন্দের সমন্বয়ে সভা/সেমিনার করে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানো উচিত। প্রয়োজনে এই বিষয়ে জেলা প্রশাসন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সমিতি, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও রিকশা শ্রমিক সমিতি ইত্যাদি সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

২৩। ট্রাফিক আইন জানা ও আইন অনুযায়ী যানবাহন চালনা করা যানজট মুক্ত যানবাহন চলাচলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। তাই সর্বশ্রেণির মানুষকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া জরুরী। এই লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত সভা/সেমিনার করে ও প্রজেক্টর প্রদর্শনের মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে সকলকে জ্ঞান দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়টি অধিকতর সার্থক করার জন্য শিশুদের জন্য নির্মিত পার্কে বা খেলাধুলার স্থানের একাংশ যানবাহনের চলাচলের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়ার বিষয়ে একটি মডেল উপস্থাপন করা যায়। এ বিষয়টি আমি জাপানে প্রত্যক্ষ করেছি।

২৪। আমরা স্বল্পদূরত্ব অতিক্রম করার জন্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো ধরনের যানবাহনের উপর নির্ভর করি। সবারই অতিরিক্ত যানবাহন ব্যবহার করার প্রবণতা দূর করে স্বল্পদূরত্ব (১-২ কি.মি.) পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করার অভ্যাস করা উচিত। এতে নিম্নোক্ত উপকারসমূহ হতে পারে।

(ক) সড়কের উপর যানবাহনের চাপ অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

(খ) অর্থনৈতিক সাশ্রয় হতে পারে।

(গ) সর্বোপরি আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়ক হবে।

২৫। শহরের ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অতিরিক্ত রিকশা, রিকশাভ্যানের ও অটোরিক্সা চলাচল যাতে অনুমোদন না পায়, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তবে চলাচলরত অনিয়মিত রিকশা ও রিকশাভ্যান নিয়মিতকরণ করে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রাখা যেতে পারে। তবে বর্তমান শহরের আয়তন অধিকতর বিস্তৃত করা যায়। আবার গ্রাম পর্যন্ত নাগরিক সুবিধা বিস্তৃত করলে অনেকে গ্রামেই জীবনজীবীকার ব্যবস্থা করে নিতে পারে।

২৬। সড়ক ও মহাসড়কগুলোতে দুর্ঘটনা ও যানজট মুক্ত যানবাহন চলাচলের নিমিত্ত পরিবহন পেশায় নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং সেই সাথে সর্বোচ্চ মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়া জরুরী। মহাসড়কের প্রয়োজনীয় স্থানে যানবাহনের গতিসীমা নির্ধারণী নির্দেশাবলী বোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে।

আর এই নির্দেশ অনুযায়ী গাড়ির গতিসীমা নিয়ন্ত্রিত আছে কিনা এ বিষয়ে হাইওয়ে/ভ্রাম্যমাণ পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারেন ।

২৭। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি, মুমূর্ষু রোগী বহনকারী গাড়ি ও কর্মতৎপর পুলিশের গাড়ির জন্য ট্রাফিক আইন শিথিল হতে পারে।

২৮। দক্ষতর যানবাহন চলাচল ব্যবস্থাপনা যানজট নিরসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কাজেই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অধিকতর আন্তরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সকল শহর বা স্থানের যানজটের কারণ প্রায় একই ধরনের। কাজেই এক শহরে যানজট নিরসনের কার্যক্রম অন্য শহরের যানজট নিরসনের উদাহরণ হতে পারে। বিভিন্ন শহরে সৃষ্ট প্রকট যানজট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনুসরণীয় হিসেবে টাঙ্গাইল শহরের যানজট নিরসনের কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো। এ প্রস্তাবনাসমূহের বাস্তবায়নে যদি টাঙ্গাইল শহর যানজট মুক্ত হয়, তবে টাঙ্গাইলের যানজট নিরসনের কার্যক্রম গ্রহণ করে অন্যান্য শহরও যানজট মুক্ত হতে পারে।

টাঙ্গাইল শহরকে উন্নত শহরে রূপান্তরে কিছু সুপারিশ

ভুমিকা: যে শহরে/নগরে জনসাধারণ নাগরিক সুবিধা সর্বোচ্চ এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে পারে ও এ সুবিধাসমুহ ক্রমান্বয়ে সময়ের ব্যবধানে উন্নত, আধুনিকতার ও সহজলভ্য হয় সেই শহর বা নগরই আদর্শ / উন্নত নগর। আদর্শ নগর / শহরে সুশাসন, সুশিক্ষা, সুচিকিৎসা, নিরাপত্তা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এখানে সুষ্ঠু রাজনৈতিক অবস্থা এবং জনগণের অর্থনৈতিক সুঅবস্থা বিদ্যমান থাকে। নগরে সুসাংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত থাকে। চিত্ত বিনোদনের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক ব্যবস্থা থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আদর্শ নগরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নগরবাসীদের জন্য দক্ষতর ব্যবস্থাপনার কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে। এছাড়াও উন্নত জীবনযাপনের সকল উপাদান-উপকরণ ও তার সদব্যবহারের সকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকে। আদর্শ শহরের বাসিন্দাগণ সার্বিক নিরাপদে, স্বস্তিতে, শান্তিতে বসবাস করার সুষ্ঠু পরিবেশ পায়। সকল উন্নত দেশ/জাতি এ বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় এনে নগরের মাস্টারপ্ল্যান করে বাস্তবায়ন করে। এ দেশে এটি করা হয় না। অথবা প্ল্যান থাকলেও তার বাস্তবায়ন নেই। আবার এ দেশের নগরায়ণের অধিকাংশই হয় অপরিকল্পিত। যার ফলে নগরের/শহরের নাগরিক সুবিধা পাওয়া তো দূরের কথা, মানবিকভাবে জীপনযাপনও মারাত্মক বিঘ্নিত হয়। তাই অপরিকল্পিত নগরায়ন জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে প্রত্যেক শহর/নগরের মাস্টারপ্ল্যান করে অথবা প্ল্যানের সংশোধন করে নগরায়নের উন্নয়ন করা যায়। আবার প্রতিষ্ঠিত নগরের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে যেগুলো সমাধান করে অবস্থার উন্নয়ন করাও সম্ভব। অবশ্য এজন্য নগরায়ন সম্পর্কে গবেষণা করা অত্যাবশ্যক। কারণ গবেষণা ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে কোনো প্ল্যান বা গৃহীত প্ল্যান সুদূরপ্রসারী ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, ভৌগোলিক কারণেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক না কেন, বাংলাদেশের প্রায় সকল নগরেই এই ধরনের সমস্যা বিদ্যমান।

আদর্শ শহর শুধু কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সাথে পরিবেশ, জীপনযাপনের ধারা, সামাজিক উন্নয়নও গুরুত্বের সাথে বিবেচনাযোগ্য। একটি শহরকে সঠিকভাবে আদর্শ শহরে গড়ে তুলে সম্ভাব্য সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য শহরও গঠন করা যায়। শহর নির্মাণ বা গঠন কোনো আদর্শ শহরে রূপান্তরের সুপারিশসমূহ অন্য শহরকে আদর্শ শহরে রূপান্তরের উদাহরণ হতে পারে। এ সুবাদে টাঙ্গাইল শহরের উন্নয়নের জন্য কিছু সুপারিশ এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হলো। যার অনুসরণে দেশের অন্যান্য শহরেরও পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

১। পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন : (ক) শহরের সকল মহল্লা, বসতবাড়ির আশপাশ, সড়ক ও গলি ময়লা আবর্জনা ও স্যাঁতস্যাঁতেমুক্ত রাখা আবশ্যক। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) সকল বাড়ির আশেপাশের আগাছা কেটে পরিষ্কার করা আবশ্যক।
(গ) সকল সড়কের আশেপাশের আগাছা কেটে পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
(ঘ) বাড়ি বা এলাকার পুকুর ডোবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা পরিবেশ সংরক্ষণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে, স্থানীয় ক্লাব, বিভিন্ন এনজিও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। জেলা প্রশাসন ও পৌরসভা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। হাজা-মাজা পুকুর-ডোবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মাছের চাষ করলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। আর মশা নিধন ও মশার বংশ বিস্তার রোধে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
(ঙ) নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলা আবশ্যক। এ বিষয়ে প্রত্যেক শহরবাসীরই সচেতন হওয়া আবশ্যক। এটি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, পৌরসভা, এনজিও ও জনসাধারণকে অধিকতর সচেতন করা যায়।
(চ) নিজ নিজ বাড়িঘর ও স্কুল-কলেজের অভ্যন্তর ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ উপরোক্ত প্রস্তাবনাগুলো ব্যস্তবায়নের জন্য ছাত্র-ছাত্রীগণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।
(ছ) কর্মব্যস্ত দিন শুরু হওয়ার পূর্বেই শহরের সকল ডাস্টবিন থেকে ময়লা অপসারণ করা অতি আবশ্যক। প্রায় সময়েই দেখা যায়, কর্মব্যস্ত দিনের মধ্যে ব্যস্ত সময়েও পৌরসভার ময়লা অপসারণের গাড়ি ময়লা অপসারণের জন্য রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটি একদিকে যেমন দৃষ্টিকটু ও অস্বাস্থ্যকর, তেমনি কখনও কখনও যানজটেরও অন্যতম কারণ। এই বিষয়ে টাঙ্গাইল পৌরসভাকে অবশ্যই আরও সতর্ক ও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। এই কাজটি পৌরসভা ইচ্ছে করলে রাত ১০টার পর অথবা সকাল ৮টার পূর্বে সম্পন্ন করতে পারে।
(জ) পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন করা আবশ্যক। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় ক্রুটি থাকলে দুর্গন্ধ ছড়ায় ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং সকলের জন্য অবশ্যই পয়ঃনিষ্কাশনের উন্নত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পৌরসভা ও ব্যক্তিগতভাবেও এটি করা যায়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, শহর অঞ্চল বা তার আশপাশের কোথাও যেন কাঁচা পায়খানা নির্মিত না হয়, সেদিকে সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কাঁচা পায়খানা ও ক্রুটিপূর্ণ/অনুন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চারদিকের পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণে সরকারি- বেসরকারি সহযোগিতা থাকলে দরিদ্র মানুষেরা এ ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে।
(ঝ) যারা পৌর এলাকার ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত আছে তাদের কাজের জন্য বিশেষ পোষাক দেয়া যায়। আর একইসাথে তাদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন করাও খুবই জরুরী। কোনো কোনো সময়ে দেখা যায়, এরা যে হাতে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে, সে হাতেই একই সময়ে ধূমপানও করছে। এটি স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া কাজ শেষে তারা যেন নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, যে বিষয়ে সচেতন করাও আবশ্যক। কেননা ময়লা আবর্জনা থেকে এমন সব

মারাত্মক মরণঘাতী অসুখ হতে পারে; যা একাজে নিয়োজিতদের থেকে পরিবারের তথা আশেপাশের অনেককে সংক্রমিত করতে পারে।

(ঞ) শহরের পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থার অবশ্যই উন্নয়ন করা প্রয়োজন। আর সেই সাথে ড্রেন থেকে নিয়মিত ময়লা আর্বজনা অপসারণ করা এবং পানির প্রবাহ অব্যাহত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে ড্রেন দুর্গন্ধ, রোগজীবাণু ও মশা উৎপাদনের কারখানায় রূপান্তর হয়। ড্রেনকে ডাস্টবিন হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতা রোধ করাও আবশ্যক। এ বিষয়ে সকল শ্রেণির মানুষেরই সচেতন হওয়া এবং ড্রেনে ময়লা আবর্জনা না ফেলার বিষয়টি অভ্যাসে পরিণত করাই উত্তম। ড্রেনে ময়লা আবর্জনা বা অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ফেলার বিরুদ্ধে বিধিবিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়। ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ড্রেনের নির্মাণ কৌশল লক্ষণীয়। ড্রেনে কখনই যেন দুই প্রান্তের দিক ক্রমশঃ উঁচু ও মাঝখানে নিচু না হয়। অথবা যে স্থান দিয়ে পানি নিষ্কাশিত হয় সে স্থানে যেন অন্যদিক অপেক্ষা নিচু হয়। অন্যথায় পানি নিষ্কাশনের পরিবর্তে ড্রেনের মধ্যে পানি প্রবেশ করে এবং ড্রেনের নিচু অংশে জমা হয়ে নোংরা পানিতে পারিপার্শ্বিকতা সয়লাব করে দেয়। আরেকটি বিষয় হল- পুরানো যে সকল অংশের মধ্য দিয়ে ড্রেনের পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না সে সব স্থানের পরিবর্তে অন্যস্থান দিয়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে নতুন করে ড্রেন নির্মাণ বা বর্তমান ড্রেনের শাখা-প্রশাখা নির্মাণ করা যায়। আবার শহরের আয়তন নিষ্কাশনযোগ্য পানি ও বৃষ্টির পানির পরিমাণ এবং জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে ড্রেনের সংখ্যা দৈর্ঘ্য, গভীরতা ও প্রশস্থতা নির্ধারণযোগ্য হতে পারে। এ বিষয়গুলো শুধুমাত্র টাঙ্গাইল নয় অন্যান্য বড় বড় শহরের ড্রেনেজ সিষ্টেমের উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা রোধ করার জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনাযোগ্য হতে পারে। গণমানুষের স্বার্থে ড্রেনের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষণ করা পৌরসভা, পৌর কর্পোরেশন, সিটি কর্পোরেশন বা দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগের দায়িত্ব ও কতর্ব্য। ব্যতিক্রমে জনগণ যেন উল্লেখিত বিভাগসমূহের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারে তারও বিধি-বিধান থাকা এবং জনগণের সু-নাগরিক সুলভ আচরণ প্রদর্শনের ও পদক্ষেপ গ্রহণের সৎসাহস থাকা বাঞ্চনীয়।

(ট) সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য শহরের পৌরসভা কর্তৃক টয়লেট নির্মাণ ও নির্মিত টয়লেটের যথার্থ ব্যবহার করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। এই বিষয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা যায়। মানুষকে প্রয়োজনে সেসব টয়লেট ব্যবহারে আগ্রহী করার জন্য বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

(ঠ) শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষনের বিষয়ে সকল ওয়ার্ড কমিশনার ও পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সময় জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেন। দুর্ভাগ্যজনক যে নির্বাচনে জয়লাভ করার পরে কোন ওয়ার্ড কমিশানর বা চেয়ারম্যান নির্বাচনের পূর্বে প্রদত্ত এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেন না। ফলে জনগণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। এটি অবসান হওয়া উচিত। নিজ নিজ এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার

দায়িত্ব স্ব স্ব মহল্লার কমিশনারগণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে ন্যস্ত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তাদের উদ্যোগ ও সফলতা বছরে প্রতি ৩-৪ মাস অন্তর রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মনিটরিং করতে পারেন। যে কমিশনার বা চেয়ারম্যান তার এলাকা বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন তাকে জাতীয় পুরষ্কার প্রদান করা যায়। পক্ষান্তরে যে কমিশনার বা চেয়ারম্যান তার এলাকা নোংরা আবর্জনাযুক্ত অস্বাস্থ্যকর করে রাখেন তাকে পরবর্তী টার্মে নির্বাচনের অনুপযুক্ত ঘোষণা করা যায়।

২। মশা নিয়ন্ত্রণ: শহর ও তার আশেপাশের অঞ্চল অবশ্যই মশামুক্ত করা এবং সেই সাথে মশার বংশ বিস্তার রোধ করা আবশ্যক। এই কাজে কীটনাশক বা অপ্রাকৃতিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে অবশ্যই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ মশা নিধন কাজে ও এর বংশ বিস্তার রোধে কৃত্রিম পদ্ধতি ও কীটনাশক ব্যবহার করলে প্রত্যক্ষভাবে দুটি ক্ষতি হয়। একটি হলো অর্থনৈতিক ক্ষতি-মশা নিধনের জন্য বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় করতে হয় বিদেশ থেকে, ফলে জাতীয় ব্যয় বেড়ে যায়। আর একটি হলো প্রাকৃতিক ভারসাম্যে দীর্ঘমেয়াদী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সুতরাং মশানিধন ও তার বংশ বিস্তার প্রতিরোধে প্রাকৃতিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ময়লা আবর্জনা সমস্যার সাথে মশা ও মশা বাহিত রোগের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। মশা নিধন করার জন্য বিপুল ব্যয় করে দেশ বিদেশে ঔষধ ও নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। মশা ক্ষীণআয়ু প্রাণি। জানামতে এটি মাত্র ১ সপ্তাহ-১০ দিন (পুরুষ ৭ দিন, স্ত্রী ৫ দিন) বাঁচে। এই ক্ষীণজীবী পতঙ্গ মারার জন্য বিপুল আয়োজনের প্রয়োজন নেই। শুধু এর উৎপাদন বা জন্ম নেয়ার পরিবেশ নষ্ট করলেই হয়। এ জন্য শহর বন্দর গ্রাম ময়লা আবর্জনামুক্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। একই সাথে ডোবা নালা পুকুরের পানি ও অন্যান্য উৎস পরিস্কার রাখলেই মশা উৎপাদন বন্ধ হতে পারে। একই সাথে কীটপতঙ্গ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এমন প্রাণিও মশা নিধনের কাজে ব্যবহার করা যায়। এ উদ্দ্যেশ্যে জেলা প্রশাসন পৌরসভা ও বিভিন্ন এনজিও, ক্লাব, সংগঠন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। মশার কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় খুব বিঘ্ন ঘটে। মশার বিস্তার রোধ না করলে এর মাধ্যমে নানা রোগব্যধি মহামারী আকারে দেখা দিতে পারে।

৩। সড়ক ও অলিগলি নির্মাণ এবং মেরামত করা: শহরের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও সহজ করার লক্ষ্যে শহরে পরিকল্পিতভাবে নতুন গলি বা সড়ক নির্মাণ ও বর্তমানের অলি-গলিসমূহের প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

৪। ট্রাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণ: যানজট মুক্ত যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা একটি সুন্দর শহরের অন্যতম প্রধান শর্ত। টাঙ্গাইল শহরে যানজট মুক্ত যানবাহন চলাচল পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অবশ্যই আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে পৌরসভা, জেলা প্রশাসন, যানবাহন শ্রমিক, রিকশা ও

অটোরিকশা শ্রমিক সমিতি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করলে বিষয়টি বাস্তবায়ন সহজ হতে পারে।

৫। বৃক্ষরোপণ, ফুলের গাছ লাগান ও ফোয়ারা নির্মাণ: (ক) প্রত্যেক বাড়িতে, অফিস আদালতে, রাস্তার পাশে, সড়ক আইল্যান্ড ও সম্ভাব্য স্থানে পরিকল্পিতভাবে ফুলের গাছসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ করলে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

(খ) শহরের বিভিন্ন স্থানে, অফিস আদালত, বিপণি বিতানসমূহের সম্মুখে মনোরম ও স্বস্তিদায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ফোয়ারা নির্মাণ করা যেতে পারে। ফোয়ারার পাশে, শপিং মল বা মার্কেটের ভিতরে সুবিধাজনক স্থানে ক্রেতা সাধারণের বসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬। শিশুপার্ক নির্মাণ: শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক। শিশুদের সুষ্ঠু সুন্দর জীবন গঠনের নিমিত্ত চিন্তা-চেতনা বিকশিত করে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশ সুশিক্ষা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শিশুশিক্ষালয় ও শিক্ষালয়ের মধ্যেই শিশুপার্ক নির্মাণ জরুরী। শিশুপার্কে খেলাধুলার পাশাপাশি যাতে শিশুরা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়াদি যেমন- রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার নিয়মকানুন, সড়ক ও রেলপথে ব্যবহৃত বিভিন্ন সিগন্যাল ইত্যাদি শিখতে পারে, সে ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত থাকলে শিশুপার্ক নির্মাণের সার্থকতা বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়টি আমি জাপানে প্রত্যক্ষ করেছি। টাঙ্গাইলের শিশুপার্কে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি ও যাতে অভিভাবকগণ সেখানে শিশুদের নিয়ে যায়, সে বিষয়ে সকলকে উৎসাহী করা প্রয়োজন। শিশুপার্কে কৃত্রিম চিড়িয়াখানাও বানানো যায়।

৭। চিত্তবিনোদন ও অবকাশ কেন্দ্র নির্মাণ

(ক) চিত্তবিনোদন কেন্দ্র: চিত্তবিনোদনের জন্য বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারে। সর্বসাধারণ যাতে এইসব স্থানে নির্মল আনন্দে অবসর কাটানোর সুযোগ পায়, সেদিকে সকলে দৃষ্টি রাখতে পারেন। পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ মন-মানসিকতা পোষণ ও সমাজের বিভিন্ন তথ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

(খ) অবকাশ যাপন কেন্দ্র নির্মাণ: অবকাশ যাপনের জন্য মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করলে শহরের সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি সত্যিই জরুরী। কর্মব্যস্ত মানুষ ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবার পরিজনসহ শান্ত নির্মল পরিবেশে কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে পারলে, তা শরীর মানসিকতার বিশ্রাম ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যা প্রকারান্তরে মানুষের কর্মদক্ষতা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এই লক্ষ্যে জেলা সদরের লেকের পাড়সমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে অবসর যাপনের মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন মহল্লায়, নদীর তীরবর্তী সুবিধাজনক স্থানে অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। টাঙ্গাইল শহরের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত লৌহজং নদ এবং এর পারিপার্শ্বিকতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তার মধ্যে দিয়ে পানির প্রবাহ অব্যাহত রেখে এর দু পাশে জনমানুষের বসার ব্যবস্থা করা যায়।

৮। পথচারি ছাউনি নির্মাণ: শহরের রাস্তার পাশে বিভিন্ন স্থানে পথচারি ছাউনি নির্মাণ করা যায়। এ সকল পথচারি ছাউনিতে প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক দুর্যোগ, অসুস্থ্যতা, শ্রান্তি ক্লান্তির সময় মানুষজন সাময়ি আশ্রয় নিতে পারে। প্রতিবন্ধী ও গর্ভবতী নারীগণও এতে সমস্যার সময়ে সাময়িক আশ্রয়/বিশ্রাম নিতে পারে। এসকল বিষয় বিবেচনা করেই এসব পথচারি ছাউনির নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ করা যায়। পথচারি ছাউনির সাথে ল্যান্ডফোনের ব্যবস্থা করা যায় যাতে এসকল স্থানে অবস্থানরত ও সমস্যাগ্রস্থ মানুষ দ্রুত সাহায্য চাইতে পারে। অবশ্য এসকল স্থানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকাও আবশ্যক। শহরের মত গ্রামের রাস্তার পাশেও পথচারি ছাউনি নির্মাণ করা যায়।

৯। ব্যয়ামাগার নির্মাণ: নগরবাসীর শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডের বা মহল্লায় শরীর চর্চাকেন্দ্র নির্মাণ করা এবং তাতে কিশোর যুবকগণকে নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন করার জন্য উৎসাহী করা প্রয়োজন। এছাড়াও সর্ববয়সের মানুষের শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য এ বিষয়ে আলোচনা ও উপদেশমূলক সেমিনার করা যেতে পারে। একটি বিষয় এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ্য যে, দেশের উন্নয়নে জাতির সুস্বাস্থ্য গঠনের কোনো বিকল্প নেই।

১০। টাঙ্গাইলের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভূক্ত করা ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের মনুমেন্ট স্থাপন: (ক) যে জাতি তার ইতিহাস জানে না, সে জাতি কখনও উন্নতির দিকে অগ্রগামী হতে পারে না। আর ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের যথার্থ মূল্যায়ন ও সম্মান না করা ইতিহাস না জানারই শামিল। কাজেই প্রাচীনকাল থেকে টাঙ্গাইলের ইতিহাস ও যে সকল মনীষী টাঙ্গাইল, দেশের তথা বিশ্বমানবতার কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, তাদের মনুমেন্ট (সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাসসহ) শহরের বিভিন্ন স্থানে বা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে স্থাপন করা যেতে পারে। আর গৌরবধন্য সে সব ইতিহাস বেড়ে ওঠা প্রজন্মকে জানানোর জন্য টাঙ্গাইলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

(খ) জাতির সব থেকে মূল্যবান দলিল হলো তার স্বাধীনতার ইতিহাস। এ দলিলে কি লেখা আছে তা জানা সকল নাগরিকের কর্তব্য। এ লক্ষ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে ও ভাষা আন্দোলনে টাঙ্গাইলের সুযোগ্য সন্তানগণের অবদানের গৌরবগাঁথা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সকল অকুতোভয় বীর সন্তান দেশমাতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বাংলা ও দু/একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

(১১) শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধের যথার্থ যত্ন নেয়া: জাতির পবিত্র স্থান শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধের যথার্থ যত্ন নেয়া আবশ্যক। শহরের স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনারের আঙ্গিনায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনারের যথার্থ মূল্যায়নের নিদর্শন বহন করে।

(১২) মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিতি: যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছে এবং যারা আজও বেঁচে আছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে যাদের অসামান্য কৃতিত্ব ছিল, তাদের বীরত্বগাঁথার ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য জনগণকে শ্রদ্ধার সাথে

জানানোর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে স্কুল, কলেজে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বীর মুক্তিযোদ্ধাকে জীবিত অবস্থায় যথার্থ সম্মানে ভূষিত করার বিষয়টি এর সাথে সম্পৃক্ত।

১৩। শহরের ম্যাপ স্থাপন: শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে যেমন-বাসস্ট্যান্ড, নিরালা মোড়, বেবিস্ট্যান্ড, বিপনি বিতানসমূহ, বিভিন্ন স্কুল কলেজ, পৌরসভা, থানা, জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সম্মুখে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত টয়লেটসমূহ নির্দেশ সম্বলিত ম্যাপ স্থাপন করা যেতে পারে। গণ মানুষের কাজের সুবিধার্থে এটি বাস্তবায়ন করা যায়। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন শহরে এটি প্রত্যক্ষ করা যায়।

১৪। বস্তি স্থাপন রোধ: নগরের মধ্যে বা আশেপাশের এলাকার অবৈধ বস্তি স্থাপন রোধ হওয়া আবশ্যক। তবে নির্মিত বৈধ বস্তি উচ্ছেদ না করে, তার প্রসার রোধ করাসহ বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ যাতে এর অভ্যন্তরে কোনো ধরনের অমানবিক ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা না হতে পারে এবং বস্তি যেন অপরাধীদের অভয়াশ্রমে পরিণত না হয়; সেদিকে ওয়ার্ড কমিশনার, জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ সতর্ক নজর রাখতে পারেন। বিভিন্ন স্থরের জনগণ এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারেন।

১৫। আধুনিক ডিজাইনের ইমারত নির্মাণ: সুন্দর ডিজাইনের ইমারত অবশ্যই শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভালো ডিজাইনের বাড়ি বলতেই সাধারণত নির্মাণ ব্যয় অনেক বেশি বলে মনে করেন অনেকেই। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অল্প ও তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়েও অনেক রুচিসম্মত বাড়ি নির্মাণ করা যায়। টাঙ্গাইলের ঘর-বাড়ি ইমারতের ডিজাইনের প্ল্যানারগণ এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখলে বিষয়টি সার্থক হতে পারে। পৌরসভা ইচ্ছে করলে ইমারতের/বিল্ডিং এর প্ল্যান পাস করার সময় এদিকে লক্ষ্য রাখতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বাড়ির নির্মাতার চিন্তা/সিদ্ধান্তই সর্বাপেক্ষা বিবেচ্য বিষয়।

যে সকল বিষয় বাস্তবায়নের জন্য টাঙ্গাইলের সর্বস্তরের জনগণ সার্থক সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেন, সেগুলো সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

১। উন্নয়নমূলক কাজে জনগণের অংশ গ্রহণ ঃ শহরের উন্নয়নে জনগণের সহযোগিতা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সর্বস্তরের মানুষের অবশ্যই নিজ নিজ কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্চনীয়। মানুষ যেন কখনই শহরের সৌন্দর্য্য ও সার্বিক নিরাপত্তা বিনষ্ট করার কাজ না করেন। অর্থাৎ শহর সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য শুধুমাত্র পৌরসভা ও সরকারী উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। এর সাথে জনগণের অংশ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। আইন করে সব কিছুর উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার জনগণের মধ্যে ও নিজের করনীয় ও পরের অধিকার মূল্যায়ন করাসহ নগরের উন্নয়ন স্বতঃস্ফুর্ত উদ্যোগ ব্যতীত আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এতে সময়ে আইন অকার্যকর হয়ে

যায়। কাজেই নগরের উন্নয়নে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে সাথে জনগণের স্বদিচ্ছার বাস্তবায়ন সমান জরুরী।

২। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া: শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির দিকে নগরবাসীর অধিকতর আগ্রহী হওয়া বাঞ্চনীয়। এই আন্দোলনটি পরিবার থেকেই শুরু করা উচিত। সর্ব শ্রেণির মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা থাকা দরকার যে পরিবারের একজনও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকতে পারে না। শিক্ষার সাথে সাথে প্রত্যেকেই যাতে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির দিকে সমান আগ্রহী হয়, সেদিকে সকল অভিভাবকের লক্ষ্য রাখা দরকার। এটি স্মরণীয় যে, দেশের প্রকৃতই সুনাগরিক হয়ে ও সৎ গুণাবলী নিয়ে বেড়ে ওঠার জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাও সমান জরুরী। তবে অনুজগণ পড়াশোনা, খেলাধুলা, সামাজিক কার্যক্রম যথা সময়ে সম্পন্ন করছে কিনা বা ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে অংশ গ্রহণের নামে কোনো আত্মবিধ্বংসী পরিবেশে মিলিত হচ্ছে কিনা বা নিজেই সৃষ্টি করছে কিনা, সেদিকে অবশ্যই অভিভাবকগণের লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয় ।

৩। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন ও নিরাপত্তা: সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য সামাজিক আন্দোলন সবচেয়ে সার্থক কার্যক্রম। সমাজের ঘাড়ে চেপে বসা সিন্দবাদের দানবের মতো এই অভিশপ্ত সন্ত্রাস সমাজ থেকে নির্মূল করার জন্য প্রত্যেকেরই সামাজিক আন্দোলনে এগিয়ে আসা অত্যাবশ্যক। স্মরণযোগ্য যে, আইনের সঠিক প্রয়োগ ও আইনকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া সন্ত্রাস দমনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুষ্ঠু সুন্দর, চিন্তা-চেতনা বিকাশ করে বেড়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি করা সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই আন্দোলন শুরু হোক টাঙ্গাইল থেকে। টাঙ্গাইলের গণমানুষের অংশ গ্রহণে এই সামাজিক আন্দোলনে উজ্জীবিত হোক সমগ্র দেশ। তবেই ঘাতক ব্যাধি এইডস-এর মতো সন্ত্রাস নামক দানবকে নির্মূল করা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। আমি ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে জাপানে সরকারি প্রশিক্ষণে থাকা অবস্থায় একটি প্রবাদ শুনেছিলাম, 'যে কোনো বয়সের একজন নারী পুরুষ জাপানের সকল স্থানে সর্বসময় নিরাপদ'। আমাদের দেশে আমরাও এটি প্রতিষ্ঠা করার আন্তরিক চেষ্টা করতে পারি। আর এর সার্থক বাস্তবায়ন করার জন্য টাঙ্গাইলের অধিবাসীগণ সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেন। তবে এটির বাস্তবায়নের জন্য শুধু গণমানুষের আন্দোলন নয়, আইনের সঠিক ও নিরপেক্ষ প্রয়োগসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগেরও যথেষ্ট সতর্ক ও উন্নততর পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যথার্থ সচেতনতা ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এটির বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

৪। সুশীল সমাজ: শিশু-কিশোর ও বয়োজ্যেষ্ঠগণের সাথে সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রায়ই দেখা যায় না। এটি আমাদের সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে চরম অন্তরায়। আমি দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের কিশোর-যুবক সম্পর্কে উদাসীনতা। তবে কিশোর/যুবকদের বড়দের শ্রদ্ধা না করার প্রবণতা যতটা বাস্তবে, তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস বিরূপতা থাকে আমাদের মনের ভিতরে অর্থাৎ

প্রত্যেকেরই অন্যকে এড়িয়ে চলার একটি হতাশাজনক পরিবেশ বিরাজ করছে (অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এটির ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়)। এর অবসান ঘটানো দরকার। প্রত্যেক কিশোর-যুবককে তার বয়োজ্যেষ্ঠকে শ্রদ্ধা করার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণেরও ছোটদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা করা প্রয়োজন, আর এই চর্চা শুরু হওয়া দরকার পরিবার থেকেই। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠগণের অনুজদেরকে এই বিষয়ে সুশিক্ষা দেয়া আবশ্যক। সুশীল, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় জাতীয় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সুশীল সমাজ সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান করার জন্য প্রত্যেক পরিবারের সদস্যগণকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। টাঙ্গাইল থেকেই এটির ব্যাপক প্রসার হোক, এটাই প্রত্যাশা।

৫। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ: ক) মাদকদ্রব্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংসের দরজায় নিয়ে যায়। দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি যুবশক্তি। সর্বনাশা মাদকদ্রব্যের বিষাক্ত ছোবল যুব সমাজকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে দংশন করে। যার ফলে তরুণ প্রজন্ম দিনে দিনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। ভেঙ্গে যায় সামাজিক শৃঙ্খলা। সুখ-শান্তিতে বসবাসের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। জাতির মেরুদন্ড সোজা করে দাড়ানোর ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। কোন কোন মাদকের ছোবলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আগমন ও তাদের সুস্থ্যতায় মারাত্মক ক্ষতি হয়। এতে জাতিতে স্বাস্থ্যবান, সদগুনাবলী সম্পন্ন ভবিষ্যত নাগরিকের অভাব দেখা দেয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এটি ভবিষ্যতে জাতিতে নেতৃত্ব সঙ্কট সৃষ্টির প্রয়াস পায়। এমনকি সুনাগরিকেরও প্রকট অভাব হতে পারে। সুতরাং এটি বলা যায় মাদকের কারণে বর্তমান প্রজন্মতো ক্ষতিগ্রস্থ হয়ই উপরন্তু আগামী সময় ও প্রজন্মেও সুনাগরিক ও যোগ্যতর নেতৃত্বে অভাব সৃষ্টি করে। ফলে ভবিষ্যতেও জাতির স্বাভাবিক উন্নয়ন রুদ্ধ হওয়াসহ অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সুযোগ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। পরিবারের কোন সদস্য/প্রতিবেশী যেন মাদকাসক্ত না হয়, সেদিকে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আর মাদকাসক্ত ব্যক্তির যথার্থ চিকিৎসা করার জন্য সবারই দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। মাদকদ্রব্যের বিষাক্ত ছোবল থেকে যুব সমাজ ও দেশ বাঁচানোর জন্য এ সংক্রান্ত আইনের যথার্থ প্রয়োগের পাশাপাশি অবশ্যই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। টাঙ্গাইল থেকে শুরু হোক এই আন্দোলন।

৬। অহিংসা বিনীত ব্যবহার ও পারস্পরিক সহযোগিতা: (ক) জনগণের বিনীত ব্যবহার ও পারস্পরিক সহযোগিতা উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। উদ্ধত আচরণ নয়, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা নয়, একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ বিনয়ী ব্যবহার চর্চা এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক ও পেশাগত কাজে পরস্পরকে আন্তরিক সহযোগিতা করার চেষ্টা করতে পারেন। উন্নতির শীর্ষে অবস্থানকারী জাপানি জাতির মধ্যে আমি এই চমৎকার দিকটি লক্ষ্য করেছি। আমরাও এটি অনুসরণ করে নিজেদের উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

(খ) সুষ্ঠু ও দূরদর্শী পরিকল্পনায় জনগণের সম্মিলিতভাবে কাজে অংশ গ্রহণ করাই হল উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কাজেই ব্যক্তিগত, সামাজিক,

রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ, বিভেদ-বৈষম্য, পরশ্রীকাতরতা ভুলে এবং পরস্পরকে অবমূল্যায়ন করার প্রবণতা পরিহার করে পারস্পারিক সহযোগিতায় একত্রে সকল কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার গঠনমূলক চর্চা শুরু হউক। টাঙ্গাইল হউক এর আদর্শ।

৭। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি ও পরিবারের সচেতন হওয়া আবশ্যক। আমরা উন্নত জীবনযাত্রা বলতে শুধু উচ্চবিত্ত লোকের বিলাসবহুল জীবনযাত্রাকে বুঝে থাকি। এটি আমাদের ভুল ধারণা। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার (যা সহজে ও সুলভমূল্যে প্রাপ্য) স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন হওয়া, আমাদের পরিবেশ উন্নত করার শিক্ষা ও তার বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি সুনাগরিকসুলভ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হওয়া উন্নত জীবনযাত্রার পরিচয় বহন করে। যার যার আয়ের মধ্যেই উন্নত জীবনযাত্রা পরিচালনা করার বিষয়ে সর্বশ্রেণির মানুষকে সচেতন করতে সমাজসেবা অধিদফতর ও বিভিন্ন এন.জি.ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮। পাঠাগার নির্মাণ ও বই পড়ার দিকে আগ্রহ সৃষ্টি: প্রত্যেক মহল্লায় ক্লাব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তাতে পাঠাগার নির্মাণ করা আবশ্যক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন তথ্য, ইতিহাস, কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে জানা, মানসিকতার উন্নয়নে বই পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের বই পড়ার জন্য পাঠাগারে যাতায়াত করার সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা হোক টাঙ্গাইল থেকে, এটিই প্রত্যাশা। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সক্ষম ব্যক্তিগণ নিজ বাড়িতে বইয়ের সংগ্রহশালা গড়তে পারেন। নিজ বাড়ি সুন্দর করে সাজানোর জন্য দামী আসবাবপত্র অপেক্ষা বইয়ের গুরুত্ব অনেক বেশি এটি প্রত্যেকেরই স্মরণ করা বাঞ্চনীয়। 'বই পড়ুন, প্রিয়জনকে বই উপহার দিন' এই সুন্দর বাক্যের বাস্তবায়নে প্রত্যেকেই সচেষ্ট হলে এই আন্দোলন সার্থক হতে পারে। লাইব্রেরির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন জাতির উন্নতির মাপকাঠি। এটিও অবশ্যই স্মরণীয়।

৯। শ্রমের মূল্যায়ন: যে কোনো শ্রমজীবী মানুষের কাজকে সম্মান দেবার লক্ষ্যে উন্নত রাষ্ট্রসমূহে একজন সুইপারও তার কাজ শেষ করে যাওয়ার সময় নিয়োগকর্তা টুপি খুলে তাকে সম্মান দেখায় এবং অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায়। আমাদের দেশের সর্বশ্রেণির মানুষের কাজের মূল্যায়ন ও সম্মান করা শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল-কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে এটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেলার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন এন.জি.ও এ বিষয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেক পেশার মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করা ও শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দেবার লক্ষ্যে পরস্পরের প্রতি সম্মানজনক আচরণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারের রীতিনীতি টাঙ্গাইলের গণমানুষের সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রচলন হবে সারাদেশে-এটাই প্রত্যাশা।

১০। রিকশা ও অটোরিকশা চালকগণের পোষাক: ভারতের দিল্লীতে রিকশা চালকগণ হাঁটুর নিচ পর্যন্ত প্যান্ট বা পাজামা পরিধাণ করেন। শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এটি টাঙ্গাইলে প্রচলন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে পৌরসভা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ

কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। রিকশা ও অটোরিকশা শ্রমিক সমিতির আন্তরিকতা সহযোগিতা এটির বাস্তবায়ন সহজ করতে পারে।

১১। ধূমপান: (ক) যে সকল কারণে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য হলো ধূমপান। টাঙ্গাইলের সকল জনসাধারণকে ধূমপান থেকে বিরত রাখার (বিশেষত কার্যালয়ে, সড়কে ও খোলা স্থানে) জন্য সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করা যায়। বিশেষত যুব-কিশোরদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা খুবই লক্ষণীয়। ধূমপান মাদকসেবী হওয়ার প্রথম ধাপ। কাজেই ধূমপান বিরোধী পরিকল্পনা জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা যায়।

১২। পরিশেষ: আদর্শতম কোনো শহর গঠনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত নগরায়নের কোনো বিকল্প নেই। (অবশ্য পরিকল্পিত শহর গঠনের জন্য উপরিউক্ত সুপারিশ ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ই অন্তর্ভূক্ত) নগরায়নের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা শহরকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক, অপ্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী থেকেও নগরবাসীকে রক্ষা করে। টাঙ্গাইল শহর হোক বাংলাদেশের পরিকল্পিত ও সুন্দরতম নগর প্রতিষ্ঠার সার্থক মাইলফলক। এটাই আন্তরিক প্রত্যাশা।

যাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে
১। টাঙ্গাইল পৌরসভায় কর্মরত কয়েকজন সম্মানীত কর্মচারী ।
২। সচেতন সূধী।

রাজধানীতে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান এবং জাতীয় উন্নয়ন

রাজধানী ঢাকা থেকে বাংলাদেশের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়। নাগরিক সুবিধাও এ শহরে দেশের অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ পেশা, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নানাবিধ প্রয়োজনীয় উপাদান ক্রয়-বিক্রয়, ভ্রমণ, বিনোদন, আত্মীয়তা ইত্যাদি কারণে এ শহরে ছুটে আসে। প্রতিদিন পদচরণা করে শহরের সর্বত্র। সকল কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণভার ঢাকায় থাকার কারণেই বহু মানুষকে এখানে স্থায়ী, অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয়। প্রতিনিয়তই এ সংখ্যা বেড়েই চলেছে যৌক্তিকভাবে । ফলে প্রতিদিনই ঢাকা শহর জন-উত্তাল নগরীতে পরিণত হয়। আবার যে হারে মানুষ গমনাগমন করে অবস্থান করার সুযোগ সৃষ্টি করছে, সে হারে নাগরিক সুবিধা সৃষ্টি ও তা জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু বন্টন, ব্যবহারোপযোগী করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। ঢাকায় বিদ্যমান সকল সমস্যা প্রকৃতপক্ষে ঢাকার কারণে সৃষ্ট নয়। এখানে সৃষ্ট অনেক সমস্যাই জাতীয় উন্নয়নের ভুল প্রক্রিয়ার কুফলে সৃষ্ট। এগুলোর সমাধানের জন্য জাতীয় উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সঠিক হওয়া এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার সম্পর্ক অতি নিবিড়। কাজেই ঢাকায় সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যৌক্তিক কারণেই শুধুমাত্র ঢাকাকেন্দ্রিক সমাধান বিবেচ্য নয়। দেশের উন্নয়নের সঠিক কার্যক্রম গতিশীল ও বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই ঢাকায় সৃষ্ট বহু সমস্যা সমাধান হতে পারে। আর এ উদ্দেশ্যে সকল বিভাগীয় শহর ও অঞ্চলকে সার্বিক বিষয়ে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই। বিভাগীয় শহর বা তার নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থান থেকে প্রত্যেক সরকারি, আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত ব্যক্তি মালিকানাধীন কার্যক্রম যা বিভাগ অঞ্চলে পরিচালিত সে সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা যায় । আবার ঢাকা থেকে বিভাগীয় প্রধান কার্যালয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় । এতে সমস্যা হতে পারে বলে মনে হয় না। কারণ বর্তমানে তথ্য তড়িৎ একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করা যায়। আবার যোগাযোগও আগের তুলনায় দ্রুততর করা যায়। কাজেই বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রিক ক্ষমতায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া চলছে, তা রোধ করে প্রত্যেক অধিদফতর, বিভাগের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ অতিসহজেই করা যায়। একইসাথে শিল্প প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন, উৎপন্ন পণ্য (কৃষি ও শিল্পজাত) কাঁচামাল, খাদ্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিভাগীয় পর্যায়ে বিপণন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা বিবেচনায় আনা যায়। সকল ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যও ক্রিয়াশীল ও প্রসার করা যায় বিভাগীয় অঞ্চলেই। ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার থেকে যাতে কোনো শ্রেণির মানুষ বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্যে সর্বোচ্চ আদালতের বিভিন্ন বেঞ্চ/শাখা প্রত্যেক বিভাগীয় অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। এভাবে বিভাগীয় পর্যায়ে সকল কাজ যদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয় এবং যে স্থান যে কার্যক্রমের উপযুক্ত, সেখানে সে কাজের প্রতিষ্ঠা, আধুনিকায়নসহ বিস্তার লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়, তাহলে বহু কর্মকর্তা, কর্মচারী,

ব্যবসায়ী এককথায় বিভিন্ন শ্রেণির বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢাকায় বসবাস করার এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের ঢাকায় গমনসহ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অবস্থান করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক হ্রাস পেতে পারে। এছাড়াও ঢাকায় অবস্থানরত অনেকেই ফিরে যেতে পারেন বিভাগীয় শহর অঞ্চলে; এমনকি অন্যান্য জেলা শহরে। অবশ্য এর সাথে সকল বিভাগীয় শহর ও জেলা এমন কি আশেপাশের অঞ্চলেও নাগরিক সুবিধা সন্তোষজনকভাবে উন্নীত করা আবশ্যক। উল্লেখিত সমস্যাসমূহ সমাধানের সাথে সকল নাগরিক সুবিধাসহ রাজধানীর আয়তনও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক অবস্থার পরিবর্ধন, বিদ্যমান উন্নয়নের গতি অধিকতর বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখার জন্য এটি অপরিহার্য এবং খুবই ফলপ্রসূ। আবার একইসাথে ঢাকায় সৃষ্ট বহুবিধ সমস্যারও স্থায়ী সমাধান হতে পারে। অবশ্য ঢাকা শহর উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারও এ শহরের বহু সমস্যার অন্যতম কারণ। আবার উন্নয়নের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যে কোনো অঞ্চলকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। ঢাকা শহরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ভুমিকম্পের সাথে ভয়াবহ মহামারী, প্রলয়ঙ্করী টর্নেডো, প্রচণ্ড ভূমিধ্বস বিবেচনায় এনে সমস্যা মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ আবশ্যক। এলক্ষ্যে পানি, বাতাস, পরিবেশ যথাক্রমে বিশুদ্ধ, নির্মল ও স্বাস্থ্যকর করাসহ তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ করা, ভুগর্ভ থেকে পানি উত্তোলন বন্ধ করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ করাসহ এ শহর থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য ঢাকা শহরকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটিরও অবসান হওয়া প্রয়োজন। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঢাকার মাধ্যমে যাতায়াত নয় বরং সরাসরি সহজ ও দ্রুততর যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ করা খুবই জরুরী। বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে সদাশয় সরকার প্রয়োজনে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন।

রূপান্তরযোগ্য সম্পদ ময়লা আবর্জনা

ময়লা আবর্জনা ও তা থেকে সৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গ্রাম ও শহরাঞ্চলের প্রকটতর সমস্যা। মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনের কারণেই ময়লা আবর্জনা সৃষ্টি হয়। বস্তুত মানুষের ব্যবহৃত মালামাল, খাদ্য সামগ্রীর অসারাংশ এবং অতিরিক্ত অংশ ও ব্যবহারের পর অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রই ময়লা আবর্জনা। কাজেই ময়লা আবর্জনা উৎপন্ন হওয়া রোধ করা একেবারেই অসম্ভব এবং তা চেষ্টা করা মোটেও বিচক্ষণ নয়। তাই খাদ্য সামগ্রী নষ্ট না করা ও জিনিসপত্রের সঠিকভাবে ও উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার এবং তাতে উৎপন্ন তুলনামূলকভাবে কম ময়লা আর্বজনা মানুষের উপকারী কাজে ব্যবহার করার পদক্ষেপ নেওয়াই শ্রেয়তর। আবার ক্ষতিকর ময়লা আবর্জনা উপকারী বস্তুতে রূপান্তরিত হলে ময়লা আবর্জনার কারণে সৃষ্ট সমস্যা সহজেই সমাধানযোগ্য হয়। ময়লা আবর্জনার মাধ্যমে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক লাভজনক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত ও বিকাশমান হতে পারে। এ লক্ষ্যে ময়লা আবর্জনার সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

ডাষ্টবিনের ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করার লক্ষ্যে এমনকি শহর গ্রামে যত্রতত্র ফেলে দেওয়া ময়লা আবর্জনা দূর করার জন্য কোন কোন ধরনের ময়লা উৎপন্ন হয় তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উৎপাদিত ময়লা আবর্জনাগুলির মধ্যে খাদ্য সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, পোষাক, প্লাস্টিক, কারিগরী দ্রব্যাদী, প্রাণিজ বর্জ্য, কারখানার বর্জ্য, ধোঁয়া ও দূষিত গ্যাস ইত্যাদি প্রধান। ধরণ অনুযায়ী ময়লা আবর্জনা উপকারী কাজে ব্যবহারের উপযোগী করা যায়। সাধারণত ৭ ধরনের ময়লা আবর্জনা উৎপন্ন হয়। যেমন- ১) তরিতরকারী খোসা। ২) খাদ্য সামগ্রীর উচ্ছিষ্ট ও প্রাণিজ দেহাবশেষ। ৩) ধাতব ও অধাতব পদার্থের শক্ত আবর্জনা। ৪) কাগজ ও কাপড়ের আবর্জনা এবং ৫) বায়বীয় আবর্জনা। ৬) চিকিৎসাজনিত ময়লা আবর্জনা। ৭) মিল কারখানায় উৎপন্ন বর্জ্য।

প্রতিকারের উপায়

১) তরিতরকারীর খোসা

এ ময়লা আবর্জনা দ্বারা বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ করে তাতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তাতে ময়লা থেকে উৎপাদিত গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এতে জ্বালানী হিসাবে বর্তমানে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার অনেক কমে যেতে পারে। অধিকন্তু বায়োগ্যাস প্লান্টের উন্মেষ ঘটতে পারে ও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের জন্য গাছ-পালা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর চাপ বিপুলাংশে হ্রাস পেতে পারে। বায়োগ্যাস প্লান্টে ব্যবহৃত আবর্জনার অবশিষ্টাংশ সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আবার এ ময়লা আবর্জনার দ্বারা সরাসরি সার উৎপন্ন করে শস্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়। এধরনের সারের ব্যবহার রাসয়নিক সারের ব্যবহার বিপুলাংশে কমিয়ে দিতে পারে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অত্যন্ত সহায়ক। আবার কৃষক সস্তায় ও সহজে সার পেতে পারে।

অধিক শস্য উৎপাদনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আবার এ আবর্জনা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে গবাদি পশু পালন শিল্পেও ব্যবহার করা যায়।

২) উচ্ছিষ্ট খাদ্য ও প্রাণিজ দেহাবশেষ

খাদ্য খাবার অপচয়ের কারণেই খাদ্য উচ্ছিষ্ট হয়। যা ময়লা আবর্জনার এক বিরাট অংশ এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং খাদ্য খাবার যাতে অপচয় না হয় সে লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা ও ইউনিয়ন কাউন্সিল জনসচেতনা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। আবার খাদ্য খাবারের সাথে প্রাণিজ দেহাবশেষও ময়লা আর্বজনায় পরিণত হয়। এ ময়লা আর্বজনার কারণেও পরিবেশ দূষণ হয়। উৎপন্ন এসব আবর্জনা কৃত্রিমভাবে ধ্বংস করা যায়। কিন্তু এটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত। কাজেই প্রাকৃতিকভাবে এ আবর্জনা ধ্বংস করাই যুক্তিযুক্ত। প্রাকৃতিকভাবে এ আবর্জনা দূর করার লক্ষ্যে যে সকল প্রাণী উচ্ছিষ্ট খাদ্য ও প্রাণিজ দেহাবশেষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে যেমন- কাক, শকুন, চিল, কুকুর, শিয়াল, জলজ প্রাণী ইত্যাদির অভয়ারণ্য অথবা বসবাস করার উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ ও তৈরী করা যায়। তবে এগুলো যাতে মানুষের ক্ষতিকর সংখ্যায় বৃদ্ধি না পায় ও অস্বাভাবিক আচরণ না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এ পদ্ধতিতে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করা যেতে পারে। জীব-বৈচিত্র পরিবেশের অংশ। কাজেই জীব-বৈচিত্র সহায়ক কার্যক্রম পরিবেশ সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে ময়লা আবর্জনা দূর করার কারণে রাসায়নিক বা কৃত্রিম পদ্ধতিতে ময়লা আবর্জনা ধ্বংস করার ব্যয় ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিপুলভাবে কমে যেতে পারে। ময়লা আবর্জনা উৎপন্ন হওয়া রোধ করার জন্য শুধুমাত্র বাসা বাড়িতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাদ্যদ্রব্য উচ্ছিষ্ট হওয়া রোধ করার সাথে সাথে হোটেল রেস্তেরা গুলোতে খাদ্যদ্রব্য উচ্ছিষ্ট হওয়া রোধ করা আবশ্যক । অনেক সময়ই হোটেলের গ্রাহকগণ যে খাদ্যদ্রব্য প্লেটে নেন তার কিছু অংশ বা অনেক পরিমাণ খাদ্যই প্লেটে রেখে যান। উৎপন্ন অতিরিক্ত উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্যে নিম্নোক্ত ক্ষতি হয়-

১। জাতির অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়।

২। সামাজিক সম্পদের অপচয় হয়। কারণ- খাদ্যদ্রব্য তৈরীর সকল উপাদানই সমাজ সরবরাহ করে।

৩। উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্যই পরে ময়লা আবর্জনায় পরিণত হয়। আর এটি থেকেই পরিবেশ দূষণ হয়। কাজেই কোথাও কোন বাসাবাড়ি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি এবং হোটেল রেস্তোরায় যেন খাদ্যদ্রব্য উচ্ছিষ্ট না হয় সে দিকে সকল শ্রেণির মানুষের সচেতন থাকা বাঞ্চনীয়। এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ভাবে খাদ্যদ্রব্য উচ্ছিষ্ট করলে উন্নত বিশ্বের মত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৩) ধাতব অধাতব পদার্থের শক্ত আবর্জনা

এ সকল আবর্জনা রিসাইকেল করে প্রয়োজনীয় মালামাল উৎপাদন করা যায়। এ পদ্ধতির ব্যাপক উন্নয়নে এ ধরনের ময়লা আবর্জনা দূর করাসহ প্রয়োজনীয়

উপকরণাদী সস্তায় বাজারজাত করা যেতে পারে। অব্যবহারযোগ্য আবর্জনা সরাসরি ধ্বংস করে দেয়া যায়। ধাতব অধাতব পদার্থের শক্ত আবর্জনা ও কাগজ কাপড়ের আবর্জনা মানুষজন ডাষ্টবিনে ফেলে দেওয়ার আগেই আলাদা করে রাখতে পারে। পরবর্তীতে এতদসংশ্লিষ্ট শিল্পে বিক্রয় করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে। এতে আর্থিক লাভ ও ময়লা আবর্জনা দূর করা উভয়ই হতে পারে। অবশ্য সব ধরনের ময়লা আবর্জনার উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা করে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করা যায়। তাহলে ময়লা আবর্জনা উৎপন্নকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ডাষ্টবিনে ময়লা ফেলার আগেই এগুলো ব্যবহারকারীদের কাছে আলাদাভাবে হস্তান্তর করতে পারে। তাতে ডাষ্টবিনের ময়লা আবর্জনার পরিমান একেবারেই কমে যেতে পারে। আর শহর-নগর-বন্দর-গ্রামও অনাকাঙ্ক্ষিত ময়লা আবর্জনার দূষণে দুষিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। প্লাস্টিক সামগ্রী এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যতে ক্ষতিকর দ্রব্য যথাসম্ভব কম ব্যবহার করার নিমিত্ত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

৪) কাগজ ও কাপড়ের আবর্জনা

এই আবর্জনা আলাদা করে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারযোগ্য শিল্পে বিক্রি ও ব্যবহার করা যায়। এটি একটি অর্থনৈতিক লাভজনক উদ্যোগ হতে পারে। এ শিল্পে প্লাষ্টিক ও পলিথিনে বিকল্প ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন করা যায়। যা পরিবেশ রক্ষায় খুবই সহায়ক হতে পারে।

৫) বায়বীয় আবর্জনা

মিল কারখানা, যানবাহন ও বাসাবাড়ি থেকে নির্গত বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং কার্বনমনোক্সাইড ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসই বায়বীয় আর্বজনা। এই আবর্জনা বাতাসে মিশে ছড়িয়ে যায়। ফলে বায়ু দুষণ হয়। বায়ু দূষণে শুধু রাজধানী ঢাকাতেই গত ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে এক বছরের ২২ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দুই সংস্থা হেলথ ইফেক্টস ইনস্টিটিউট ও ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিকস এর এক প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে বায়ু দুষণের শীর্ষ অবস্থানকারী শহরগুলোর মধ্যে ঢাকার অবস্থান পঞ্চম। এ দেশে বায়ু দূষণে বছরে ১ লাখ ৯৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ভারতে বায়ু দূষণের কারণে গত ২০১৯ সালে ১৬ লাখ ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বাতাস এ বায়বীয় বর্জ্য মুক্ত করে নির্মল করার জন্য বায়ু বিশোধন (Air Treatment) প্লান্ট নির্মাণ করা যায়। এ প্লান্টের মাধ্যমে বাতাসে মিশ্রিত বর্জ্য থেকে কার্বন ও অক্সিজেন আলাদা করে বিশুদ্ধ অক্সিজেন বাতাসে সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়। পৃথক হওয়া কার্বন কার্বন সংশ্লিষ্ট শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে নয় প্রযুক্তি ব্যবহার করেও বায়ু দূষণ রোধ ও বাতাস বিশুদ্ধ করা যায়।

উপরোক্ত শিল্পসমূহ প্রতিষ্ঠায় সরকারী বিশেষ সহযোগিতা থাকা শ্রেয়তর। আবার সিটি কর্পোরেশন / পৌরসভা নিজ উদ্যোগে ও নিজ অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। আবার এ থেকে আয়লব্ধ অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করতে পারে। পরিকল্পিত নগরায়নে ময়লা আবর্জনা কম উৎপন্ন হয় এবং উৎপাদিত ময়লা আবর্জনার কারণে জনগণের ক্ষতিও কম হয়। কাজেই ময়লা আবর্জনার সমস্যা না হওয়ার জন্য পরিকল্পিত নগরায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭) চিকিৎসাজনিত ময়লা আবর্জনা

বিভিন্ন ডাক্তারখানা, ক্লিনিক ও হাসপাতালসমূহে উৎপন্ন বর্জ্য সমূহ যেমন, ব্যবহৃত সুই, সিরিঞ্জ, তুলা, ব্যান্ডেজ, স্যালাইনের প্যাকেট, ঔষধের মোড়ক, ডাক্তারি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এবং চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসপত্র থেকে রোগজীবাণু ও দুর্গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে যা মানুষকে সরাসরি নানা রোগে আক্রান্ত করে এবং পরিবেশ মারাত্মক দূষণ করে। কাজেই এসকল বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলে পোড়া ছাই নির্দিষ্ট স্থান বা মাটির নিচে পুতে ফেলা যায়। এতে উপরোল্লিখিত দূষিত ও রোগজীবাণুপূর্ণ দ্রব্যসমূহ থেকে পরিবেশ ও মানুষজনের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা একেবারেই কমে যেতে পারে

৮) বিভিন্ন মিল ইন্ডাস্ট্রিতে উৎপন্ন কঠিন তরল ও বায়বীয় বর্জ্যসমূহ সঠিক ও কার্যকরী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধ্বংস ও পরিশোধন না করার ফলে এ সকল বর্জ্যের কারণে ইন্ডাস্ট্রির আশেপাশের বাতাস, ভূমি ও নদ-নদীর পানি দূষণের শিকার হয় যা পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের উপর অত্যন্ত হুমকি সৃষ্টি করে। ইন্ডাস্ট্রির অভ্যন্তরেই এ সকল বর্জ্য ধ্বংস ও পরিশোধন করার ব্যবস্থা থাকা শ্রেয়তর। ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণের সময়ই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, নির্মিতব্য ইন্ডাস্ট্রিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রাখা হয়েছে কি না। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকরী সকল ইন্ডাস্ট্রিতে উৎপন্ন বর্জ্য ধ্বংস ও পরিশোধন করার নিমিত্ত উপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আছে কি না এটি জরিপ করা যায়। যে সকল ইন্ডাস্ট্রিতে প্রয়োজনীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই সে সকল ইন্ডাস্ট্রির কর্তৃপক্ষকে জনমানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে অবিলম্বেই প্রয়োজনীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ করতে বাধ্য করা যায়। শিল্পে উৎপন্ন বর্জ্য রিসাইকেল করে পুনরায় শিল্পে ব্যবহার করা যায় আবার অনেক ধরনের শিল্প বর্জ্য বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে ব্যবহার করে অন্য শিল্পও প্রতিষ্ঠা করা যায়।

অধিক জনসংখ্যার কারণে সৃষ্ট ময়লা আবর্জনা সমস্যা

বাংলাদেশ ছোট আয়তনের একটি দেশ। এদেশের ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ২১০ বর্গ কিলোমিটারে ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬ জনের বসতি। এ ছোট দেশে বিপুল জনসংখ্যা আধিক্যের কারণে স্বল্প পরিসরে খুব ঘনবসতি গড়ে উঠেছে (বিশেষত শহর অঞ্চলে)। যার ফলে দেশটি নানান সমস্যায় জর্জরিত। এ সকল সমস্যাসমূহের মধ্যে ময়লা আবর্জনা সমস্যা একটি প্রকটতর সমস্যা। এ সমস্যা সমূহ দ্রুত সমাধান না হলে সমগ্র দেশকে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী করে ফেলতে পারে। এ সমস্যা যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য প্রথমত মানুষকে জনসংখ্যার

আধিক্যে কুফল সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। আবার কোন এলাকায় যাতে অতিরিক্ত জনবসতি গড়ে না উঠে সে দিকেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে, রাস্তা, মাঠ, ড্রেন পানির উৎস ইত্যাদিতে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার চর্চা করা ও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট স্থানে জমানো ময়লা ব্যবহারপযোগী এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ধ্বংস কওে ফেললে সমস্যা আশানুরূপ সমাধান হতে পারে। সুষ্ঠু পরিকল্পনায় নগর গ্রাম বন্দর নির্মাণ করলেও বর্ণিত সমস্যা ক্ষতিকর হওয়ার সুযোগ কমে যায়। যেহেতু, জনসংখ্যা সমস্যা শুধুমাত্র জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা কমিয়ে দেয় না বরং ময়লা আবর্জনা সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিকে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কাজেই ময়লা আবর্জনামুক্ত সুন্দর পরিচ্ছন্ন নগর ও গ্রাম বিনির্মাণের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সুপরিকল্পিত নগর গ্রাম বন্দর বিনির্মাণও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ময়লা আবর্জনা সমস্যা এত প্রকট হয়েছে যে, এর থেকে সৃষ্ট দুষণের কারণে অচিরেই মনুষ্য প্রজাতিকে এ সবুজশ্যামল সুন্দর ধরণী ত্যাগ করে অন্য কোন গ্রহের দিকে অগস্ত যাত্রা করতে হতে পারে। কাজেই ময়লা আবর্জনা সমস্যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে অতি দ্রুত সমাধান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে নিজ নিজ এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিশনার ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। যে জনপ্রতিনিধি তার এলাকা যত বেশি ময়লা আর্বজনামুক্ত, বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে পারে তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে তত বেশি সম্মান ও মূল্যায়ন করা এবং পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা যায়।

তথ্য সূত্র:

১) দৈনিক জনকণ্ঠ — তারিখ :- ২৩/০৬/২০১৯ খ্রি.
২) দেশ রূপান্তর — তারিখ:- ২৩/১২/২০২০ খ্রি.
৩) গুগল — তারিখ:- ১২/৮/২০২২ খ্রি.
৪) বাংলাদেশ প্রতিদিন — তারিখ:- ১৮/৮/২০২২ খ্রি.

জলাবদ্ধতা নিরসন

কোন স্থানে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পানি এসে অপসারিত না হয়ে দীর্ঘদিন জমে থাকলে জলাবদ্ধতা হয়। জলাবদ্ধতা বর্তমানে এদেশে বিভিন্ন এলাকায় একটি সাধারণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। গ্রাম্য অঞ্চলে সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে জলাবদ্ধতা হয়। আর শহরাঞ্চলে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উভয় প্রক্রিয়ায় জলাবদ্ধতা হয়। জলাবদ্ধতার কারণে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হয়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ-পোকামাকড় বেশি হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়, শিক্ষা, শিল্প ও জনসাধারণের কাজকর্ম খুবই বাঁধাগ্রস্থ হয়। আবার রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও ব্যাহত হয়। কাজেই জলাবদ্ধতা দ্রুত নিরসনের এবং যাতে জলাবদ্ধতা না হয় সে বিষয়ে গুরুত্বের সাথে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। এ লক্ষ্যে জলাবদ্ধ হওয়ার স্থান ও কারণ অনুসন্ধান করে তা নিরসনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সাধারণত তুলনামূলকভাবে নিচু স্থানে জলাবদ্ধতা হয়। আর নিচু স্থানে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরসন করা কঠিনতর হয়। শহর আর বন্দরের সকল স্থান অপরিকল্পিতভাবে, ত্রুটিপূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় গড়ে উঠলে সকল স্থান সমান সমতল হয় না কোথাও উঁচু আবার কোথাও নিচু হয়। পানির স্বাভাবিক ধর্মের কারণেই নিচু স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ ২টি।

১) প্রকৃতিক কারণ এবং

২) অপ্রাকৃতিক কারণ।

<u>১) প্রাকৃতিক কারণ ও সমাধান</u>

কোন স্থানে প্রাকৃতিকভাবে পানি এসে এবং প্রাকৃতিক কারণে সে পানি অন্যত্র প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ না থাকলে জলাবদ্ধতা হয়। অতি প্রাচীনকালে ভূমি গঠন প্রক্রিয়ায়, নানা প্রাকৃতিক দৈব দুর্যোগে কোথাও ভূমি নিচু হলে, গর্ত সৃষ্টি হলে সেখানে পানি জমে থাকলে এবং সে স্থান থেকে পানি অপসারিত হতে না পারলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। আবার কোন স্থানের চারিপাশ উঁচু হয়ে উঠলে এবং এ স্থান থেকে পানি নিষ্কাশনের সুযোগ না থাকলে বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছাসে পানি জমলে ও জমে যাওয়া পানি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অপসারিত না হলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এটি জলাবদ্ধতার প্রাকৃতিক কারণ। ভূমি সমান করা হলে নির্দিষ্ট স্থানে পানি জমে থাকার সুযোগ থাকে না। আবার যে সকল স্থানে পানি জমে সে সকল স্থানের আশে পাশে কোন খাল নদী থাকলে তার সাথে জলাবদ্ধ স্থানের সংযোগ খাল নালা খনন করে জলাবদ্ধতা নিরসন করা যায়। প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিকভাবে যে সমস্যা সৃষ্টি হয় সে সমস্যাকে সমস্যা হিসাবে গণ্য না করে সমস্যা থেকে কোন ধরণের উপকার পাওয়া যায় কিনা এটিও ভাববার বিষয়। অর্থাৎ সৃষ্ট সকল প্রতিকূলতাই মানুষের অনুকূলে এনে তাতে উপকারী পরিবেশ/উপাদান পাওয়া যায় কিনা এটি বিচার বিবেচনাযোগ্য। এতে সৃষ্ট অনেক সমস্যার উপাদানই সম্পদে রূপান্তর হতে

পারে। প্রাকৃতিকভাবে কোন স্থানে পানি এলে তা থেকে পানি অপসারণের জন্য পূর্বে সৃষ্ট সমস্যা বা প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে জলাধার খনন করে তার সাথে জলাবদ্ধ স্থানের সংযোগ করা যায়। আবার ড্রেন নির্মাণ ও পূর্বে নির্মিত ড্রেনের মাধ্যমে অবাধে জলাবদ্ধতার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায়।

বৃষ্টির পানি ও বন্যার পানির কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা ঃ বৃষ্টির পানি ও বন্যার পানি কোন এলাকা থেকে সহজে বের হয়ে যেতে না পারলে জলাবদ্ধতা হয়। এ পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় খাল-নদীর অনেক গুরুত্ব। কারণ বন্যার সময় পানি প্রবেশ করলে সে পানি নিস্কাশনে জন্য বিশাল আকার ড্রেন নির্মাণ করা সম্ভব নয়। আবার এটিও সত্য যে, বন্যার পানি ৫/১০ বছরে শহরে একবার প্রবেশ করে। কাজেই এই সাময়িক সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ব হতে বিশাল আকারের ড্রেন নির্মাণ করে রাখা অযৌক্তিক। আবার বৃষ্টির পানি নিস্কাশনের জন্য অনেক বড় ড্রেন নির্মাণ করাও সমীচিন নয়। স্বাভাবিক উন্নত ড্রেনের ব্যবস্থাই এটি নিরসন সম্ভব হতে পারে। স্মরণীয় শহর নগর পরিকল্পিত না হলে নিচু স্থানে পানি জমে আর তা থেকে জলাবদ্ধতা হয়। কাজেই শহরের সকল স্থান ও বর্ধিতাংশ যদি একই সমতলে হয় এবং পানি প্রবাহে বিঘ্ন না থাকে তাহলে বন্যার পানি বৃষ্টির পানি সহজে স্বাভাবিক ভাবে শহর অতিক্রম করে অপর দিকে প্রবাহিত হতে পারে। এতে জলাবদ্ধতা হওয়ার সুযোগ একেবারেই থাকে না। তবে বন্যা ও বৃষ্টির পানি দ্রুত ও অধিকতর সহজে নিস্কাশনের জন্য শহর নগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রাকৃতিক খাল-নদীর সহযোগিতা নেওয়া যায়। প্রয়োজনে শহরের মধ্যে কৃত্রিম খাল-নালা খনন করে তার মাধ্যমেও বন্যা ও বৃষ্টির পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করা যায়। অবশ্য বৃষ্টির পানি নিস্কাশনের জন্য আলাদা ড্রেন নির্মাণ করা যায়। তবে বৃষ্টির পানি নিস্কাশনের ড্রেনের সাথে ময়লা আবর্জনা মিশ্রিত পানি যেন কোন অবস্থাতেই না মিশতে পারে। তা না হলে সময়ে খনন ও নির্মাণ করা প্রত্যেকটি খাল-নালা ও ড্রেন দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমায় পরিণত হতে পারে। যা শহরের পরিবেশ নষ্ট করে দিতে পারে। জলাবদ্ধতা হতে ড্রেন ব্যতীত পানি খাল-নালা প্রবাহিত করা সম্ভব নয়। আবার খাল-নালা না থাকলেও জলাবদ্ধতার পানি শুধুমাত্র ড্রেনের মাধ্যমেই শোধনাগারে নিয়ে দুষণমুক্ত করে বড় পানির উৎসে স্থানান্তর করা যায়। ব্যবহৃত পানিও শুধুমাত্র ড্রেনের মাধ্যমেই দূরে কাঙ্ক্ষিত স্থানে সরিয়ে দেওয়া যায়। উভয়ক্ষেত্রেই ড্রেন ব্যতীত খাল-নালার কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারীতা নেই। কাজেই জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য প্রাকৃতিক খাল-নালা অস্তিত্বের সাথে উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা সমানই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য শোধনাগার থেকে শোধিত পানি পুনরায় ব্যবহারের জন্য শহর-নগরে সরবরাহ করা যায়। বিশেষত বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও শোধন করে ব্যবহার করা যায়।

২) অপ্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট সমস্যা ও সমাধান

ক) অপরিকল্পিত নগরায়ন ঃ অপরিকল্পিত নগরায়ন, গ্রাম গঠন প্রক্রিয়ায় জলাবদ্ধতা হওয়ার বড় ধরনের সুযোগ থাকে। আবার ত্রুটিপূর্ণ অপূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায়ও নানা সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকে। এসবের মধ্যে জলাবদ্ধতা অন্যতম সমস্যা। সাধারণত অপরিকল্পিত নগরায়নে জনসাধারণ নিজের ইচ্ছানুযায়ী ঘরবাড়ী,

দালানকোঠা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ভবন গড়ে তোলে। আবার এসব নির্মাণে অন্যান্য স্থানের উচ্চতার সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে না। অর্থাৎ এসকল স্থান অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উঁচু অথবা নিচু হয়। ফলে এ সকল স্থান থেকে জনগণের ব্যবহৃত পানি, বৃষ্টির পানি, বন্যার পানি সহজে বিঘ্নহীনভাবে বের হয়ে যেতে পারে না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের সুযোগ থাকলেও সেগুলো হয় অপর্যাপ্ত এবং অপরিকল্পিত ও ক্রুটিপূর্ণ। যার ফলে এগুলোর তেমন ফলপ্রসু হয় না। আবার চারিদিকের বা অন্য কোন উঁচু স্থান থেকে পানি আসা বন্ধ করারও কোন সুযোগ না থাকার থাকার কারণে নিচু স্থানে ক্রমান্বয়ে পানির পরিমাণ বাড়তেই থাকে এবং প্রকট জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। সুতরাং বলা যায় অপরিকল্পিত, ক্রুটিপূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় গ্রাম-নগর গড়ে তোলাই জলাবদ্ধতার প্রধানতম কারণ। একইভাবে নগরের বর্ধিত অংশের জন্যও পূর্ব পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জতা ও পূর্ণ সংযোগ রেখে মূল পরিকল্পনারই বর্ধিত অংশ হিসাবে বাস্তবায়ন করে নগর বা গ্রামের উন্নয়ন করা যায়। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকা এবং এটি প্রয়োজনে সুপরিকল্পিত ভাবে এক্সটেনশন করা প্রয়োজন। ড্রেনেজ ব্যবস্থার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের সাথে বিবেচনাযোগ্য হল ড্রেনের গভীরতা একটি নির্দিষ্ট স্থানের তুলনায় সকল স্থানে অপরিবর্তিত রাখা এবং একই প্রযুক্তিগত কৌশলে সর্বস্থানে সমান বাস্তবায়ন করা যায়। অন্যথায় পানি স্বাভাবিক ধর্মের কারণে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়ে নিচুতম স্থানে এসে জমা হয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে। পাম্পের সাহায্যে এ পানি দূরে সুবিধাজনক স্থান বা অন্যান্য ড্রেনে ফেলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সংখ্যক ও যথার্থ শক্তিশালী কারিগরি সরঞ্জাম উন্নততর প্রযুক্তি অনুসরণ করা যায়। ড্রেনের সঠিক আকার (গভীরতা, প্রশস্ততা, দৈর্ঘ্য,) এক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচনাযোগ্য। যে স্থানে পানি জমে থাকে সেই স্থানের নিকটবর্তী স্থানে শোধনাগার করে সেখানে পানি দুষণমুক্ত করে পুনরায় সরববাহের ব্যবস্থা করা যায়। শোধনকৃত পানি গৃহস্থালির সাধারণ কাজ ও শিল্পে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায়। এতে এ স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার ও বাইরের থেকে পানি সরবরাহ কমে যেতে পারে। এটি একদিকে জলাবদ্ধতা নিরসনে সহায়ক অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক। সর্বপরি পানির সরবরাহ ও ভূগর্ভের পানি উঠানোর ব্যয় অনেক কমে যায়। উঁচু স্থান হতে নিচু স্থানে যাতে পানি না আসতে পারে তার ব্যবস্থা রাখলে নিচু স্থানে তুলনামূলকভাবে কম জলাবদ্ধতা হতে পারে। নগর পরিকল্পনায় ড্রেনের অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য। নগরের জলাবদ্ধতা না হওয়ার জন্য সুপরিকল্পিত নগরায়ন এবং সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

খ) ড্রেনের ডিজাইন প্ল্যান : কোন স্থানে ব্যবহৃত পানি ও প্রাকৃতিক পানির (বিশেষত বৃষ্টির পানি) পরিমানের তুলনায় নির্মিত ড্রেনের গভীরতা, প্রশস্থতা কম হলে পানি ড্রেন দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দূরে যেতে পারে না। কেননা পানিতে ড্রেন ভরে যায় এবং ড্রেন উপচিয়ে চারিদিকে সয়লাব করে দেয় ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। কাজেই কোন

স্থানে প্রাকৃতিকভাবে আগত পানি ও ব্যবহৃত পানির পরিমানের উপর নির্ভর করে ড্রেনের ডিজাইন ও প্ল্যান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ) ড্রেন নির্মাণ ও মেরামত : জলাবদ্ধতা না হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ড্রেন নির্মাণ করা প্রয়োজন। অপর্যাপ্ত ড্রেনের মাধ্যমে সন্তোষজনক পরিমাণ পানি নিষ্কাশিত হয় না। ফলে কোন স্থানে অপর্যাপ্ত ড্রেনের কারণেও জলাবদ্ধতা হয়। আবার নির্মিত ড্রেন মেরামতযোগ্য হলে তার মধ্যে দিয়ে পানি প্রবাহ অবাধ হয় না। ফলে ড্রেনের পানি চারিদিক ডুবিয়ে দিতে পারে ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই কোন এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ড্রেন নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণসহ সময়ে প্রয়োজনীয় মেরামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা সর্বক্ষণ কার্যকর রাখা জলাবদ্ধতা নিরসনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থা ব্যতীত নগরে মনুষ্য ব্যবহৃত পানি ও প্রাকৃতিকভাবে আবদ্ধ পানি নিস্কাশন সম্ভব নয়। আবার পানি নিস্কাশনে ক্রুটি থাকলে বা অবাধ প্রবাহে পানি নিস্কাশিত না হলে জলাবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। এজন্য দক্ষতর প্রযুক্তিতে ড্রেন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ড্রেন নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন স্থানকে আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। অর্থাৎ ড্রেনের গভীরতা একটি নির্দিষ্ট স্থান এর সাথে তুলনা করে সর্বত্র একই সমান রাখা আবশ্যক । এ আদর্শ স্থান /পয়েন্ট ড্রেনের পানি যে স্থান দিয়ে নিষ্কাষণ হয় সেই স্থান/পয়েন্ট হওয়াই সর্বোত্তম। এ পয়েন্ট/স্থান ড্রেনের অন্যান্য স্থান থেকে ঢালু হওয়া আবশ্যক। এতে সহজে ও সাবলিলভাবে ড্রেনের পানি নিষ্কাষণের প্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। স্মরণীয়, ড্রেনের পানি নিষ্কাশনের প্রান্ত যদি খাল নদী বা জলাধারের সথে সংযুক্ত করা হয় তাহলে পানি নিষ্কাষণের মুখ/ প্রান্ত যেন খাল নদী ও জলাধারের পানির স্বাভাবিক উচ্চতা অপেক্ষা উঁচুতে অবস্থিত হয়। উল্লেখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন না হলে ড্রেনের মাধ্যমে সুষ্ঠ ও বিরতিহীন ভাবে পানি প্রবাহ অব্যহত থাকে না। এতে স্থানে স্থানে নোংরা ও দূষিত পানি স্থায়ীভাবে জমে থাকাসহ সময়ে সময়ে ড্রেনের মধ্যে দিয়ে পানি বিপরীত দিকে/ভিতরের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে ড্রেন সময়ের ব্যবধানে মারাত্মক পরিবেশ দূষণের কারণ হয়। আবার ড্রেনের মধ্যেও স্থায়ী/অস্থায়ী জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। কাজেই এ বিষয়ে ড্রেনের সুষ্ঠু ও সঠিক ডিজাইন প্ল্যান করা এবং সেগুলো বাস্তবায়নে দক্ষতর ও কঠোর নজরদারি থাকা বাঞ্ছনীয়।

ঘ) ড্রেনের মধ্যে পানির প্রবাহ অব্যাহত রাখা: নোংরা, ময়লা, দূষিত পানি ও বৃষ্টির পানি শোধনাগারে, কোন জলাধারে অথবা কোন প্রত্যাশিত স্থানে প্রবাহিত করার জন্য ড্রেন নির্মাণ করা হয় । বর্তমানে ড্রেনের অবস্থা এমনই যে, সকল ড্রেনের প্রতি বর্গ ইঞ্চি ময়লা আবর্জনায় ভরপুর। যেন ড্রেন ময়লা আবর্জনার আধার। অর্থাৎ ড্রেন এবং ডাস্টবিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটি হওয়ার কথা নয়। জনগণ ডাস্টবিনের পরিবর্তে ড্রেনে অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ফেললে এ সকল দ্রব্যে ড্রেন ভরে যায়। আবার নির্দিষ্ট সময় পর পর ড্রেন পরিস্কার করে ময়লা আবর্জনা মুক্ত না রাখার কারণে ড্রেন ময়লা আবর্জনায় ভরে যায়। যার ফলে ড্রেনে পানির প্রবাহে বিঘ্ন

ঘটে এবং পানি উপচিয়ে ড্রেনের দুই পাশে/একপাশে নোংরা ময়লা পানির বা বৃষ্টির পানি জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। এ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে ড্রেনে ময়লা ফেলা রোধ করার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কারণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ ব্যতীত ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা এবং ড্রেনের মধ্যে পানির প্রবাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। ড্রেন ও ডাস্টবিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে নিয়োজিত জনবলেরও সঠিক সময়ে সঠিক দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। এটির জন্য সুষ্ঠু ও দক্ষতর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন প্রয়োজন।

ঙ) ড্রেনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ঃ ড্রেনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যেন সর্ব সময় পানি প্রবাহের অনুকূলে থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্চনীয়। এ লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের পর পর ড্রেনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

চ) সড়ক মহাসড়ক ব্রিজ কালভার্ট নিমার্ণ ও মেরামত বা সংস্কার করার পূর্বে প্রাকৃতিক/অপ্রাকৃতিক পানির প্রবাহ এ সকল স্থানের দিকে প্রবাহিত হওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রয়োজনেই এটি করা হয়। তবে কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই এ কৃত্রিমভাবে বন্ধ করে দেওয়া পানির প্রবাহ সড়ক মহাসড়কের এক পার্শ্ব হতে অন্য পার্শ্বে বিঘ্নহীন করার ব্যবস্থা পুন: সচল করার নিমিত্ত কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা বা বেড়িগেট উঠীয় ফেলা আবশ্যক। দুঃখজনক এ কাজের জন্য উপযুক্ত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই এটি করা হয় না। আবার এ সকল স্থানে পানির প্রবাহ পুন: অব্যাহত করার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় দেখিয়ে ব্যক্তি বিশেষ সে বরাদ্দকৃত অর্থ হাতিয়ে নেয়। ফলে কাজ শেষ হলেও পূর্বের পানির প্রবাহ পুন: অব্যাহত হয় না। এতে সড়ক মহাসড়কের এক পার্শ্বে পানি স্বল্পতা/শূন্যতা থাকলেও অন্য পার্শ্বে গভীর জলাবদ্ধ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ হয় শস্যক্ষেত্রসহ পরিবেশের অন্যান্য সম্পদ-সম্পত্তি এবং জনজীবন বিপর্যস্থ হয়। দেশপ্রেমহীন দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রবণতার ও কার্যকলাপই এটির জন্য দায়ী। জলাবদ্ধতা সমস্যা যাতে দীর্ঘস্থায়ী বা স্থায়ী না হয় সে লক্ষ্যে বর্ণিত কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সড়কের এক দিক থেকে অন্য দিকে পানির প্রবাহের কৃত্রিম/অকৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে ফেলা আবশ্যক। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় মনেভাব পোষণ করা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ছ) ড্রেনের পারিপার্শ্বিকতা : ড্রেনের পারিপার্শ্বিকতা এমন হওয়া বাঞ্চনীয় যাতে বাসা বাড়ী, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাস্তা ইত্যাদি থেকে পানি সহজেই গড়িয়ে ড্রেনে পড়ে। অন্যথায় ড্রেন নির্মাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

জ) জনগণের অসচেতনতা : ড্রেনের মধ্যে শক্ত দ্রব্য বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন বস্তু ফেললে পানি প্রবাহে বিঘ্ন ঘটে। আর তাতে ড্রেনে পানি জমে থাকে। পানি প্রবাহে অধিক বিঘ্ন ঘটার কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং ড্রেনের মধ্যে আপত্তিকর বস্তু ফেলার বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানযোগ্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অবশ্য এক্ষেত্রে জনসচেতনতা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে জলাবদ্ধতা বিভিন্ন স্থানে এমন প্রকট হয়েছে যে, মনে হয় এটি যেন স্থান বিশেষে অমীমাংসাযোগ্য একটি

প্রাকৃতিক সমস্যা এবং এর সাথে মানুষকে মিতালী করেই চলতে হয়। অথচ এ সমস্যার কারণে সমস্যাগ্রস্থ এলাকায় জনগণের ভোগান্তির শেষ থাকে না। আর সামাজিক, রাষ্ট্রীয় নানাবিধ কাজ মারাত্মক বিঘ্নিত হয়। কাজেই জনগণের সহজ স্বাভাবিক জীবনযাপন ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জলাবদ্ধতা সমস্যা যাতে না হয় ও সৃষ্ট সমস্যা দ্রুত সমাধান করার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা খুবই জরুরী। ভৌগলিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশে বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা হওয়া স্বাভাবিক। আর প্রাকৃতিক নিয়মে আসা এ পানি/ অতিরিক্ত পানি খাল-নালা, নদ-নদীর মাধ্যমে দ্রুত সমুদ্রে প্রবাহিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলেই সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। এ দেশে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে স্থান বিশেষে পানি প্রবেশ ও স্থান বিশেষ হতে বের হওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার অধিকাংশই প্রকৃতি বিরোধী। এতে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকে না। আবার পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কাজেই জলাবদ্ধতা নিরসনে পানির স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক প্রবাহ অব্যাহত করার লক্ষ্যে কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে পানির প্রাকৃতিক প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নয় বরং পানির প্রাকৃতিক প্রবাহ সহজতর, স্বাভাবিক ও বিঘ্নহীন করার মাধ্যমেই জলাবদ্ধতা সমস্যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

ঝ) ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা ঃ বাংলাদেশ বৃষ্টি ও বন্যাপ্রবণ দেশ। ভৌগলিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক কারণেই এদেশে বৃষ্টি ও বন্যা হয় । কাজেই এদেশে বৃষ্টি ও বন্যা হওয়া স্বাভাবিক এবং এদেশে বৃষ্টি ও বন্যা হওয়া রোধ করা সম্ভব নয়। বৃষ্টি ও বন্যার পানির কারণেই এদেশে অধিকাংশ জলাবদ্ধতা হয় । তবে বৃষ্টি ও বন্যার পানি সহজ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে জলাবদ্ধতা হয় না। এলক্ষ্যে প্রাকৃতিক খাল নালার গভীরতা ঠিক রেখে তাতে পানির প্রবাহ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ক্ষেত্র বিশেষে নাব্যতা সংরক্ষণ করা আবশ্যক। প্রয়োজনে কৃত্রিম খাল নালা খনন করা যায়। প্রাকৃতিক কৃত্রিম সকল খাল নালার সাথে সহজ সংযোগ ব্যবস্থা রাখাও আবশ্যক। একই সাথে উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থাও অপরিহার্য। উল্লেখ্য, জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রাকৃতিক খাল নালা অপেক্ষা উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা অনেক বেশি কার্যকর্রী।

নগর উন্নয়নে খাল নদীর গুরুত্ব

সূচনা ঃ নগরের উন্নয়ন, জনগণের নানাবিধ রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা নির্মাণ করার জন্য খাল নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত যে নগরের মধ্য দিয়ে বা পার্শ্ব দিয়ে খাল নদী প্রবাহিত সে নগরকে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে সহজেই উন্নত আধুনিকতর নগরে রূপান্তর করা যায়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই সকল নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছে নদ-নদীকে কেন্দ্র করেই। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও বহু শহর, গঞ্জ, বন্দর গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নদ-নদীর তীরে। উল্লেখ্য, এদেশের মধ্য দিয়ে ১৩শত নদ-নদী প্রবাহিত ছিল। অন্য এক গবেষণায় জানা যায়, এদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৮ শতাধিক নদ-নদী প্রবাহিত ছিল। অন্য এক সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এদেশের প্রধান নদ-নদীর সংখ্যা ২৩০টি। প্রকৃত সংখ্যা কত? একেক স্থানে একেক সময় ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক নদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নদীর উপর গবেষণার এটি দূর্বল দিক। অতি দুর্ভাগ্যজনকভাবে এসব নদ-নদীর মধ্যে ১৩৮টি বর্তমানে মৃত। নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রতিকুলতা, মানুষের সৃষ্ট প্রকৃতি বিধ্বংসী কার্যকলাপ ইত্যাদি কারণে নদ-নদীর অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে এবং আরও বহু নদ-নদী বিলুপ্ত হওয়ার পথে। আজ থেকে ৪০-৫০ বছর আগে বর্ষা মৌসুমে এদেশের নদী পথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৫০০০ কি.মি.। বর্তমানে বর্ষা মৌসুমে এ দৈর্ঘ্য ৬০০০ কি.মি. এবং শুকনা মৌসুমে এ দৈর্ঘ্য ৩৫০০ কি.মি. হয়। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনায়ই নয় প্রকৃতি খেয়ালী আচরণেও অনেক পরিবর্তন ঘটায়। এসকল ক্ষতিকর প্রক্রিয়া কোন বিরূপ প্রভাব ব্যতিত বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। নদ-নদীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জলজীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করে। আবার স্থল ভাগের প্রাকৃতিক স্বাভাবিক অবস্থাও ধরে রাখে ও জলবায়ু অপরিবর্তীত রাখতে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নদ-নদীর মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা সহজে আরামে ও স্বাচ্ছন্দে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াত করা যায় ও মালামাল পরিবহন করা যায়। এজন্যই নদ-নদীকে প্রাকৃতিক রাজপথ বলা যথার্থ। সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে উবে যায়। সেই বাষ্পীভূত পানি উপরে উঠে শীতল সংস্পর্শে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে ভূ-পৃষ্টে নেমে আসে এবং নদ-নদীর মাধ্যমে পুনরায় সমুদ্রে ফিরে আসে। এভাবে পানিচক্র আবর্তীত হয়ে পৃথিবীর প্রাণীজগতের অস্তিত্ব ধরে রাখে। পাহাড় পর্বতে জমে থাকা পানি ও বরফ গলা পানি নদ-নদীর আকাওে সমুদ্রে প্রবাহিত হয় সমুদ্রে। নদ-নদীর মাধ্যমে বিশাল জলধি তার অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়। নদ-নদী বহমান বলেই পৃথিবী তার উর্বরতা, জীব জন্মদাত্রী রূপ-গুন অপরিবর্তীত রাখতে সক্ষম হয়। নদ-নদী আছে বলেই এ ধরণী শুধু সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা নয় বরং নানা রকম প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক ক্ষতিকর পদার্থ বহন করে সমুদ্রে ফেলে দেয়। নদ নদীর স্রোতের সাথে বহুধরনের উপকারী বস্তু একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়। যা মানব সভ্যতা উন্মেষের খুব সহায়ক। বহু সভ্যতা তার নিকটবর্তী নদ নদীর অবদান হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। যেমন- নীল নদের দান মিশরীয় সভ্যতা,

দোজলা, ফোরাতের অবদান মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা এবং সিন্ধু নদের অবদান হরপ্পা মহেনজোদারো সভ্যতা। আবার ঢাকায় বুড়িগঙ্গা তীরে মোঘল সভ্যতা গড়ে উঠেছে। টাঙ্গাইলের লৌহজং নদীর তীওে কাসা-পিতল, পাথরাইলে ঝিনাই নদীর পাড়ে শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প এবং ধলেশ্বরী নদীর তীওে বিখ্যাত মিষ্টি শিল্প গড়ে উঠেছিলো। গাজীপুরের তুরাগ নদীর তীওে টঙ্গীতে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। পৃথিবী এবং প্রাণী জগতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র সংরক্ষণে অবিকল্প সহায়ক নদ নদীর সাথে মানব প্রজাতির প্রাণের সম্পর্ক এবং ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক বাহক এটি বলার প্রয়োজন হয় না। সভ্যতা জন্মদাত্রী, জীববৈচিত্র ও বিভিন্ন জলজ প্রাণির জীবন ধারণে উপযোগী নদ নদীর প্রবাহমানতা ধরে রাখা ধরিত্রির সন্তান মনুষ্য সমাজের অনেক বড় দায়িত্ব। নদ নদী মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু বড় বড় অবদান রাখে। কৃষিনির্ভর এদেশের গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন ও কৃষির উন্নয়নই দেশ জাতির উন্নয়ন। নদ নদীর সাথে এ উন্নয়ন অত্যন্ত নিবীড়ভাবে জড়িত। গ্রামীণ সমাজ ও কৃষির উন্নয়নের সাথে নদ নদীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক তো আছেই উপরন্তু শহর, বন্দর, গঞ্জের উন্নয়নেও নদ নদীর অবদান অনস্বীকার্য।

নদ নদীর কারণে নিম্নোক্ত উপকার হয়

১) শহর নগরে নির্মল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এতে নগরবাসীর গড় আয়ু বৃদ্ধি পায়।

২) প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় আসা বিপুল পরিমাণ পানি এসকল খাল-নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলাবদ্ধতা নিরসনে সহায়ক হয়।

৩) নগরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। নগরের স্বস্তিকর ও আরামদায়ক পরিবেশ সংরক্ষণসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

৪) এ সব খাল নদীর পানি শোধন করে মানুষের স্বাভাবিক কাজ কর্ম ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পে ব্যবহার করা যায়। এতে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমতে পারে। আবার অন্যস্থান থেকে এসব সুবিধা নির্মিত স্থানে পানি সরবরাহের পরিমাণ কমে যেতে পারে।

৫) কৃষিতে ও বনায়ন কাজে পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। মরু প্রক্রিয়া রোধ হতে পারে।

৭) মাটির আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যদিকে মাটির স্বাভাবিক শক্তিও বেড়ে যায়।

৮) খাল-নদীর দুই পাড়ে স্থান বিশেষে বনায়ন করা যায় এবং এ বনে উপকারী ও অর্থকরী পশু-পাখির অভয়ারণ্য করা যায়।

৯) মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি করাসহ সরকার অর্থকরী কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

১০) নদী-খালের দুই পাড়ে অবকাশ যাপন কেন্দ্র নির্মাণ বা পর্যটন শিল্প নির্মাণ করা যায়।

১১) মানুষের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

১২) সামাজিক সুশৃংখলা বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে।
১৩) পারস্পারিক সৌহার্দ-সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ও তা বজায় রাখতে সহায়ক হতে পারে।
১৪) শিল্প সহায়ক হতে পারে।
১৫) খাল নদীর সহায়তায় নানা রকমের শিল্প গড়ে উঠতে পারে।
১৬) খাল নদীকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে জনসাধারণ এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারে। এর মাধ্যমে নৌ-যানের মালামাল পরিবহন করা যেতে পারে। যার ফলে সড়ক পথের ব্যবহার কমতে পারে ও সড়ক পথে সুশৃঙ্খলভাবে যানবাহন পরিচালনায় সহায়ক হতে পারে। এটি ট্রাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণে অত্যান্ত সহায়ক হতে পারে।
১৭। নদী খাল বিলে ধারন করা পানি পারিপার্শ্বিকতার তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাকৃতিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বৃহত্তর অর্থে সারাবিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত পানির উৎস একত্রিত ভাবে বা একই সময়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ব্যাপক ভাবে রোধ করে।

ফেরিঘাটে সৃষ্ট যানজট নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। সডক মহাসড়কের বুক চিরে প্রবাহমান এসব নদ - নদীর উপর প্রয়োজনীয় সকল স্থানে ব্রিজ নির্মান করা সম্ভব হয় নাই। তাই এ দেশের বহু নদ- নদী পারাপারের জন্য ফেরি ব্যবহার করা হয়। এসব ফেরিঘাট ও তার সাথে সংযোগ সড়কে মাঝে মাঝে প্রকট যানজট হয়। এ যানজট ক্রমান্বয়ে সড়ক মহাসড়কে বিস্তৃত হয় ও যানবাহন চলাচলে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে। ফলে ভ্রমণ বিলম্বিত ও কষ্টকর হয়। বিপর্যস্থ হয় জনজীবন। অনেক কাজ পিছিয়ে যায়। ফেরিঘাটে সৃষ্ট যানজট সমস্যার কারণে যাতে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জাতি ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে লক্ষ্যে এ সমস্যার দ্রুত সমাধান হওয়া আবশ্যক। ফেরিঘাটে সৃষ্ট যানজটের কারণ ও তার প্রতিকারের বিষয়ে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ক) <u>ফেরির সংখ্যা কম হওয়া ও ছোট আকারের ফেরি ব্যবহার করা :-</u>
চলাচলরত যানবাহনের সংখ্যার তুলনায় ফেরির সংখ্যা কম হলে একই সময়ে ফেরিঘাটে বিপুল সংখ্যক যানবাহন স্থবির হয়। আবার ফেরিঘাটে ক্রমাগত যানবাহন আসতেই থাকে। ফলে ফেরি পারাপারের অপেক্ষমান যানবাহনের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কাজেই যানবাহনের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে ফেরির সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রয়োজনে তা বৃদ্ধি করা দরকার। ফেরি আকারে ছোট হলেও এ সমস্যা হয়। কারণ ফেরির আকার ছোট হলে যে সংখ্যক যানবাহন ফেরিঘাটে আসে সে সংখ্যক যানবাহন সহজে ও দ্রুত নদী পার হতে পারে না। ফলে ফেরিঘাটে ক্রমান্বয়ে থেমে থাকা যানবাহনের সংখ্যা বিপুল ভাবে বেড়ে যায়। এটি সড়ক মহাসড়কে যানজট সৃষ্টি করে। কাজেই ফেরিঘাটে যানবাহন যানজট মুক্ত ও নিরাপদে পারাপারের জন্য একদিকে যেমন ফেরির সংখ্যা বাড়ান প্রয়োজন তেমনি ছোট ফেরির তুলনায় বড় ফেরি ব্যবহার করাও প্রয়োজন। তবে নদীর এক্ষেত্রে নদীর গভীরতা বিবেচনাযোগ্য

খ) <u>জলপথের নাব্যতা না থাকা :-</u>
ফেরি পারাপারের জন্য জলপথের পানির গভীরতা কম হলে বা ফেরিচলাচলের উপযোগিতা কোন ক্রমে নষ্ট হলে ফেরি চলাচলের জন্য অন্য জলপথ ব্যবহার করতে হয়। এটি সাধারণত দীর্ঘতর পথ হয়। ফেরি বহু দুর ঘুরে নদী পারাপারে বাধ্য হয়। এতে ফেরি পারাপারে বহু সময় ব্যয় হয়। জলপথে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বেড়ে যায়। কাজেই ফেরি চলাচলের পথের নাব্যতা সকল সময় সঠিক গভীরতা রাখা আবশ্যক। জলপথের নাব্যতা ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে নদী খনন আবশ্যক। আবার প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ যাতে বিঘ্ন না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক জল প্রবাহে বিঘ্ন ঘটলে জলপথের নাব্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

গ) <u>ফেরি চলাচলের পথ দীর্ঘ হওয়া :-</u>
ফেরি চলাচলের পথ দীর্ঘ হলে ফেরির মাধ্যমে যানবাহন পারাপারে অনেক সময় ব্যয় হয়। ফলে নদীর দুই তীরে আগত যানবাহন দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়।

এতে ঘাটে যানবাহনের যানজটে পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ফেরি চলাচলের পথ যথাসম্ভব অল্প দূরত্বের হওয়া আবশ্যক। সময়ের দাবীতে পুরান ও দীর্ঘ পথ পরিত্যাগ করে তুলনামূলক ভাবে অল্প দূরত্বের ও সহজে পারাপারযোগ্য নতুন জলপথ খনন করা যায়। নতুন জলপথও মাঝে মাঝে ড্রেজিং করা আবশ্যক।

ঘ) একাধিক ফেরিঘাট নির্মান না করা ও ফেরি চলাচল জটিল হওয়া :-

একই ঘাটে যানবাহন ফেরিতে উঠান হলে ও ফেরি থেকে নামান হলে ঘাটে যানজট হয়। অনেক ক্ষেত্রে ফেরি চলাচলেও জট সৃষ্টি হয়। সুতরাং ফেরিতে যানবাহন উঠান ও নামানের জন্য একাধিক ঘাট নির্মাণ করা আবশ্যক। এ ঘাট সমূহের কোন ঘাটে যানবাহন শুধুমাত্র ঘাট থেকে ফেরিতে উঠানো ও অন্য ঘাটে ফেরি থেকে ভূমিতে নামানর ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক করা যায়। এটি ফেরিঘাটে যানজট নিরসনের অন্যতম কার্যকরী পদক্ষেপ। ফেরি থেকে যানবাহন নেমে আসার পর মূল সড়ক মহাসড়কে উঠার এবং মূল সড়ক থেকে ফেরিঘাটে যাওয়ার একদিকে চলাচল ব্যবস্থাপনা ফেরিঘাটে যানজট নিয়ন্ত্রণে থাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। এ নিয়ম বাস্তবায়ন ও বহাল থাকা আবশ্যক। স্মরণীয়, এ দেশে যানবাহন সড়ক-মহাসড়কে বাম পার্শ্ব দিয়ে চলে। ফেরিঘাটে যাতায়াত করার সময় যানবাহন যাতে বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য কোন যানবাহনের সম্মুখীন না হয় সে লক্ষ্যে মূল সড়ক-মহাসড়ক থেকে আসা যানবাহনের ডানদিকের (ফেরি থেকে দেখতে হবে) ফেরিঘাটে আসার ও ফেরিতে উঠার ব্যবস্থা রাখা এবং বামদিকের ফেরিঘাটে যানবাহনের ফেরি থেকে নেমে একদিকে চলার পদ্ধতি অনুসরণ করে সড়ক-মহাসড়কে উঠে আসার পদ্ধতি/ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ঙ) ফেরিঘাটে আসা যাওয়ার সংযোগ সড়ক সঙ্কীর্ণ হওয়া, ঘাটে যানবাহন রাখার স্থান অপ্রশস্থ হওয়া :-

ফেরিঘাটের সংযোগ সড়ক সঙ্কীর্ণ হলে যানবাহনের ফেরিঘাটে আসা যাওয়ার সময় যানজট হয়। কাজেই এ সড়কটি যথেষ্ট চওড়া হওয়া আবশ্যক। ফেরিঘাটে যানবাহন রাখার স্থান অপ্রশস্থ হলে এ স্থানে যানবাহন সঙ্কুলান হয় না। ফলে যানবাহন সড়কে রাখতে হয়। এতে যানজট হয়। কাজেই ফেরিঘাটে যানবাহন রাখার স্থান প্রয়োজন অনুযায়ী বড় হওয়া আবশ্যক।

চ) ফেরি পারাপার বিঘ্নিত এবং অনুন্নত হওয়া :-

ফেরি পারাপার ব্যবস্থাপনা অনুন্নত হলে এবং ফেরি পারাপারে বিঘ্ন ঘটলে নদী/ জলাশয়ে দুধারে বিপুল সংখ্যক যানবাহন স্থবির হয়ে পড়ে। সময়ে এটি বহু দূর বিস্তৃত হয়। ফলে রাস্তায় যানজট হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ফেরি পারাপার সুপরিকল্পিত, নির্বিঘ্ন ও বিরতিহীন হওয়া এবং ফেরি পরিচালনার ব্যবস্থাপনা দক্ষতর হওয়ার সাথে সাথে বিবর্তিত হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন। অল্প দুরত্বে ফেরির স্থানে ব্রিজ নির্মাণই যুক্তি সংগত।

ছ) ফেরি সংখ্যাল্পতা ও অল্প সময়ে ফেরিঘাটে অধিক যানবাননের আগমন

ফেরিঘাটে ফেরির সংখ্যার তুলনায় অল্প সময়ে/ হঠাৎ যানবাহনের আধিক্য হলে যানবাহন পারাপারে বিঘ্ন ও বিলম্ব ঘটে। এতে ফেরিঘাটে বিপুল সংখ্যক যানবাহন স্থবির হয়ে পড়ে। স্থবির হয়ে থাকা যানবাহনের সমস্যা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত না হলে ফেরিঘাটে যানজট প্রকট আকার ধারণ করে যা নিরসন বহু সময়সাপেক্ষ হয়। জনমানুষ বা যাত্রীদের ভোগান্তির শেষ থাকে না। বাংলাদেশে প্রতিবছর ঈদের আগে ও পরে ফেরিঘাটে এ সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্যা নিরসনে পূর্ব হতে মানুষ জনের ধীরে ধীরে গন্তব্যে পৌঁছানের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভিন্ন ভিন্ন রুটে বেশি সংখ্যক ফেরি চালনা করা প্রয়োজন। একই সাথে উন্নত ও দক্ষতর ব্যবস্থাপনাও আবশ্যক। আবার একেক অঞ্চলের মানুষকে একেক সময়ে নিজ গন্তব্যে গমনাগমনের বিধিবিধান ও ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা যায়।

জ) দুর্ঘটনা :-

ফেরিতে যানবাহন উঠানামা করার সময় দুর্ঘটনা ঘটলে যানজট সৃষ্টি হয়। কাজেই এ সকল স্থানে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সে দিকে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন থাকা প্রয়োজন।

সড়ক মহাসড়কে যানজটের কারণ এবং যানজট সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ

যে সকল সমস্যার কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, যানজট তাদের মধ্যে অন্যতম। এ সমস্যা বিশ বছর আগেও আমলযোগ্য ছিল না। গত বিশ বছরে দিনে দিনে এটি এমন ক্ষতিকর পর্যায়ে এসেছে যে, বর্তমানে এটি উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই। যানজট সমস্যার কারণে জাতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত ক্ষতি হয়।

(১) যোগাযোগ ব্যবস্থায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে।

(২) বাতাসের স্বাভাবিক নির্মলতা/বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ নির্দিষ্ট স্থানে যানবাহন থেকে বিপুল ধোঁয়া নির্গত হওয়ায় বাতাস দূষিত ও ভারী হয়। এ বাতাস শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুপযুক্ত।

(৩) শব্দ দূষণ হয়।

(৪) মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হওয়াসহ মানুষ, জীব জন্তু সকলের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি হয়।

(৫) জ্বালানী ব্যবহার ও এতদসংক্রান্ত ব্যয় বেড়ে যায়।

(৬) যানবাহন মেরামত, মেইনটেন্যান্স, ওভারহলিং ব্যয় বেড়ে যায়; এটি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিপন্থী।

(৭) সারাদেশে যানজটের কারণে এতদিষ্ট বহু কর্মঘন্টা নষ্ট হয়। এর ফলে জাতি বৎসরে বিপুল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২০১৭ খ্রি. এক জরিপ অনুযায়ী শুধু রাজধানী ঢাকাতে প্রতিদিন ৩২ লাখ কর্মঘন্টা নষ্ট হয়েছে। এতে দেশের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। ২০১৮ খ্রি. এর জরিপ অনুযায়ী ঢাকায় যানজটের কারণে প্রতিদিন ৫০ লাখ কর্মঘন্টা নষ্ট হয়েছে এবং এতে দেশের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৪৪ হাজার কোটি টাকা। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী ঢাকাতে যানজটের কারণে দিনে ৫০ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়েছে এবং এতে আর্থিক ক্ষতি ৩৭ হাজার কোটি টাকা। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সৃষ্ট যানযটের কারণে দেশের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৫২ হাজার কোটি টাকা। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার সৃষ্ট যানযটের কারণে দেশের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। আর এক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকার যানজটে দেশের বছরে ক্ষতি হয় ১,২৫৬ মার্কিন ডলার। সামগ্রিকভাবে জাতীয় উন্নয়নের মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

(৮) মুমূর্ষ রোগী ও আহতদের চিকিৎসায়ও বিঘ্ন ঘটে। ২০১৭ খ্রি. সারাদেশে সাড়ে ৬ হাজার দুর্ঘটনায় উদ্ধার করা ১১ হাজার ৫শত জনের মধ্যে আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ যানজট।

(৯) ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে যেতে পারে না। ফলে জানমালের বিপুল ক্ষতি হয়।

(১০) শিক্ষায়ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

(১১) যানজটের কারণে কখনও মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে মূল্যবান সম্পদ-সম্পত্তি ও অমূল্য জীবন নষ্ট হয়।

১২) একক সময়ে একাধিক কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ ও পরিস্থিতি নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এক সময়ে কাজের পরিমান/সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক হ্রাস পায়। যা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান তথা জাতিকে পিছিয়ে দেয়। কাজেই যানজট সমস্যা জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত।

আবার যানজটের কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত ক্ষতি হয়-

(১) যানজটের স্থানে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রা বৈশ্বিক উষ্ণতার সাথে যুক্ত হয়ে এ তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।

(২) বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। উপরোক্ত ক্ষতির কারণে বিশ্বের সামগ্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমনকি পৃথিবীর অস্তিত্বের উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে।

(৩) বিশ্বের বিভিন্ন বড় দেশের বড় বড় শহরেও যানজট হয় এবং যানজট জনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়।

(৪) যানজটের কারণে বিভিন্ন দেশের সাথে সময়ে যোগাযোগ সম্ভব হয় না। কাজেই যানজটকে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করা যায়।

সাধারণভাবে বলা যায়, যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে সড়ক মহাসড়কে যানবাহনের যে মন্থরতা ও স্থবিরতা সৃষ্টি হয়; তাই-ই যানজট। যেহেতু এ সমস্যার কারণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক কার্যক্রমও ব্যহত হয়। কাজেই যানজট সমস্যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় এনে এ সমস্যা সমাধানে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাব্যশ্যক। নিচে যানজটের কারণ ও প্রতিকারের নিমিত্তে কিছু সুপারিশ করা হল।

১। ক) ট্রাফিক আইন ও সাইন অমান্য করলে যানজট হয় । ট্রাফিক আইন মেনে চলা যেমন সর্বধারণের নাগরিক দায়িত্ব; তেমনি সময়ের দাবিতে ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ট্রাফিকিং পদ্ধতি ও আইন যথাক্রমে আধুনিকায়ন ও সংশোধন প্রয়োজন। এ বিষয়ে নীতি নির্ধারকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো–

খ) ট্রাফিক আইন মেনে চলার পূর্বশর্ত ট্রাফিক আইন জানা। ট্রাফিক আইন সর্বস্তরের মানুষকে জানানোর জন্য অথবা রাস্তাঘাটের হাঁটা চলাচল ও যানবাহন চালানোর সাধারণ নিয়ম জনসাধারণকে জানানোর উদ্দেশ্যে এতদসংক্রান্ত সম্ভাব্য বিষয়াদি স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আবার সর্বশ্রেণির মানুষকে ট্রাফিক আইন ও ট্রাফিক সাইন সড়ক-মহাসড়কের চলাচলের নিয়ম-কানুন জানানোর জন্য স্থানে স্থানে সভা সেমিনার ও প্রজেক্টর প্রদর্শন করা যায়। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

গ) যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ পেশাজীবীদের কাজের যথার্থ মূল্যায়ন, তাদের কর্মস্পৃহা, দক্ষতা, দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা বাড়িয়ে দিতে পারে। এ লক্ষ্যে

ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতির জটিলতাসহ (যদি থাকে) অন্যান্য পেশাগত সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন (এটি আবশ্য সকল বিভাগের কর্মরতগণের জন্যই সমান প্রযোজ্য)। পেশাগত উন্নতি ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া কর্মরতগণের পেশাগত ও মানবিক অধিকার।

ঘ) চলমান যানবাহনের সাথে ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যার অনুপাত নির্ধারণের জন্য কোনো আন্তর্জাতিক আইন থাকলে সেটি অনুসরণযোগ্য হতে পারে। বাংলাদেশে প্রতি ৯ হাজার ৬৯৬ জন মানুষের জন্য ১ জন ট্রাফিক পুলিশ কর্মরত। আবার কোনো দেশের উন্নত ট্রাফিকিং ব্যবস্থায় যানবাহনের সংখ্যার সাথে ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা অনুপাতের ন্যায় এদেশেও ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে সড়ক ও মহাসড়কে বৈধ ও অবৈধ প্রায় ৩৫ লক্ষ যানবাহন চলাচল করে(এ সংখ্যা সময়ে বেড়েই চলছে)। ট্রাফিক পুলিশের জনবল সংকটের কারণে উল্লেখিত সংখ্যক যানবাহন চলাচল সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে বিঘ্ন ঘটছে । আবার প্রতিমাসেই বিদ্যমান যানবাহনের সংখ্যার সাথেই যোগ হচ্ছে বহু সংখ্যক নতুন যানবাহন। ফলে দেশে যানবাহনের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে; কিন্তু বাড়ছে না প্রয়োজনীয় সংখ্যা ট্রাফিক পুলিশ ও রাস্তা। ফলে যানজট সমস্যা দিনে দিনে আরও প্রকট হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশের জনবল বৃদ্ধি, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও উন্নত ট্রাফিকিং ব্যবস্থা এ সমস্যা বিপুলভাবে হ্রাস করতে পারে।

ঙ) যানজট নিরসনে ভালো, ফলপ্রসূ অন্য কোনো উন্নত দেশের যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে ঐ দেশে এদেশের অধিক সংখ্যক ট্রাফিক পুলিশগণকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা যেতে পারে। অথবা উক্ত দেশের যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে দক্ষ প্রশিক্ষকগণকে এদেশেও প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করার জন্য নিয়োগ করা যায়।

২। যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত না হলে যানজট হয়। একদিকের যানবাহনের প্রবাহে অন্যদিকে যানবাহনের প্রবাহ ঢুকে যায়। আবার কখনও দ্রুতগামী যানবাহনের প্রবাহে ধীরগতির যানবাহন ঢুকে পড়ে। ফলে যানবাহন চলাচলে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। পরিণতিতে সৃষ্টি হয় যানজট। যানবাহন চলাচল সুনিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খল ও সু-পরিকল্পিত হলে এটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এ বিষয়ে শুধু যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষই নয়; সকল চালকেরই সচেতন, সজাগ ও সতর্ক থাকা আবশ্যক।

৩। যানবাহন চলাচলের সময় যানবাহন যেন মন্থর বা স্থবির না হয়, সেদিকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আবার যানবাহনের প্রবাহ মন্থর বা স্থবির হলে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ যেন মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করেন। এটি লক্ষণীয় যে, অনেক সময়ই যানবাহন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চিন্তা ও কার্যকলাপ যানজটের মূল কারণ থেকে দূরে থাকে। ফলে তারা পরিশ্রম করে গলদগর্ম হলেও যানজট নিয়ন্ত্রণে বিলম্ব ঘটে।

৪। একই স্থানে একই সময়ে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের গমনাগমনের কারণে যানজট হয়। যাতে যানজট না হয়, সে লক্ষ্যে একই স্থানে ভারী, হালকা, মাঝারি হালকা, সকল ধরনের যানবাহনের গমনাগমন বন্ধ করা আবশ্যক। অন্যথায় যানবাহনের প্রবাহে বিঘ্ন ঘটে এবং যানজট হয়। তবে একই স্থানে সড়কের উপর ভারী, মধ্যম-ভারী, হালকা যানবাহনের জন্য পৃথক পৃথক লেন থাকলে এ সমস্যা নাও হতে পারে।

৫। একই স্থানে একই সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন গমনাগমনের কারণে যানজট হয়। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একই স্থানে হালকা, মধ্যম-ভারী যান্ত্রিক, অযান্ত্রিক যানবাহনের বিভিন্ন দিক থেকে গমনাগমন বন্ধ করা যায়। তবে বিভিন্ন ধরন ও দিকের যানবাহনের জন্য পৃথক পৃথক লেন ও স্থান থাকলে এ সমস্যার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। আবার একইস্থানে বিভিন্ন দিক থেকে একই ধরনের যানবাহন একই সময়ে গমনাগমন করলেও যানজট অবশ্যম্ভাবী। কাজেই বর্ণিত বিষয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ যেন সজাগ সতর্ক থাকেন।

৬। সড়ক দুর্ঘটনা ও অন্যান্য দুর্ঘটনার কারণে যানজট হয়। বিশেষত দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন ও মালামাল সড়ক-মহাসড়কে পড়ে থাকলে যানজট হয়। অনেক সময় এ সকল মালামাল ও দুর্ঘটনা আরেকটি দুর্ঘটনার কারণ হয়। কাজেই সড়ক দুর্ঘটনা কবলিত মালামাল, যানবাহন, মানুষ, পশু সবই দ্রুত সরিয়ে ফেললে যানজট সমস্যা হয় না এবং পরবর্তীতে আরেকটি দুর্ঘটনা রোধে সহায়ক হয়।

৭। একই সড়কে বিভিন্ন দিকে যানবাহন চলাচলে যানজট অবশ্যম্ভাবী। এটি সড়কের কোনো অংশবিশেষে হলে একই যানবাহন সুশৃঙ্খলভাবে একই সড়কে একই দিকে চলাচল করা বাধ্যতামূলক হওয়া আবশ্যক। এটি যানজটযুক্ত যানবাহন চলাচলের ও যানজটের অন্যতম সমাধান।

৮। ক) ধৈর্যের সাথে নিয়মকানুন অনুসরণ করে সুশৃঙ্খলভাবে যানবাহন চালনা না করা যানজটের অন্যতম কারণ। এটি শুধু যানজটই সৃষ্টি করে না, সময়ে সড়ক দুর্ঘটনাও ঘটায়। কাজেই সড়ক-মহাসড়কে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও বাঁক নেবার সময় চালকের ধৈর্য প্রদর্শন একান্তই জরুরী। এ বিষয়ে যানবাহন চালকগণের আন্তরিকতা কাম্য।

খ) কখনও কখনও যাত্রী সাধারণ অধৈর্য হয়ে অপরিণামদর্শিতা প্রদর্শন করে চালককে Wrong সাইড দিয়ে যানবাহন পাস করিয়ে নেয়ার জন্য তাগিদ দেন। চালক তাদের পরামর্শ মোতাবেক Wrong সাইড দিয়ে যানবাহন চালনা করেন। কোনো কোনো সময় চালক স্বপ্রনোদিত ভাবেই এটি করেন। যাত্রী ও চালকের ভুলের জন্য যানজট অধিকতর প্রকট হয়। কখনও কখনও এটি সড়ক দুর্ঘটনারও কারণ হয়। কাজেই যানজটমুক্ত যানবাহন চলাচলের

জন্য কখনই চালক যেন ট্রাফিক পুলিশ ব্যতীত অন্য কারো পরামর্শ গ্রহণ না করে। আর যাত্রী সাধারণেরও উচিত নয় চালককে কোনো ধরনের নির্দেশনা দেয়া বা যানবাহন চালানোর বিষয়ে জোর প্রয়োগ করা।

(গ) যেখানে-সেখানে যানবাহন টার্নিং নিলে যানজট হয়। সুতরাং সড়ক-মহাসড়কে নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্য কোনো জায়গায় যানবাহন যাতে টার্নিং না নিতে পারে, সেদিকে যানবাহন চালক ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সজাগ থাকা দরকার। এটি সকল ধরনের যানবাহনের জন্যই সমান প্রযোজ্য।

(ঘ) একই সড়কে বিপরীত দিক থেকে যানবাহনে চলাচলের কারণে যানজট ও সড়ক দুর্ঘটনা উভয়ই হয়। এটি সাধারণত চালকগণের নিয়ম না মানার কারণে হয়। সকল স্থানে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সতর্ক নজর রাখতে সক্ষম হন না। কাজেই চালকগণেরই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) চালকের খামখেয়ালীপনার কারণেও সড়ক মহাসড়কে তীব্র যানজট হয়। কাজেই যানবাহন চালানোর সময় কোনও চালকই যেন কোন সময়ই খামখেয়ালী আচরণ না করেন।

৯। চালকের দক্ষতা যানজটমুক্ত ও দুর্ঘটনামুক্ত যানবাহন চালনার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কাজেই সকল চালক যেন দক্ষতা অর্জনে আন্তরিক হন এবং নিজ পেশায় সকল সময় নিষ্ঠাবান থাকেন। আবার অদক্ষ চালকগণ যানবাহন চালনা করছেন কি না, এটি যানবাহন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও যানবাহন মালিকপক্ষ সতর্ক দৃষ্টিতে রাখতে পারেন।

১০। (ক) নির্মিত সড়ক-মহাসড়কের সম্পূর্ণ অংশ যান চলাচলে ব্যবহার করা না গেলে যানজট হয়। বিভিন্ন স্থানেই এটি পরিলক্ষিত হয় যে, সড়ক-মহাসড়কের বিপুল অংশ প্রকৃত কাজে ব্যবহার হয় না। ফলে যানবাহন চলাচলের স্থান সংকীর্ণ হয়। আর এতে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। আবার নির্মিত সকল সড়ক-মহাসড়ক যানবাহন চলাচলে ব্যবহার না হলে স্থানে স্থানে যানজট হয়। সৃষ্ট যানজট অন্যান্য সড়কে বিস্তৃত হয়। কাজেই নির্মিত সড়ক মহাসড়কের সম্পূর্ণ অংশ যানবাহন চলাচলের জন্য নির্মিত সকল সড়ক এবং মহাসড়কের সম্পূর্ণ অংশে যানবাহনের ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

(খ) যানজট সমস্যা এমন এক সমস্যা যা পৃথক পৃথক স্থানে আলাদা আলাদা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অথবা যে সকল কারণে যানজট হয় সে সকল সমস্যা আলদাভাবে সমাধান করলে যানজট সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না। পৃথক পৃথক ভাবে বা আলাদা ভাবে না স্থানবিশেষে এ সমস্যা সমাধান করলে অথবা সৃষ্ট যানজট একই সময়ে একই সাথে সকল স্থানে সমানভাবে সমাধানের ব্যবস্থা চালু না থাকলে কোন কারণে কোন স্থানে সৃষ্ট যানজট অন্যান্য স্থানে যানবাহন যাতায়াতের স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত করে এবং কোন স্থানে সৃষ্ট যানজট সকল

স্থানেই বিস্তৃত হয়। ফলে এক সময় স্থবির হয়ে পড়ে সমগ্র নগর মহানগর বা এর উল্লেখযোগ্য অংশ-বিশেষ। কজেই যানজট সমস্যা সমাধানে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সকল কার্যক্রম একই সময়ে সকল অলি-গলি সড়ক ও মহাসড়কে একই সাথে বাস্তবায়ন করা ও অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই।

(গ) সড়ক মহাসড়কে চলাচলের স্থানে যান্ত্রিক ক্রুটি বা অন্য যে কোনো কারণে যানবাহনের বৈকল্য যানজটের কারণ। সুতরাং সড়ক-মহাসড়কের উপর বিকল হওয়া যানবাহন অতি দ্রুত অপসারণ করে যানবাহন চলাচল অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

(ঘ) যানবাহন চলাচলের স্থান মেরামতের সময় বিকল্প সড়ক না থাকলে যানজট হয়। সুতরাং সড়ক-মহাসড়ক মেরামতের সময় অবশ্যই অন্যস্থান দিয়ে যানবাহন চলাচলের জন্য বিকল্প সড়ক নির্মাণ করে অথবা বিকল্প ব্যবস্থা করে সড়ক-মহাসড়ক মেরামত কাজ করার উদ্যোগ নেয়া যায়। এক্ষেত্রে দিনের পরিবর্তে রাতে কাজ সম্পন্ন করাই ভালো।

(ঙ) যানজট নিরসনের লক্ষ্যে যানজটের সময় বিকল্প পথসমূহ যানবাহন চলার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া যায়। এতে মূলসড়কে যানবাহনের চাপ কমে গিয়ে যানজট নিরসন হতে পারে। আবার যানজটের কারণ দূর করতেও এটি সহায়ক হয়। বিকল্প সড়ক যানজট মুক্ত রাখার জন্য এ সকল সড়কে একমুখী পদ্ধতিতে যানবাহন চালনা করা যায়।

(চ) যানজটের নিরসনে যানজটের স্থান চিহ্নিত করে যানজটের কারণ সনাক্ত করা প্রয়োজন। এতে সৃষ্ট সমস্যা সহজে সমাধান হতে পারে ও দ্রুত যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হতে পারে।

(ছ) সোজা সড়ক-মহাসড়কে আঁকাবাঁকা সড়ক-মহাসড়ক অপেক্ষা অনেক দ্রুত ও সহজে যানবাহন চলাচল করতে পারে। তাই সোজা সড়ক-মহাসড়কে যানজট কম হয়। কাজেই সড়ক-মহাসড়ক যথাসম্ভব সোজা করে নির্মাণ করা আবশ্যক। ইতোপূর্বে নির্মিত সড়ক-মহাসড়কের বাঁক যথাসম্ভব সোজা করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ ব্যবস্থা নিতে পারে। সড়ক মহাসড়ক সোজা হলে সড়ক মহাসড়কের দৈর্ঘ কমে যায়। যানবাহন অনেক কম সময়ে, কম জ্বালানী খরচে এবং সহজে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও জাতীয়ভাবে বিপুল সময় বেঁচে যেতে পারে এবং অল্প সময়ে অধিক কাজ সম্পন্ন হওয়ার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হতে পারে।

১১। যত্রতত্র ও নো পার্কিং এরিয়ায় যানবাহন পার্কিংয়ের কারণে ও দীর্ঘ সময় রাস্তার উপর যানবাহন অপেক্ষমান থাকলে যানজট হয়। কারণ এতে কখনও কখনও অল্পসময় এমন কি দীর্ঘসময় যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়। এটি পরিহার করে নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত গাড়ি পার্কিং এবং খুব অল্প সময়ও সড়কের

উপর যানবাহন অপেক্ষমান রাখা নিষিদ্ধ করা যায়। এ আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। অবশ্য যানবাহন পার্কিংয়ের জন্য বাস্তবতা বিচার-বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন স্থানে পার্কিংইয়ার্ড নির্মাণ ও তার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

১২। যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে বা যানবাহন চলাচলের স্থানে যানবাহন থামিয়ে কাগজপত্র পরীক্ষা করলে, চালকের সাথে বাক-বিতন্ডা করলে, অবৈধ মালামাল বা অন্যকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে ঐ স্থানে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়ে যানজট হয়। এটি যাতে না হয়, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনে যানবাহনকে মূল সড়ক থেকে নামিয়ে বা পাশে রেখে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা যেতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে যানবাহন চালকগণেরও যানবাহন চালনা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা আবশ্যক।

১৩। সড়ক-মহাসড়কের উপর যানবাহন থামলে বা গতি মন্থর করার যতগুলো কারণ আছে তার মধ্যে যাত্রী ও মালামাল ওঠানামা করা প্রধান। এর ফলে অন্যান্য যানবাহনের চলাচল/প্রবাহ বিঘ্নিত হয়ে যানজট হয়। কাজেই স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই যেন রাস্তার উপর যানবাহন থামতে না পারে ও গতি খুব মন্থর না হয়; সেদিকে যানবাহন চালনা কর্তৃপক্ষের সজাগ, সচেতন থাকা আবশ্যক। বৃহত্তর স্বার্থে যানবাহন চালকগণেরও এটি স্বপ্রণোদিতভাবেই পরিহার করা প্রয়োজন। কোনো কারণে যানবাহন থামানো প্রয়োজন হলে বা গতি মন্থর করা প্রয়োজন হলে মূলসড়কের পার্শে সুবিধাজনক স্থানে যানবাহন নিয়ে এসে কাজ সম্পন্ন করা যায়। অবশ্য এর জন্য সড়কের পাশে যানবাহন রাখার জন্য বিশেষভাবে চওড়া স্থান/বাস বে নির্মাণ করা প্রয়োজন। যানবাহন যেখানে সাইড নেয়া প্রয়োজন, সেখানে যেন অন্যকিছু না থাকে। তাহলে ঐ স্থানে যানবাহন সাইড নিতে পারে না, ফলে যানজট হয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগ, সড়ক-মহাসড়ক অধিদফতর, যানবাহন চালকগণ ও যানবাহন ব্যবসায়ীগণের সচেতনতা, সুপরিকল্পনা ও কার্যকরী পদক্ষেপ- এটি সমাধান করতে পারে।

১৪। যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনে অনান্তরিকতা ও দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপে যানজট হয়। এ বিভাগের কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সচেতন ও খোঁজ-খবর রাখা অত্যাবশ্যক।

১৫। সড়ক-মহাসড়কের বাঁকের ধারে বা বাঁকের নিকটবর্তী স্থানে যানবাহনের স্ট্যান্ড নির্মাণ করা হলে বা কোনো কারণে সড়ক-মহাসড়কের বাঁকের উপর বা নিকটবর্তী স্থানে যানবাহন থামলে বা খুব মন্থর গতিতে চললে এ সকল স্থানে বিভিন্ন দিক থেকে আসা যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত হয়; ফলে

যানজট হয় । যানজট যাতে না হয়, সে লক্ষ্যে সড়ক মহাসড়কের বাঁকের উপর ও বাঁকের ৫০-৬০ মিটার দুরত্বের মধ্যে বাসট্যান্ড, যানবাহন স্টপেজ নির্মাণ ও যানবহন থামানো নিষিদ্ধ করা অত্যাবশক। একই কারণে শহরের অভ্যন্তরেও এটি অনুসরণীয়, তবে শহরের এক- একটি সড়ক তুলনামুলকভাবে কম দৈর্ঘ্যের হওয়ায় ও বাঁক সমূহ কাছাকাছি হওয়ায় সড়ক বাঁকের ১০০ ফুটের মধ্যে যানবাহন থামানো ও অবস্থান করানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা যায়।

১৬। সড়ক-মহাসড়কের উপর, যানবাহন চলাচলের স্থানে যানবাহনের যত্ন নেয়া ও মেরামতের কাজ করলে যানজটসহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যানবাহন চালক ও এতদসংক্রান্ত পেশায় নিয়োজিতগণের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে পারেন।

১৭। যে সকল হালকা যানবাহন, স্বল্পদূরত্বের যাতায়াতকারী যানবাহন, বহুদূরগামী/ দ্রুতগামী যানবাহনের ইউটার্ন নেয়া প্রয়োজন, সে সকল যানবাহনের জন্য পৃথক লেন থাকা আবশ্যক। কোনো অবস্থাতেই যেন লেন ব্রেক না হয়, সেদিকে চালকবৃন্দের সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। আর ইউটার্ন নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট লেনে প্রবেশকারী যানবাহনকে নিরাপদতর সহযোগিতা করা অন্যান্য সকল চালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটি অবশ্য ট্রাফিক আইনও বটে। যানবাহন সুশৃঙ্খলভাবে চালানোর জন্য এটি মেনে চলা অত্যাবশ্যক।

১৮। সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন প্রতীক/নির্দেশনা বোর্ড নির্মাণ করে সড়কপার্শ্বে স্থাপন করা অতি জরুরী। সড়ক মহাসড়কে দুর্ঘটনামুক্ত ও যানজটমুক্ত যানবাহন চলাচলের নিমিত্ত সড়ক-মহাসড়কের উপর প্রয়োজনীয় প্রতীক বা সাঙ্কেতিক নির্দেশাবলী স্থাপন করা ও সেগুলো চালকগণের অনুসরণ করা আবশ্যক। সড়ক মহাসড়ক অধিদফতর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ় থাকতে পারেন।

১৯। ক) যানবাহন সরাসরি রাস্তা অতিক্রম করলে যানজট হয়। কারণ একদিকের যানবাহনের প্রবাহ যতক্ষণ রাস্তা অতিক্রম করা শেষ না করে, ততক্ষণ অন্যদিকের যানবাহনের প্রবাহ থেমে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়, দুর্ঘটনাও ঘটে। আর ঐ স্থানে যানজট হয়ে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে কোনো অবস্থাতেই ও কখনই একদিকের যানবাহনের পূর্ণপ্রবাহ রাস্তা অতিক্রম সমাপ্ত করতে পারে না। ফলে একদিকের যানবাহনকে কিছু কিছু করে রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। আর এতে যানজটও শেষ হয় না। কাজেই যানজটমুক্ত যানবাহন চলাচলের জন্য সরাসরি রাস্তা অতিক্রম বন্ধ করে, রাস্তা অতিক্রম করার স্থান থেকে ২.০০-২.৫০ কি.মি. দুরে দুরে ইউর্টান নিয়ে পাশের যানবাহনের প্রবাহের সাথে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌছানের ব্যবস্থা করা যায়। এটি আরও সহজ করার লক্ষ্যে ন্যূনতম ৫.০০

কি.মি. দুরত্বে গোলচত্বর নির্মাণ করা যায়। শহর অঞ্চলের ইউটার্ন ও গোলচত্বর হালকা ও অযান্ত্রিক যানবাহনের জন্য যথাক্রমে ন্যূনতম ৫০০ ও ৮০০ মিটার দুরত্বে টার্নিং নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। আবার মাঝারী ভারী যানবাহনের জন্য এই দুরত্বের পর থেকে ১০০০ মিটার পরপর টার্নিং পয়েন্ট নির্মাণ করা যায়। শহরের মাঝে ভারী যানবাহনের জন্য কোনো ইউটার্নের ব্যবস্থা না থাকাই ভালো। আর যদিও বিশেষ প্রয়োজনে এ ব্যবস্থা রাখা হয়, তবে এস্থান অবশ্যই অনেক প্রশস্থ রাখা আবশ্যক।

খ) সব গোলচত্বর বা ইউটার্নের স্থান দিয়ে যাতে একই সাথে/একই সময়ে ভারী, হালকা, যান্ত্রিক, অযান্ত্রিক যানবাহন টার্ন না নেয় বা নেয়ার ব্যবস্থা না থাকে এবং টার্নিং নেয়া যানবাহন যাতে সহজে ও বিঘ্নহীনভাবে যানবাহনের চলমান প্রবাহের সাথে মিশে একত্রে চলাচল অব্যাহত রাখতে পারে, সেদিকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে। ভারী যানবাহনের টার্নিংয়ের জন্য শুধু গোলচত্বর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

গ) গোলচত্বর ও ইউটার্ন সহজে অতিক্রম করার জন্য ন্যূনতম ৩-৪টি লেনের মধ্যেমে যানবাহন চালানোর ব্যবস্থা করা যায়। গোলচত্বর ও ইউটার্নের স্থান যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, এ সকল স্থানে চালকের ধৈর্য ও শৃঙ্খলার সাথে গাড়ি চালানোয় আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে। স্মরণীয়, ইউটার্ন ও গোলচত্বরের মাধ্যমে একদিকে যানবাহন সড়কের অন্যদিক থেকে আসা যানবাহনের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য যেন পৃথক পৃথক লেনের মাধ্যমে মূলস্রোতের সাথে মিশতে পারে। এ বিষয়ে এতদসংক্রান্ত নির্মাতা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

ঘ) সড়ক মহাসড়কের সাথে ডানদিকের সাইড বা পার্শ্ব সড়কের সংযোগ স্থলে সরাসরি আগত দুরপাল্লা ও দ্রুত গতির মাঝারী ভারী যানবাহন সমুহ বামদিকে টার্ন নিয়ে আলাদা লেনের মাধ্যমে নূন্যতম ৫০০ মিটার দুরত্ব অতিক্রম করে ইউটার্ন নিয়ে পূর্বের মোড়ে ফিরে আসতে পারে এবং বামদিকের নির্দিষ্ট লেনের মাধ্যমে নিরাপদ দুরত্ব অতিক্রম করে (২০০ মিটার) বড় সড়কে চলমান যানবাহন প্রবাহের সাথে মিশতে পারে। আবার মূল টার্নিং পয়েন্ট থেকে ৫০০ মিটার দূরে ইউটার্ন এর স্থানে রাইট টার্ন নিয়ে অন্য সড়কের মাধ্যমে মূল সড়কে একই পদ্ধতিতে আসতে পারে। এতে যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ ও পার্শ্ব থেকে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমে যেতে পারে। আবার সকল যানবাহনের জন্য রাইট টার্ন বন্ধ করারও প্রয়োজন হয় না। বিশেষ লক্ষ্যণীয়, এক্ষেত্রে দুইদিকের পার্শ্ব সড়ক থেকে যানবাহনের সরাসরি বড় সড়ক অতিক্রম করা ও ডানদিকে টার্নিং নেওয়া বন্ধ করা আবশ্যক। শুধুমাত্র হালকা ও মাঝারি ভারী যানবাহন যা দুরবর্তী স্থান থেকে আসে সেগুলো ডানদিকে টার্নিং নিতে পারে। এব্যবস্থায় বর্ণিত স্থানে যানজট নিরসন হওয়াসহ সড়ক দুর্ঘটনাও অনেক কমে যায়।

২০। সড়ক-মহাসড়ক সংকীর্ণ হলে যানজট হয়। সুতরাং নির্মিত সড়ক যেন যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, সেটি লক্ষণীয়। আরেকটি বিষয়, সরু সড়কের পার্শ্ববতী স্থানে জনসাধারণ সড়ক চওড়া করার জন্য যথাসম্ভব স্থান ছেড়ে দিতে পারে। এটি সকলের সামাজিক দায়বদ্ধতা। নির্মিত সড়ক রিমাডেলিং করে প্রয়োজনীয় চওড়া করার ব্যবাস্থা নেয়া যায়। এতে সড়কে যানজট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় এবং যানবাহন চলাচল অবাধ ও নিরবিচ্ছিন্ন হয়। সড়ক প্রশস্ত করার জন্য জনগণের ছেড়ে দেয়া স্থানের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়।

২১। ব্রিজ-কালভার্ট সরু হলে যানজট হয়। কারণ সরু ব্রিজ-কালভার্ট দিয়ে একই সময়ে একসাথে একদিকে গাড়ি অতিক্রম করতে পারবে না। ফলে ব্রিজ-কালভার্টের দুধারে সময়ে সময়ে বিপুল সংখ্যক যানবাহন দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়। আরেকটি বিষয় স্মরণীয়, সরু ব্রিজ-কালভার্ট অনেক সময়ই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ হয়। কাজেই নির্মিত ব্রিজ-কালভার্ট যেন সরু না হয়, সেদিকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখতে পারেন। প্রয়োজনে ব্রিজ-কালভার্টের রিমডেলিংও করা যায়।

২২। ক) সড়কে-মহাসড়কে ব্রিজ-কালভার্ট ভাঙ্গাচোরা বা মেরামতঅযোগ্য হলে যানজট হয়। কারণ ভাঙ্গাচোরা সড়ক ও মহাসড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট দিয়ে যানবাহন স্বাভাবিক গতিতে ও নিরাপদে চলাচল করতে পারে না। আবার কখনও কখনও ভাঙ্গাচোরা সড়ক-মহাসড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট দুর্ঘটনার কারণ হয়ে জীবনহানি ও সম্পদ ধ্বংস করে।

খ) সড়ক-মহাসড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট, মেরামতের সাথে সাথে রাস্তার পারিপার্শ্বিকতার উন্নয়নও জরুরী। এ সকল স্থান দিয়ে নিরাপদে, নিবিঘ্নে মানুষের হাঁটাচলা করার সুযোগসহ সময়ে যানবাহন পাস করানো যায়। যা যানজট নিরসনে সহায়ক হয়।

গ) কোন কোন স্থানে ব্রিজ কালভার্ট পুরানো হয়ে গেলে পাশে বা অদূরেই আরেকটি ব্রীজ বা কালভার্ট নির্মাণ করে পূরানো ব্রিজ কালভার্ট ব্যবহার অযোগ্য (Condemn) ঘোষণা না করে পুরানো ব্রিজ কালভার্ট প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার করে নতুন পুরানো উভয় ব্রিজ কালভার্টের মাধ্যমে একমুখী চলাচল পদ্ধতিতে যানবাহন চালানোর ব্যবস্থা করা যায়। এতে এসকল ব্রিজ কালভার্টের উপরে ও অদূরে যানজট হওয়ার সম্ভবনা অনেক কমে যায়।

২৩। রেলক্রসিংয়ের কারণে যানজট হয়। রেলক্রসিংয়ের সময় রেললাইনের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হয় নিরাপত্তার স্বার্থে। তা সত্তেও কখনও কখনও রেলক্রসিংয়ের কারণে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে। কাজেই যে স্থানে/সড়কের উপর বিপুল সংখ্যক যানবাহন চলাচল করে সে স্থানে রেললাইন স্থাপন না করাই ভালো। এলক্ষ্যে শহরের মধ্য থেকে রেলক্রসিং উঠিয়ে দিয়ে রেলক্রসিংয়ের স্থানে আন্ডারপাস, ফ্লাইওভার, ওভারপাস নির্মাণ করাই উত্তম।

আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো যে, শহরের উপরে রেললাইন স্থাপন না করাই যুক্তিযুক্ত।

২৪। যানবাহনের সহজ ও যানজটমুক্ত চলাচলের জন্যই উড়ালসেতু নির্মিত হয়। তবে এটি লক্ষণীয়, উড়ালসেতু সড়ক অতিক্রম করার সময় যানবাহন সহজে ও স্বাভাবিকভাবে এতে ওঠানামা করতে পারে কিনা। এলক্ষ্যে উড়ালসেতু নির্মাণের সাথে সাথে এগুলোর পারিপার্শ্বিকতারও উন্নয়ন আবশ্যক। উড়ালসেতু অতিক্রম করে আসা যানবাহনের দ্রুত দূরে নিষ্ক্রমনের ব্যবস্থা না থাকলে যানজট হয়, এমনকি উড়ালসেতুর উপরও যানজট হয়। এটি দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। একইসাথে উড়ালসেতু ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। তাই উড়ালসেতু নির্মাণের ডিজাইনে অবশ্যই দুদিকের যানবাহন চলাচল যাতে স্বাভাবিক থাকে, তার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। যে কোনো দুর্ঘটনার পর উড়ালসেতু থেকে যাতে দ্রুত মানুষ, পশু, যান্ত্রিক ব্যবস্থা, পণ্য ইত্যাদি স্থানান্তর করা/নামিয়ে নিরাপদ স্থানে নেয়া যায়, উড়ালসেতুতে তার ব্যবস্থা রাখা অতি জরুরী ।

২৫। সড়ক মহাসড়কের বাঁক সরু হলে এ সকল স্থানে যানজট হয়। যা বহুদুর বিস্তৃত হয়। কাজেই সড়ক মহাসড়কের বাঁক যাতে যথেষ্ট প্রশস্ত হয় ও পূর্ণ অংশ ব্যবহারোপযোগী থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

২৬। যানবাহনের সংখ্যার তুলনায় সড়ক মহাসড়ক সঙ্কীর্ণ হলে যানজট হয়। কারণ যানবাহন চলাচলের জন্য যে পরিমাণ জায়গা সঙ্কুলান হওয়া প্রয়োজন, এক্ষেত্রে তা থাকে না এবং ফলে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়ে যানজট সৃষ্টি হয়। কাজেই যানবাহনের সংখ্যার অনুপাতে যাতে সড়ক মহাসড়ক উপযুক্ত চওড়া হয়, সেদিকে সড়ক মহাসড়ক নির্মাণকারী কর্তৃপক্ষ সচেতন থাকতে পারেন। এ বিষয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণই যুক্তিযুক্ত।

২৭। একই সড়কে ভারী, মধ্যমভারী, হালকা, দ্রুত গতি, ধীরগতির যানবাহন চলাচলে যানজট সৃষ্টি হয়। এটি সড়ক দুর্ঘটনারও অন্যতম কারণ। কাজেই একই সড়কে যেন বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচলের সুযোগ না থাকে। অবশ্য বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের জন্য একই সড়কে পৃথক পৃথক লেন করা যায়। তবে হালকা ও ভারী যানবাহনের জন্য পৃথক সড়ক থাকাই শ্রেয়তর। হালকা যানবাহন আলাদা রাস্তায় একমুখী চলাচল পদ্ধতিতে চলাচল করলে বিষয়টি অধিকতর ফলপ্রসু হতে পারে। এটি সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণেও খুবই সহায়ক হতে পারে।

২৮। জনসংখ্যা স্থান ও যানবাহনের তুলনায় রাস্তার সংখ্যা কম হলে নির্বিঘ্নে ও যানজটমুক্তভাবে যানবাহন চালনা করা সম্ভব হয় না। কারণ রাস্তার সংখ্যা কম হলে একই রাস্তায় একইসাথে বহুসংখ্যক যানবাহন চলাচল করে। আর যানবাহনের আধিক্যের কারণে সেগুলো সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

সৃষ্টি হয় নানাবিধ সমস্যা। ফলে যানজট হয়। কাজেই যানবাহন ও জনসংখ্যার সাথে রাস্তার সংখ্যাও যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সেদিকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখতে পারেন।

২৯। একাধিক রাস্তা বা মহাসড়কের সঙ্গমস্থলে অতিক্রম স্থানে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা যায়। তাতে একরুটের গাড়ি ফ্লাইওভার দিয়ে নির্বিঘ্নে অন্য দিক থেকে আসা সড়ক পাড়ি দিতে পারে। একইভাবে অন্যরুটের যানবাহন ও ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে সরাসরি কোনো জটের সম্মুখীন না হয়ে যাতায়াত অব্যাহত করতে পারে। কাজেই যেখানে একদিকের সড়ক মহাসড়ক অন্যদিকের সড়ক মহাসড়ক অতিক্রম করে, সেখানে ফ্লাইওভার টানেল নির্মাণ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে টানেলও নির্মাণ করা যায়। দূরপাল্লার গাড়ির চলাচল অব্যাহত রাখার জন্য এসবই খুব কার্যকরী হতে পারে।

৩০। সড়ক মহাসড়ক নির্মাণ কৌশল দূরদর্শী পরিকল্পনায় এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে যানজট হওয়ার সুযোগ কম থাকে। উল্লেখ্য, যে সকল স্থানে যানজট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে সকল স্থানে সড়ক মহাসড়ক নির্মাণ না করাই শ্রেয়তর। আবার পূর্বে নির্মিত সড়ক মহাসড়কের যে স্থানে যানজট হয় ও তা নিরসনয্যেগ্য হয় না, সে সকল স্থান থেকে দূর দিয়ে বাইপাস সড়ক নির্মাণ ও তার মাধ্যমে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করলে সমস্যা সমাধান হতে পারে।

৩১। একস্থান থেকে পৃথক পৃথক স্থানে যাতায়াতের জন্য পৃথক পৃথক রাস্তা থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাতায়াতের জন্য বিপুল সংখ্যক যানবাহন একই সড়ক, মহাসড়ক ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। ফলে একই সড়ক-মহাসড়কের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক যানবাহনের গমনাগমন করতে হয়। আবার কোনো স্থানকে অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটিও রোধ হওয়া প্রয়োজন। পৃথক পৃথক স্থানে যাতায়াতের জন্য যথাসম্ভব পৃথক পৃথক সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণসহ কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে অন্যস্থানে যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার বন্ধ করা অত্যাবশ্যক।

৩২। জলজটের কারণে যানজট হয়। কারণ জলজটের স্থানে যানবাহনের গতি মন্থর বা স্থবির হয়ে যায়। আর জলাবদ্ধতার জন্য এ সকল স্থান দিয়ে যে সকল যানবাহন চলাচল করার কথা, সেগুলো অন্য স্থান/অন্য সড়ক দিয়ে চলাচলে বাধ্য হয়। ফলে অন্য সড়কে যানবাহনের আধিক্যের কারণে যানজট হয়। কাজেই যাতে জলজট না হয়, সেজন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ড্রেনের মাধ্যমে যাতে নির্বিঘ্নে বিপুল পরিমাণ পানি প্রবাহিত হতে পাওে, তার ব্যবস্থা রাখাও আবশ্যক। ড্রেনের মধ্যে যেন কোনো অবস্থাতেই জলপ্রবাহ বিঘ্ন সৃষ্টিকারী দ্রব্য ফেলানো না হয়, সেদিকে সকলেরই সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ড্রেনের সাথে সংযুক্ত খাল বা নালাসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কারও সমান প্রয়োজন।

৩৩। ফেরি পারাপারে বিঘ্ন ঘটলে নদীর/জলাশয়ের দুধারে বিপুল সংখ্যক যানবাহন স্থবির হয়ে পড়ে। এটি সময়ে বহুদুর বিস্তৃত হয়। ফলে এ সকল রাস্তায় প্রচন্ড যানজট হয়। এ বিষয়ে পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যানজট হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সময়ে অনেক স্থানে সড়ক মহাসড়ক ব্যবহারোনুপযোগী হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে সড়ক মহাসড়ক চরম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াসহ নানা ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুতে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ সকল স্থান যানবাহন চলাচলের জন্য খুব সঙ্কীর্ন হয়। কখনও কখনও এ সকল স্থান দিয়ে যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ রাখতে হয়। অন্যস্থান দিয়ে বিপুল সংখ্যক যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে স্থানে স্থানে প্রকট যানজট হয়। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগোত্তর সঠিক ও দ্রুত কার্যপরিকল্পনায় সড়ক-মহাসড়ক পুনর্ব্যবহারোপযোগী করা আবশ্যক।

৩৫।ক) সড়ক-মহাসড়কের উপর হাট-বাজার, যানবাহনের স্ট্যান্ড, ষ্টপেজ হলে এবং বিপুল জনসমাগম হলে যানজট হয়। আবার সড়ক দুর্ঘটনাও ঘটে। কাজেই সড়ক মহাসড়কের উপর উপরোক্ত বিষয়াদি যেন প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ বা আয়োজন না হয়; সেদিকে সকলেরই আন্তরিক হওয়া উচিত।

(খ) বিভিন্ন স্থানে সড়ক-মহাসড়কের পাশে কখনো কখনো হাট-বাজার, জনসমাগমপূর্ণ কার্যক্রম গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত এ সকল হাট-বাজার ও জনসমাগমপূর্ণ কার্যক্রমের কারণে প্রতিদিনই যানজট হয়। এ হাট-বাজার, কার্যক্রমসমূহ অন্যত্র স্থানান্তর করা যায়ই না, উপরোক্ত এগুলো দিনে দিনে আরো বড় হয়। ফলে এ সকল স্থানে যানজট অধিকতর প্রকট হয়। বাংলাদেশে মহাসড়কের উপর ২২৬ টি হাট বাজার রয়েছে। যা মহাসড়কে যানজটের অন্যতম কারণ এবং সড়ক দুঘর্টনার অন্যতম কারণ। অবিলম্বে এ সকল হাট বাজার উঠিয়ে অন্য নিরাপদজনক স্থানে প্রতিষ্ঠা করা যায়। লক্ষণীয়, এদেশে সড়ক মহাসড়কের পার্শ্বে যখন হাট বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন এ কাজে প্রশাসন অথবা স্থানীয় সরকার কেউই কোন বাধা দেয় না। যখন জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা সমালোচনা হয় তখন কিছুদিন এ সকল হাটবাজার উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে অনেক চেষ্টা ও উদ্যোগ অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কাজেই সমস্যাও সমাধান হয় না। নির্মিত সড়ক, মহাসড়ক অথবা পরিকল্পিত সড়ক মহাসড়ক থেকে নিরাপদ দূরত্বে হাট বাজার বসছে কিনা এটি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এ সমস্যা সমাধানে উল্লেখিত হাটবাজারের স্থানসমূহে ফ্লাইওভার নির্মাণ অথবা অন্যস্থানের মাধ্যমে বাইপাস নির্মাণ করে তার মাধ্যমে যান চলাচলের ব্যবস্থা করা যায়।

(গ) সড়ক-মহাসড়কের উপর অননুমোদিত যানবাহনের স্টপেজ নির্মাণ করা যানজটের অন্যতম কারণ। সুতরাং সড়ক-মহাসড়ক থেকে নিরাপদ দূরত্বে ও

সুবিধাজনক স্থানে যানবাহনের স্টপেজ তৈরি করা আবশ্যক। এ বিষয়সমূহে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আরও আন্তরিক হতে পারে।

৩৬। যানবাহনের অতিরিক্ত ব্যবহার যানজটের অন্যতম কারণ। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিজ অবস্থানের ৫-১০ কি. মি. এর মধ্যে যাতায়াতের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহার না করাই ভালো। এটি আইন করে রোধ করা অপেক্ষা বৃহত্তর স্বার্থে জনসচেতনতা সৃষ্টি অধিকতর ফলপ্রসু হতে পারে। জনগণের অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে পাবলিক যানবাহনের সংখ্যা ও সার্ভিসের মান উন্নত করাও আবশ্যক। এটি আইন করে রোধ করা অপেক্ষা বৃহত্তর স্বার্থে জনসচেতনতা অধিকতর কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হতে পারে।

৩৭। সকল বিভাগ ও অধিদফতরের কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবন কার্যালয়ের নিকবর্তী স্থানে নির্মাণ করা যায় এবং সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে এ সকল ভবনে থাকতে বা বসবাস বাধ্যতামূলক করা যায় যাতে দূরবতী স্থান থেকে কার্যালয়ে আসা যাওয়া করার জন্য কারও সরকারি ও অসরকারি যানবাহন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

৩৮। প্রতিহিংসা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বা যে কোনো কারণেই হোক যানবাহন দ্বারা বা অন্যকিছু দ্বারা সড়ক অবরোধে যানজট হয়। যানজট অবশ্যই ব্যক্তি-গোষ্ঠীর তথা জাতীর কার্যক্রম পিছিয়ে দেয়। কাজেই কেউই যেন ইচ্ছে করে সড়ক অবরোধ করে যানজট সৃষ্টি না করেন। ব্যতিক্রমে দোষী ব্যক্তি, গোষ্ঠীর বিরচদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়।

৩৯। মানুষের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপে অনেক সময় রাস্তা বন্ধ হয়। ফলে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে ও যানজট হয়। কাজেই সর্বশ্রেণির মানুষ যাতে সড়ক-মহাসড়ক সকল সময় মুক্ত রাখেন ও এমন কিছু না করেন, যাতে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এদিকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষও লক্ষ্য রাখতে পারেন। উল্লেখ্য, সড়ক বন্ধ হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে রাস্তায় বিভিন্ন প্রকার মালামাল ফেলে রাখা, রাস্তার জায়গায় অবকাঠামোগত নির্মাণ/মেরামত কাজ উদাহরণযোগ্য। এছাড়াও রাস্তা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করলে যানজট হয়। আবার রাস্তা মেরামতের সময় লক্ষণীয়, এটি এমন সময় হওয়া উচিত, যাতে রাস্তার কাজ চলার সময় অন্যস্থানে বিকল্প রাস্তা নির্মাণ করা যায়। আর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন কাজ শেষে বিকল্প রাস্তা যেন অন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করে।

৪০। সড়ক-মহাসড়কের উপর বা অতি নিকটে কখনও কোনো রাজনৈতিক/ অরাজনৈতিক কর্মসূচি নেয়া হলে ঐ স্থানে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বা মন্থর হয়ে যায়। ফলে এ সকল স্থানে যানজট হয়। আবার এ সকল স্থানের যানবাহন অন্যস্থান দিয়ে যাতায়াত করে, এতে অন্যস্থানের বিপুল সংখ্যক যানবাহনের আগমন ঘটে। ফলে যানজট হয়। কাজেই সড়ক-মহাসড়ক বন্ধ

করে নয়; বরং সড়ক-মহাসড়ক থেকে দুরে রাজনৈতিক/অরাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করলে যানজট সমস্যার একটি কারণ রোধ হয়।

৪১। সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, ব্যক্তি মালিকানাধীন কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কার্যক্রমের শুরু ও শেষ হওয়ার সময় একই হলে একই সময়ে সড়ক মহাসড়কে বিপুল সংখ্যক যানবাহনের আধিক্য হয়। ফলে যানজট হয়। এটি অবসানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যালয়ের শুরু ও শেষ হওয়ার সময় পৃথক পৃথক করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ সকাল ৭.৩০ থেকে বিকাল ৩.৩০ মি., সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সকাল ৯.৩০ মি. থেকে বিকাল ৫.৩০ মি. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকেল ৬.৩০ মি. এবং স্বায়ত্তশাসিত/আধাসরকারি কার্যক্রমসমূহ সকাল ১১.৩০ মি. হতে সন্ধ্যা ৭.৩০ মি. পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায়। কোনো ধরনের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আধঘন্টা আগে ও পরে এবং শেষ হওয়ার আধঘন্টা আগে ও পর পর্যন্ত অন্যান্য সকল কার্যক্রমের যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা যায়। কর্ম দিবসসমূহে ব্যক্তিগত সকল ধরনের যানবাহন সকাল ৯.০০টা থেকে সকাল ১০.০০ টা ও সকাল ১১.০০টা বেলা ১২.০০ এবং বিকেল ৫.০০ টা থেকে বিকেল ৬.০০টা ও সন্ধ্যা ৭.০০টা থেকে রাত্র ৮.০০টা পর্যন্ত রাস্তায় চলাচল নিষিদ্ধ করা যায়। অবশ্য এটি আইন করে বাধ্যতামূলক করার সাথে সাথে সমস্যা সমাধানের বৃহত্তর স্বার্থে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে।

৪২। পাইকারি মার্কেটসমূহ দিনে চালু থাকার কারণে সড়ক-মহাসড়কে দিনের বেলায় জনসমাগম ও মালামাল পরিবহন, লোকজন চলাচলের জন্য যানবাহনের আধিক্য হয়। ফলে যানজট হয়। অনেক রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে দিনের বেলায় পাইকারি/খুচরা মার্কেট বন্ধসহ যানবাহন চলাচলও বন্ধ থাকে। ফলে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবহনে খুব সমস্যা হয়। আর সময়ে মালামাল একস্থান হতে অন্যত্র পরিবহনে খুব সমস্যা হওয়ার কারণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা জাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটি অবসানের লক্ষ্যে সকল পাইকারি বাজার শুধু রাতে চালু রাখার বিধি বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়। অবশ্য এর সাথে অর্থ লেনদেনকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও খোলা রাখা যায়। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার করাও সমান জরুরী।

৪৩। যানজট নিরসনে গৃহীত কার্যক্রমে জনসাধারণের অনান্তরিকতা ও অসহযোগিতা সৃষ্ট সমস্যা সমাধান বিঘ্নিত করে। ফলে গৃহীত কার্যক্রমের দ্বারা যানজট হ্রাস না হয়ে বরং দীর্ঘায়িত ও জটিলতর হয়। সমস্যা সমাধানে সরকারি উদ্যোগকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা জনগণের নাগরিক দায়িত্ব। এটি শুধু যানজট নিরসনে নয়, রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রমের গতি অব্যাহত রাখা ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

৪৪। মানুষের অসচেতনতা, নিজ কাজে অনান্তরিকতা, সমস্যা সমাধানে মেধার অপব্যবহার, বহু পুরানো পদ্ধতি অনুসরণ করা ইত্যাদি কারণে যানজট প্রকট আকার ধারণ করে। যে কোনো সমস্যায়ই অনেক সময় সমাধান কাজে নিয়োজিত কর্মী, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণের ত্বরিৎ সময়োপযোগী ও সুশৃঙ্খল পদক্ষেপের অভাবে সমস্যা সমাধান বিলম্বিত হয়। কাজেই যানজট নিরসনে ও যানজটমুক্তভাবে যানবাহন চালানোর জন্য যানবাহন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও সমস্যাগ্রস্থ কারও দ্রুত ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব পদক্ষেপে সমস্যার দ্রুত ও সহজ সমাধান হতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অনেক সমস্যা সমাধানেও সময়ে এটি খুবই কার্যকরী হয়।

৪৫। মানুষের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলায় কখনও কখনও সড়ক-সহাসড়ক অবরোধ হয়। যা যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত করে। ফলে প্রকট যানজট হয়। যেহেতু যানজট সামগ্রিকভাবে সকলকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে। সৃষ্ট কোনো বিশৃঙ্খলায় যেন সড়ক-মহাসড়কের যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে সকলেরই আন্তরিক হওয়া কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। গণমানুষের সচেতনতা যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগের কর্মীগণের সময়োচিত দ্রুত সঠিক পদক্ষেপে এটি রোধ হতে পারে।

৪৬। জনগণের সড়ক-মহাসড়কের মধ্যে হেঁটে চলাচল করা, অভ্যাসবশত হাঁটাহাঁটি করা, অবস্থান করা এবং এ সকল কারণে সৃষ্ট জনজট যানজটের অন্যতম কারণ। ক্ষেত্রবিশেষে জনগণের এই অসচেতনতায় দুর্ঘটনা ঘটে। এটি রোধের জন্য উপযুক্ত ফুটপাত বা লেন নির্মাণ এবং তার যথার্থ ব্যবহার প্রয়োজন। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ জনসাধারণকে সচেতন ও উৎসাহী করতে পারেন।

৪৭। কোনো স্থানে অনিয়মতান্ত্রিক কাজের প্রতিবাদে অনেক সময় ক্ষুব্ধ জনগণ সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে প্রকট যানজট হয়। হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কাজেই এটি করা মোটেই সমীচীন নয়। প্রতিবাদ বা দাবি আদায়ের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়; তবে এ সকল কর্মসূচি থেকে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি স্থায়ী ভাবে বয়কট করলে জনগণেরই কল্যাণ হতে পারে। এদিকে সর্বশ্রেণির মানুষের আন্তরিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

৪৮। কোনো স্থানে সহিংস কার্যকলাপে যানবাহন চলাচল চরম বিঘ্নিত হয়। ফলে যানজট হয়। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, হিংসাত্মক মনোভাব পরিহার করে সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান, অনুধাবন করে সুশৃঙ্খল ন্যায়সঙ্গত ও সকলের জন্য কল্যাণকর পদক্ষেপই নিরাপদতর পরিস্থিতি সৃষ্টিসহ যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করতে পারে।

৪৯। (ক) যানজটের কারণ ও প্রতিকারের বিষয়সমূহ অবগত করানোর জন্য এবং যানজট মুক্ত যানবাহন চালানোর লক্ষ্যে সচেতন করার জন্য যানবাহন চালক ও এতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভা/সেমিনার করা যায়।

(খ) যানজট নিরসনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গঠিত কমিটিতে যানবাহন পরিচালনার পেশাজীবীগণকে অন্তর্ভুক্ত না করলে এ কমিটি দুর্বল হয় এবং সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে আশানুরূপ ফললাভ হয় না। আবার যানজটমুক্ত যানবাহন চলাচলের জন্য সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ বিবেচনাযোগ্য হতে পারে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, সেটি হলো- যানজট সমস্যা যেহেতু আন্তর্জাতিক সমস্যা; তাই সকল দেশে এ সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করা যায়।

তথ্য সংগ্রহ, সমার্থক সংবাদ প্রকাশ এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার:-

১) বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখ:- ১৪/১১/২০১৫ খ্রি.
২) বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখ:- ৩০/১১/২০১৫ খ্রি.
৩) দৈনিক গণমূখ	তারিখ:- ১৯/০১/২০১৬ খ্রি.
৪) দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখ:- ২০/০৭/২০১৭ খ্রি.
৫) দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখ:- ২৫/০৭/২০১৭ খ্রি.
৬) বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখ:- ১৯/০১/২০১৮ খ্রি.
৭) দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখ:- ২৫/০৩/২০১৮ খ্রি.
৮) Live TV	তারিখ:- ২৩/০৬/২০১৭ খ্রি.
৯) সময় টি.ভি	তারিখ :- ২৬/১০/২০১৭খ্রি.
১০) দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখ :- ০৯/০৮/২০১৮খ্রি.
১১) বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখ:- ১৯/০৭/২০১৯ খ্রি.
১২) দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখ:- ২৬/০৯/২০১৯ খ্রি.
১৩) বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখ:- ০৬/১১/২০২০ খ্রি.
১৪) দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখ:- ২৫/০৪/২০২২ খ্রি.

সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার

সড়ক মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় যানবাহন, বহনকৃত মালামাল, সড়ক মহাসড়ক ও এর পারিপার্শ্বিকতা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এক বা বহু প্রাণি ও মানুষ আহত বা নিহত হয় তাই সড়ক দুর্ঘটনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ সমূহের সাথে তুলনা করে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে বিভিন্ন অসরকারি সংস্থাসমূহের গবেষণা ও জরিপ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্য উল্লেখ করা হলো। ২০১৭খ্রি. এ সড়ক দুর্ঘটনায় মোট ২৩ হাজার ৫৯০ জন চালক, শ্রমিক, পথচারী ও যাত্রী আহত ও নিহত হয়েছে। গত ২০১৮খ্রি. এ মোট ৩ হাজার ১০৩ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ৪ হাজার ৪৩৯ জন নিহত ও ৭ হাজার ৪২৫ জন আহত হয়েছে। আরেক জরিপ অনুযায়ী ২০১৮খ্রি. এ ৫ হাজার ৫১৪ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এতে ৭ হাজার ২৫১ জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ১৫ হাজার ৪৬৬ জন। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে আঞ্চলিক সড়ক মহাসড়ক ও জাতীয় মহাসড়কে মোট ৪ হাজার ২১৯ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এবছর এসব দুর্ঘটনায় ৮ হাজার ৬১২ জন আহত হয়েছে এবং ৮ হাজার ৬২৮ জন নিহত । নিরাপদ সড়ক চাই এর হিসাব মতে গত ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সর্বমোট ৪ হাজার ৯২ টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ৫ হাজার ৮৫ জন আহত হয়েছে এবং ৪ হাজার ৯৯৬ জন নিহত হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ যাত্রীকল্যাণ সমিতির বার্ষিক সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সারাদেশে ৮ হাজার ৬ শত জন আহত এবং ৬ হাজার ৬৮৬ জন নিহত হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের হিসাব মতে গত ২০২০ খ্রিস্টাব্দে দেশে ৭ হাজার ৮৮৯ টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং দুর্ঘটনা স্থলেই ১ হাজার ৮০২ জন নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনা থেকে ১১ হাজার ৮৬২ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তাদেও মধ্যে অনেকেই পওে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সারাদেশে ৫ হাজার ৩৭১ টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ৭ হাজার ৪৬৮ জন আহত হয় এবং ৬ হাজার ২৮৪ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৮০৩ জন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন গড়ে ৫৫ জন মানুষ মারা যায়। সে হিসাবে এদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় বছরে ২০ হাজার জন মানুষ মারা যায়। বিশ্ব ব্যাংকের জরিপ অনুযায়ী এদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় গড়ে ১৮ হাজার জন নিহত হয়। ইউ এন ডি পির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি বছর গড়ে ১৫ হাজার মানুষ মারা যায়। দালিলিক প্রমাণেই এত হেরফের। মানুষ মরছে তো হিসাব হচ্ছে না। কোন সময়ে প্রকাশিত খবর অপেক্ষা বাস্তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৪-৫ গুণ বেশি থাকে। সারা বিশ্বে প্রতি বছর ১২-১৩ লক্ষ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে এবং এতে সারা বিশ্বে প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ মারা যায় এবং ৫ কোটিরও বেশি মানুষ আহত হয়। এসকল সড়ক দুর্ঘটনার শতকরা ৯০ ভাগই ঘটে

বাংলাদেশ ও এর মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে। সারা বিশ্বে মোট সড়ক দুর্ঘটনার অর্ধেক শিকার হয় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহ। দুর্ঘটনার শিকার এ সকল দেশ সমূহে আহত মানুষ জনের চিকিৎসার জন্য জাতীয় প্রবৃদ্ধির শতকরা ১ থেকে ৫ ভাগ ব্যয় করতে হয়। ইউরোপ মহাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় খুবই কম। বাংলাদেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনা এবং এতে ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনা করে সড়ক দুর্ঘটনা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পূর্বে উল্লেখিত রেকর্ড অনুযায়ী বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা এমন ভয়াবহ পর্যায়ে এসেছে যে, কোনো যানবাহনে যাতায়াত করার প্রয়োজন হলেই এমনকি সড়ক-মহাসড়কে পায়ে হেঁটে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবলেও মনটা থমকে যায়। অক্ষত ও সুস্থদেহে গন্তব্যে পৌঁছনো যাবে কিনা সংশয় দেখা দেয়। অথচ প্রত্যেকেই সুস্থ স্বাভাবিক দেহে যার যার কাজে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াত করতে চায়। ঘূর্ণায়মান রাখতে চায় ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সচলতার চাকা। এ উদ্দেশ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে সড়ক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় শুধু ব্যক্তিজীবনই ধ্বংস হয় না, অনেক পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির পঙ্গুত্ব/ মৃত্যুর কারণে পরিবারের আয়ের উৎসে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এতে এ সকল পরিবার খুব আর্থিক অনটনে পড়ে যায়। ফলে পরিবারের সদস্যগণের শিক্ষাসহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে বিপথগামী হওয়ার প্রয়াস পায় অনেকেই । যা শান্তি-শৃঙ্খলা ও সামাজিক পরিবেশ সংরক্ষণের চরম অন্তরায়। সড়ক দুর্ঘটনা এভাবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে পিছিয়ে দেয়; ক্ষেত্র বিশেষে ধ্বংসও করে দেয়। সড়ক দুর্ঘটনা শুধু ব্যক্তিজীবন ধ্বংস করে পরিবার তথা সমাজকেই পিছিয়ে দেয় না, এর কারণে প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক যানবাহন ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এ সকল ক্ষতিগ্রস্থ যানবাহনের স্থলে নতুন যানবাহন বা প্রয়োজনীয় পার্টস ক্রয় করতে হয় বিদেশ থেকে এবং তাতে আমাদের জাতীয় আয়ের এক বিরাট অংশ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে চলে যায় বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর হাতে। এ ছাড়াও সড়ক দুর্ঘটনায় সড়ক ও পারিপার্শ্বিকতাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনার কারণে ৭০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়। যার ব্যয়ভার অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবেই ব্যক্তি ও জাতিকে বহন করতে হয় । ব্যক্তি, পরিবার, জাতি ও রাষ্ট্রকে এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এবং সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নের অধিক অর্থ ব্যয় করার সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত অভিশপ্ত সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা অনিবার্যনীয়। সারাবিশ্বে প্রাণ সংহারী, মূল্যবান সম্পদ-সম্পত্তি ধ্বংসকারী এবং সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সমস্যাসমূহের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা অন্যতম। বিশ্বের প্রত্যেক দেশ জাতি এ দুর্ঘটনা রোধ করতে সচেষ্ট। আর এ লক্ষ্যেই নিচে সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকারের বিষয়ে কয়েকটি সুপারিশ করা হলো। উল্লেখ্য, সড়ক দুর্ঘটনার বিশেষ কোন কারণ প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। অর্থাৎ সড়ক দুর্ঘটনার প্রধানতম কোন কারণ নেই। এক একটি কারণে এক একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। যে কারণে যে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে সেই কারণই ঐ দুঘটনার প্রধান কারণ। অর্থাৎ সড়ক দুর্ঘটনার কোন কারণই কম গুরুত্বপূর্ণ বা অবহেলাযোগ্য নয়। তবে শুধুমাত্র সহজভাবে লেখা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যেই সড়ক দুর্ঘটনার কিছু কারণ ও প্রতিকারের অনুচ্ছেদসমূহ নিচে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১। দক্ষতা ও ড্রাইভিং লাইসেন্স

(ক) দক্ষতা: যানবাহন চালানো ও এতদসংশ্লিষ্ট কাজে অবশ্যই দক্ষতার প্রয়োজন। চালক অদক্ষ হলে মুহূর্তে বহু জীবন বিপর্যস্ত হয় এবং বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তি। একজন দক্ষ চালক সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় যানবাহন চালনা তো করেনই, উপরন্তু দক্ষতার সাথে যানবাহন চালানোর কারণে এতদসংশ্লিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ও গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সীমাবদ্ধ থাকে। আর অদক্ষ চালক এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি করেন। সুতরাং অদক্ষ ব্যক্তির হাতে কোনো অবস্থাতেই যেন যানবাহন চালানোর দায়িত্ব না দেয়া হয়, সেদিকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, অনেক সময় চালক হেলপার বা কন্ডাক্টরের হাতে যানবাহন চালানোর দায়িত্ব ছেড়ে দেন। যা প্রকারান্তে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটায়। যানবাহন চালক কোন অবস্থাতেই যেন এই কাজটি না করেন। মানুষের জীবন ও জাতীয় সম্পদ রক্ষায় আন্তরিক হোন। এটাই যানবাহন মালিক-শ্রমিক সকলের নিকট ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

(খ) ড্রাইভিং লাইসেন্স : যথার্থ ও উপযুক্ততা বাছাইপূর্বক ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান সড়ক দুর্ঘটনা ব্যাপক হ্রাস করার নিশ্চয়তা প্রদান করে। ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করার পূর্বে অবশ্যই আবেদনকারীর দক্ষতা, শারীরিক সুস্থতা, ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন কি না ও তা মেনে চলার বিষয়ে আন্তরিক মনোভাব পোষণ করেন কি না এ বিষয়ে সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২। ট্রাফিক আইন: যানবাহন পেশার সাথে নিয়োজিত সকলের ট্রাফিক আইন জানা ও মেনে চলা নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। এটি সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও যানজটমুক্ত যানবাহন চালানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সুতরাং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে যানবাহন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে সজাগ সচেতন করার জন্য যানবাহন মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যায়-

(ক) মাঝে মাঝে ট্রাফিক আইন ও সাইন সংক্রান্ত বিষয়ে সভা-সেমিনার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যানবাহন পেশার সকলকে জ্ঞান দান করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

(খ) গত ২-৩ বৎসরে যে সকল সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে সে সকল সড়ক দুর্ঘটনার উপর যানবাহন চালক, কন্ট্রাক্টর ও হেলপারদের নিয়ে কর্মশালা করা যায়। বিশেষতঃ যারা ঐ সকল দুর্ঘটনায় পড়েছে তাদের উপস্থিতি এবং কর্মশালায় তাদের

আলোচনার অংশ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ সকল কর্মশালায় প্রাপ্তফল ও গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যানবাহন পেশার সর্বশ্রেণিকে সচেতন করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষানীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়।

(গ) কোনো অবস্থাতেই অবৈধ অতিরিক্ত যাত্রী বহন করা সমীচীন নয়। সেই সাথে সকলের এ বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন যে, কেউ যেন যানবাহনে অবৈধ ও অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে ভ্রমণ না করেন। বর্তমানে যানবাহনের অনুমোদিত আসনসংখ্যা ও সম্ভাব্য অবস্থা প্রত্যক্ষ করে প্রচলিত আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য যানবাহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সম্মিলিতভাবে সার্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

(ঘ) মালামাল পরিবহনের গাড়িতে যাত্রী পরিবহন করা মোটেও নিরাপদ নয়। প্রায়ই দেখা যায়- মালামাল পরিবহনের ট্রাকে যাত্রী পরিবহন করা হয়। আর এসব ট্রাক দুর্ঘটনায় পড়ে ঘটনাস্থলে ১০-২০ জন করে লোক নিহত হয়। মালামাল পরিবহনের গাড়িতে যাতে যাত্রী পরিবহণ না করা হয়, সেদিকে হাইওয়ে বা ট্রাফিক পুলিশের কঠোর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সাধারণত দেখা যায়- দরিদ্র ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণই কম ব্যয়ে মালামাল পরিবহনের গাড়িতে যাতায়াতের সুযোগ নেয় এবং মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়। সুতরাং মানুষের অশিক্ষা ও অর্থনৈতিক দৈন্যও সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার অন্যতম কারণ।

(ঙ) সড়ক মহাসড়কে নিদিষ্ট স্থান ব্যাতিত অন্য কোথাও যাত্রী ও মালামল উঠানামা করা বন্ধ করা দরকার এবং বিশেষত চলন্ত যনবাহনে যাত্রী উঠানামা করা একবারে বন্ধ হওয়া আবশ্যক। চালকগণের সচেতনতা এ ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সড়ক-মহাসড়কের নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও যাত্রী ও মালামাল ওঠা-নামা করানো বন্ধ করা দরকার । চলন্ত গাড়িতে যাত্রী ওঠা-নামা করা একেবারে বন্ধ করা আবশ্যক। যানবাহনের কর্মরত ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে আরও আন্তরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত রাস্তায় কোথাও মালামাল সংরক্ষণ করা যানবাহনের যানজট ও দুর্ঘটনার কারণ সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ে গাড়ির চালক ও অন্যরা আন্তরিক হতে পারেন।

(চ) অতিরিক্ত মালামাল পরিবহনও দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। সুতরাং মালামাল

পরিবহনের গাড়িতে কোনো অবস্থাতেই ওভারলোড করে মালামাল যাতে পরিবহন করা না হয়, সেদিকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও হাইওয়ে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

(ছ) জনসাধারণ যাতে নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত রাস্তা পারাপার না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এটি আইনে পরিণত করা ও তার যথার্থ প্রয়োগ প্রয়োজন।

(জ) এক রুট থেকে অন্য রুটে যাওয়ার সময় বা একদিকের সড়কে প্রবেশের সময় অবশ্যই ভালোভাবে ট্রাফিক সিগন্যাল অনুসরণ করা আবশ্যক। ট্রাফিক সিগন্যল অমান্যকারীদের সাথে সাথে সনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় ।

(ঝ) Wrong Side দিয়ে Overtak করা সড়ক দুর্ঘটনার আরেকটি কারণ । অনেক সময় সামনের যানবাহন থেকে নেমে পড়া যাত্রী পিছন দিক থেকে Overtake করা যানবাহন দেখতে পারে না। ফলে অনেকেই Wrong Side দিয়ে Overtake করা যানবাহনের চাকায় পিষ্ট হয়ে আহত হয় অথবা মৃত্যু বরণ করে। এছাড়াও Wrong Side দিয়ে Overtake করা যানবাহনকে সঠিক ভাবে ও নিরাপদে সাইড দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে Wrong Side দিয়ে Overtaking এর কারণে দুর্ঘটনার সুযোগ সম্ভবনা সৃষ্টি হয়। কাজেই কোথাও কোন যানবাহন যেন Wrong Side দিয়ে Overtake করতে না পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকা বাঞ্চনীয়। এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য চালকগণের আন্তরিকতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

৩। সঠিক আইনের প্রয়োগঃ আমাদের দেশে বহুবিধ অনিয়মের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো দুর্নীতি ও সঠিক আইনের প্রয়োগহীনতা। আরও একটি বিষয় এখানে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। সেটি হলো আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাহীনতা। এগুলোর সাথে শুধু সড়ক দুর্ঘটনা নয়, জাতীয় সকল বিষয়ই সম্পৃক্ত । তবে এক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন সম্পর্কিত বিষয়টিই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো। ট্রাফিক আইনের ত্রুটি সংশোধন (যদি এটি থাকে), উপযুক্ত ট্রাফিক আইনের সার্থক প্রয়োগ, দুর্নীতিমুক্ত ট্রাফিক ব্যবস্থা সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এখানে শিক্ষার গুরুত্ব অনেক গভীর। আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে শিক্ষিত জনগণের নিকট থেকে বেশি সাড়া পাওয়া যায়, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪। ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনঃ সড়ক নিরাপদ ও চালক যত দক্ষ হোক না কেন, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন কোনো অবস্থাতেই দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সড়ক-মহাসড়কে যেন ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল করতে না পারে, সেদিকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কঠোর দৃষ্টি রাখতে পারেন। গাড়িচালক ও এ পেশার অন্যান্য ব্যক্তিগণের এ বিষয়ে সচেতনতা বিষয়টির আরও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব করতে পারে। মানুষের অমূল্য জীবন রক্ষার্থে, জাতির অর্থনৈতিক ক্ষতি রোধ করতে অবশ্যই যানবাহন পেশায় নিয়োজিত সকলেই এই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সহযোগিতা করতে পারেন।

৫। মাদকদ্রব্যঃ মাদকদ্রব্য গ্রহণের পর চালকের পক্ষে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে যানবাহন চালনা করা সম্ভব হয় না। মাদকদ্রব্য গ্রহণের পর যানবাহন চালনার সময় যানবাহন সহজে নিয়ন্ত্রণ হারায়। ফলে দূর্ঘটনা ঘটে। কাজেই যানবাহন চালক যেন কোন অবস্থাতেই মাদকাসক্ত না হয় সে দিকে সকলেরই আন্তরিক হওয়া ও সচেতন থাকা। আবার মাদকাসক্ত কোনো ব্যক্তি যেন কোনো অবস্থাতেই যানবাহন চালানোর

পেশায় নিয়োজিত হতে না পারে এবং ইতোমধ্যে কেউ যদি মাদক গ্রহণে আসক্ত হয়ে থাকে, তাকে অবিলম্বে পেশা থেকে বহিষ্কার করাসহ ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে। তবে কেউ মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত হলে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করে সুস্থ হওয়া সাপেক্ষে পুনরায় এ পেশায় নিয়োজিত হওয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৬। বেপরোয়া গতিঃ সড়ক দুর্ঘটনার জন্য যে কয়টি কারণ চিহ্নিত করা যায় তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ বেপরোয়া গতি। যানবাহন যদি সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে চলে, তাহলে বহু দুর্ঘটনা থেকেই রক্ষা পাওয়া যায়। একজন চালকের অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তার হাতে বহু জীবনের নিরাপত্তাসহ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হেফাজত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। যাত্রী সাধারণ ও তাদের সম্পদ নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়াই চালকের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব নিরাপদে পালন করাই চালকের কৃতিত্ব ও গৌরব। 'সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি' এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করা দরকার একজন চালকেরই। তবেই সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব। যা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে অত্যন্ত সহায়ক । সুনিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদতম গতিতে যানবাহন চালনোর জন্য চালকগণকে বাধ্য করা যায়। বিশেষত দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকায় নিরাপদ সীমায় সীমিত গতিতে যানবাহন চালনা করা কঠোরভাবে নিশ্চিত করা আবশ্যক।

বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচলের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ক) অসচেতনতা : বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচলের কারণসমূহের মধ্যে চালকের অসচেতনতা উল্লেখযোগ্য। চালক অসচেতন হলে দুর্ঘটনা সম্পর্কে উদাসীনতায় ও খামখেয়ালীপনা করে যানবাহন নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে চালান। আর তাতে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। সচেতনতা চালককে সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে নিরাপদে যানবাহন চলাতে উদ্বুদ্ধতো করেই একই সাথে চালক যানবাহন চালানোর নিয়মকানুন অনুসরণে আন্তরিক হন। আবার সচেতনতার কারণে চালক শুধুমাত্র দুর্ঘটনা মুক্তভাবে যানবাহন চালনাই করেন না স্বতঃস্ফুর্তভাবে, সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খলভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনেও আন্তরিক হন। কাজেই সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সুষ্ঠু সুশৃঙ্খলভাবে যানবাহন চালানোর জন্য অসচেনতা পরিহার করে চালকের সচেতন হওয়ার কোন বিকল্প নেই।

খ) মাদক ও অবৈধ মালামাল বহন : যানবাহনে মাদক দ্রব্য ও যে কোন অবৈধ মালামাল বহন করলে সাধারণত চালক সন্ত্রস্ত/আশঙ্কিত থাকে এবং দ্রুত এ মালামাল গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। ফলে যানবাহনও অতি দ্রুত গতিতে চালনা করে। সৃষ্টি হয় দুর্ঘটনার কারণ। কাজেই মানুষকে শুধুমাত্র মাদক ও অবৈধ মালামালের ভয়াবহ কুফল থেকে রক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই নয়, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্যও যানবাহনে যে কোন ধরনের অবৈধ মালামাল ও মাদকদ্রব্য যাতে বহন করা না হয় সেদিকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও যানবাহন পেশা নিয়ন্ত্রণকারী সকলেরই সচেতন হওয়া আবশ্যক।

গ) দুর্ঘটনা : সাধারণত সড়ক দুর্ঘটনার পর চালক দুর্ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কারণ দুর্ঘটনার পর সাধারণ মানুষের আইন হাতে তুলে নেওয়ার হিংস্র প্রবণতা পোষণ করেন। ফলে দুর্ঘটনার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্ঘটনাকারী যানবাহনের চালক ও সহযোগীগণ অত্যন্ত নির্মম আচরণের শিকার হন। অথচ দুর্ঘটনার পর সহানুভূতিশীল আচরণ করে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের নিরাময়ের জন্য দ্রুত চিকিৎসালয়ে প্রেরণ সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। কেননা এর সাথে মানুষের জীবন-মৃত্যু জড়িত। আর এ দায়িত্বের প্রতি আন্তরিক না হয়ে চালক ও তার সহযোগিদের প্রতি নির্মম, হিংস্র আচরণ করা চরম বর্বরতাপূর্ণ কাজ। এ বর্বর আচরণ কেউ যেন না করেন। দুর্ঘটনার পর যানবাহনের চালক ও সহযোগীগণ এমনিতেই বিপর্যস্থ থাকেন। সে সময় তারা হিংস্র আচরনের শিকার হওয়ার আতঙ্কে অতি দ্রুত দুর্ঘটনাস্থল থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে কখনও কখনও আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আবার দুর্ঘটনার পর চালক ও তার সহযোগীগণেরও মানবিক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া উচিত যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বরং তারা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে দূরে সরে যান। এটিও তাদের কাছে কাম্য নয়।

ঘ) যাত্রীদের অপরিনামদর্শিতা : কখনও কখনও যাত্রীগণ অপরিনামদর্শীতার পরিচয় দিয়ে যানবাহনের চালককে অতি দ্রুত যানবাহন চালানোর জন্য মদদ দেন বা এমন আচরণ করেন যাতে চালক অসচেতনতার পরিচয় দেন বা ক্রোধান্বিত হয়ে যানবাহন দ্রুত গতিতে চালান। ফলে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কাজেই সকল সময় চালককে ধৈর্য্য ও সহনশীলতার সাথে নিরাপদে যানবাহন চালানোর জন্য উৎসাহীত করা এবং সদাচারণ করা প্রত্যেক যাত্রী সাধারণের অবশ্য কর্তব্য।

ঙ) যান্ত্রিক ত্রুটি : যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার কারণেও যানবাহন বেপরোয়া গতিতে ছুটতে পারে। যেমন ব্রেক সিস্টেম, গিয়ার চেঞ্জ সিস্টেম, এক্সিলারেটিং সিস্টেমে ত্রুটি থাকলে যানবাহনের উচ্চ গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, এক্ষেত্রে নিশ্চিত দুর্ঘটনা ঘটে। কাজেই যানবাহন সড়কে নামানোর পূর্বেই প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক নিরাপত্তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আবার স্টিয়ারিং সিস্টেমে ত্রুটি থাকলে যানবাহনের দিক নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয় এবং দুর্ঘটনা ঘটে।

চ) চালককে বাধ্য করা : চালককে তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, অথবা অন্য কোন প্রভাবশালী, সন্ত্রাসীরা অতি দ্রুত যানবাহন চালাতে বাধ্য করে। এক্ষেত্রে চালক কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী অতি দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করে। আবার সন্ত্রাসীদের কারণে তাদের ইচ্ছার বলি হয়ে খুব দ্রুত যানবাহন চালাতে বাধ্য হয়। প্রস্তুত হয় দুর্ঘটনা ঘটার ক্ষেত্র। কাজেই সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করার যতগুলো পদক্ষেপ আছে তার মধ্যে কর্তৃপক্ষের চালককে যানবাহন চালানোর ব্যবস্থাপনা দ্বারা নির্ধারিত সময় অপেক্ষা কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে বাধ্য করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। আবার

যানবাহন সন্ত্রাসীদের কবলে পড়েছে কি না তা রাস্তায় অবস্থানরত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর লক্ষ্য করা প্রয়োজন। অনেক সময় জনগণের সহযোগিতা এ বিষয়ে খুবই ফলপ্রসু হয়।

ছ) রাজনৈতিক অস্থিরতা : রাজনৈতিক অস্থিরতায় চালক দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। যা অনেক সময়ই দুর্ঘটনা ঘটায়। সুতরাং সকল রাজনৈতিক অস্থিরতায়/কার্যক্রম রাস্তায় চলাচলরত যানবাহন যাতে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে সেদিকে রাজনৈতিক মহলের আন্তরিক হওয়া বাঞ্চনীয়।

জ) অর্থনৈতিক কারণ : সামনের ষ্টপেজ থেকে বেশি যাত্রী ও মালামাল গ্রহণ করে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যানবাহন কখনও কখনও খুবই দ্রুত ও বেপরোয়াভাবে চালান হয়। আবার কখনও কখনও অতিরিক্ত দু একটি ট্রিপ পাওয়ার লক্ষ্যে যানবাহন বেপরোয়া দ্রুত গতিতে চালিয়ে গন্তব্যে পৌছানোর চেষ্টা করা হয়। ফলশ্রুতিতে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এটি রোধ করার জন্য যানবাহন চলাচলে অর্থনৈতিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে চালককে সচেতন ও বাধ্য করা খুবই ফলপ্রসু হতে পারে।

ঝ) মাদকাসক্ত : চালক মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে যানবাহণ চালানোর সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় এবং সচেতনতা হারায়। এর ফলে বিপজ্জনক ও অনিয়ন্ত্রিত গতিতে যানবাহন চালনা করে । ফলে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কাজেই অতি দ্রুত গতিতে যানবাহন চালনা না করার জন্য যানবাহন মাদকদ্রব্যমুক্ত রাখা ও চালককে মাদকমুক্ত রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ঞ) সড়ক মহাসড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন আবশ্যক। এতসংক্রান্ত যান্ত্রিক ও কারিগরী ব্যবস্থার ব্যবহার ও উন্নয়ন খুবই ফলপ্রসু হতে পারে।

৭। অনিয়মের প্রতিযোগিতা : সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হলো একাধিক চলন্ত যানবাহনের পাল্লা-প্রতিযোগিতা। অনেক সময় সামনের স্টপেজ থেকে অধিক যাত্রী পাওয়ার আশায়, কখনও সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য, কখনও বা বিনা কারণেই দুটি যানবাহন পাল্লা-প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলে বিপজ্জনক গতিতে ছুটতে থাকে একেকটি যানবাহন; যা প্রকারান্তে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ হয়। সড়ক দুর্ঘটনা রোধ এবং মানুষের অমূল্য জীবন রক্ষার্থে এই দানবীয় প্রতিযোগিতা বন্ধ করা আবশ্যক । আবার অবশ্যই নিরাপদে ও সময়ে যাত্রী সাধারণকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া দরকার যানবাহন চালকের এটাও স্মরণ রাখা আবশ্যক । অর্থাৎ নিরাপদে ও সময়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য স্বস্তিদায়ক নিরাপদতম ভ্রমণ উপহার দিবেন যানবাহন চালক ও এতদসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা এটিই সকলের প্রত্যাশা।

৮। ভুল সিগন্যাল দেয়া ও সিগন্যাল না থাকা: সড়ক মহাসড়ক ও রেলপথে দুর্ঘটনা না ঘটার জন্য সঠিক সিগন্যাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভুল সময়ে সিগন্যাল দেওয়া, সঠিক সময়ে ভুল সিগন্যাল অথবা যথাসময়ে সিগন্যাল প্রদর্শিত না হওয়ার কারণে কোন দিকে থেকে যানবাহন বা ট্রেন আসতে পারে বা আদৌ আসছে কি না এটি বুঝা যায় না। অর্থাৎ ভুল সিগন্যালের কারণে বা সিগন্যাল না থাকার কারণে চালক সময়ে ও সঠিক স্থানে সঠিক সিদ্ধান্তসহ যানবাহন ও ট্রেন চালনা করতে ব্যর্থ হয়। আবার যানবাহনের হেলপার, কনট্রাক্টর ভুল সিগন্যাল দিলে বা সিগন্যাল না দিলে দুর্ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ যান্ত্রিক অযান্ত্রিক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সঠিক স্থানে সঠিক সময়ে সঠিক সিগন্যাল প্রদর্শিত হওয়া এবং সে সিগন্যাল মেনে চলায় ছোট বড় অনেক দুর্ঘটনা রোধ হয়। কাজেই হেলপার, কনট্রাক্টর, চালক, ট্রেন ও যানবাহন চালনা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের এ দিকে সচেতন হওয়া ও সচেতন থাকা বাঞ্চনীয়।

৯। প্রশিক্ষণ ও শারীরিক পরীক্ষা: যানবাহন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ সময়ে সময়ে শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পর শুধু গাড়ির ফিটনেস নয়, চালকের ফিটনেস ও দক্ষতা উভয়ই পরীক্ষা ও উন্নয়ন করার বিধি-বিধান প্রণয়নও বাস্তবায়ন সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। প্রত্যেক যানবাহন চালককেরই শারীরিক সুস্থ থাকা আবশ্যক। বিশেষত যানবাহন চালানোর সময়। এটির কোনো বিকল্প নেই। উল্লেখ্য, ক্লান্তি বা অবসাদজনিত কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে। কাজেই যানবাহন চালকগণ একাধিকক্রমে দীর্ঘ সময় যানবাহন না চালিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় যানবাহন চালাতে পারেন। চালকগণের গাড়ি চালানোর প্রস্তুতি নেয়ার সময় এবং গাড়ি চালাবার সময় এ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। উল্লেখিত বিষয়সমুহে যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক অ্যাসোশিয়েসন কর্তৃপক্ষ অধিকতর আন্তরিক হতে পারেন।

১০। নিরাপদ সড়ক নির্মাণ: সড়ক ও মহাসড়ক যথাসম্ভব নিচু করে নির্মাণ করা প্রয়োজন। যে সকল কারণে আমাদের দেশে সড়ক-মহাসড়ক অতি উচু করে নির্মাণ করা হয়, তার প্রধান কারণ সড়ক-মহাসড়ককে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা। এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা অনেক সময় ও শ্রমসাপেক্ষ। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের দেশ প্রাকৃতিক কারণে উত্তর দিকে উঁচু ও দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে ক্রমশ ঢালু। এদেশের প্রায় সকল নদ-নদীর উৎস উত্তরের উঁচু হিমালয় পর্বতমালায়। পানির স্বাভাবিক ধর্মের কারণে উঁচু ভূমিতে সৃষ্ট নদ-নদীসমূহ দক্ষিণ দিকে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়। সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণের সময় এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা বা গবেষণা করা হয় না। যার ফলে এদেশের সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণকৌশলে এসব নদ-নদীর মাধ্যমে পানির স্বাভাবিক প্রবাহে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এটি ছাড়াও মানুষের সৃষ্ট কারণে ও প্রাকৃতিক কারণে নদ-নদীর তলদেশে উচু ও ভরাট হয়ে নদ-নদীসমুহ পানি ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যার ফলে একটু অধিক বৃষ্টি হলে, বর্ষায় নদীতে স্বাভাবিক পানি অপেক্ষা একটু বেশি পরিমাণ পানি এলেই বন্যা হয়। আবার পানির স্বাভাবিক প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা থাকায় সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। ফলে ডুবে যায় সড়ক-মহাসড়ক। দীর্ঘদিন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন হয়। জনজীবনও বিপর্যস্ত হয়। পানিতে ডুবে থাকার কারণে সড়ক-

মহাসড়কের মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় জাতি। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই সড়ক-মহাসড়ক উঁচু করে নির্মাণ করা হয়। আর উচু সড়ক ও মহাসড়ক হয় দুর্ঘটনার ভয়ঙ্কর একটি কারণ। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আর একটি সমস্যা ডেকে আনা হয়। সড়ক-মহাসড়কসহ সমগ্র দেশকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন নদীর নাব্য ঠিক রাখা, পানির স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো। তবেই বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ডুবে যাওয়ার আশঙ্কায় সড়ক-মহাসড়ক উচু করে নির্মাণ করার প্রয়োজন হয় না এবং সড়ক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্যতা ও তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক হ্রাস পায়। বৃষ্টিপাতের কারণে যাতে পার্শ্ববর্তী জমি প্লাবিত করে সড়ক-মহাসড়ক ডুবিয়ে না দেয়, সেজন্য পার্শ্ববর্তী জমিতে কৃত্রিম সরু খাল খনন করে নিকটস্থ প্রাকৃতিক জলাধারের সাথে সংযোগ করে দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এটি জমি থেকে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনসহ মাটির আর্দ্রতা রক্ষা ও অধিক শস্য উৎপাদনে সহায়ক হয়। নির্মিত উঁচু সড়ক-মহাসড়কের দুইপাশে বেশ কিছুদূর বিস্তৃত ঢাল নির্মাণ করা যেতে পারে।

(খ) সড়ক-মহাসড়কে বাঁক নির্মাণ করা একেবারেই অনুচিত। আবার নির্মিত সড়ক বাঁক সুষ্ঠু পরিকল্পনায় যথাসম্ভব সোজা করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ সড়ক-মহাসড়ক যথাসম্ভব সোজা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সড়ক-মহাসড়কে বাঁকের কাছে চলন্ত যানের চালককে কয়েকটি কাজ অতি দ্রুত করতে হয়। যেমন- যান বাহনের গতি কমানো, সিগন্যাল দেওয়া, সামনে পিছনে অন্য কোন যানবাহন আছে কি না লক্ষ্য করা, ষ্টিয়ারিং নিয়ন্ত্রণ করা এবং হর্ণ বাঁজানো। এর কোন একটি কাজ সময়ে সম্পূর্ণ না হলে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আবার বাঁকের স্থানে অনেক সময়ই ওভারটেক করার সময় একটি যানবাহন সামনের দিক থেকে আগত অন্য যানবাহন দেখতে না পারার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। আবার অনেক সময় গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কারণে পিছন থেকে দ্রুত বেগে আসা যানবাহন সামনের যানবাহনকে ধাক্কা দেয়। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে। এসকল দুর্ঘটনা রোধে নিম্লোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

i) বাংলাদেশ জনসংখ্যাধিক্য এবং পরিকল্পনাহীন ঘরবাড়ি দালানকোঠা নির্মানের দেশ। ঘন বসতির কারণে ও অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন, গ্রাম-গঞ্জ, রাস্তা-ঘাট, নির্মাণের কারণে সড়ক মহাসড়ক অনেক স্থানে সোজা করে নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। এটি অবসান হওয়ার লক্ষ্যে সকল কিছু নির্মাণ ও গঠন করার নিমিত্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। আবার জনগণের ইচ্ছামাফিক কোন কিছু নির্মাণ করতে না দেওয়াই উত্তম। তবেই সড়ক-মহাসড়ক সোজাভাবে নির্মাণ করা সম্ভব হতে পারে।

ii) প্রতিটি বাঁকের ২০০ মিটার থেকে ৩০০ মিটার পর্যন্ত দুরত্বের মধ্যে ওভারটেকিং সরাসরি নিষিদ্ধ করা যায়।

iii) প্রতিটি বাঁকে ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব পালন সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়।

iv) প্রতিটি বাঁক যথেষ্ট প্রশস্থ করে নির্মাণ করা আবশ্যক এবং কোন অবস্থাতেই যেন সড়ক বাঁকে দোকান-পাট, বাজার-ঘাট, বাস ষ্টপেজ, ঘনভাবে গাছপালা লাগান ইত্যাদি না থাকে।

v) বাঁকের কাছে একদিক থেকে অন্যদিক সরাসরি দৃষ্টিগোচরে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। প্রয়োজনে উপযুক্ত স্থানে বিশেষ ধরনের বড় আয়না স্থাপন ও ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম স্থাপনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

গ) সড়ক বাঁকের কাছে যানবাহনের গতি কমানোর জন্য ব্রেক করতে হয়। ব্রেক করার ফলে সমগ্র যানবাহনের কাঠামোতে কম বেশি চাঁপ পড়ে। অর্থ্যাৎ যানবাহনের প্রতিটি সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সড়ক মহাসড়কে বাঁকের সংখ্যা বেশি হলে চলন্ত যানবাহনের চালককে একের পর এক ব্রেক করতে হয় অল্প সময়ের ব্যবধানে। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম হয়। ফলে যানবাহনের মেরামত ব্যয় বেড়ে যায়। আবার যানবাহনের আয়ুষ্কালও কমে যায়। এক্ষেত্রে প্রতি ১০ বৎসরে যানবাহনের যে ব্যয়ের অর্থ বিদেশিদেরকে প্রদান করতে হয় সে পরিমাণ অর্থ অনেক কম সময়েই বিদেশীদের হাতে চলে যায়। জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় এটি খুবই ক্ষতিকর। আবার ব্রেক করার কারণে রাস্তার উপর বেশ চাপ পড়ে। ফলে সড়ক মহাসড়কেরও ক্ষতি হয়। অর্থাৎ সড়ক মহাসড়ক মেরামতের ব্যয়ও অলক্ষ্যে বেড়ে যায়। এটিও জাতির জন্য ক্ষতিকর। এসকল ক্ষয় ক্ষতির ব্যয় থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য সড়ক মহাসড়ক যথাসম্ভব সোজা করে নির্মাণ করাই শ্রেয়তর।

(ঘ) বিভিন্ন রুট থেকে সড়কসমূহ ক্রস করার স্থানে ফ্লাইওভার নির্মাণ যানবাহনের যাতায়াত অবাধ ও নিরাপদতর করতে পারে।

(ঙ) সড়ক-মহাসড়ক অতিক্রমকারী রেলসড়কের স্থানে ট্রেন বা সড়ক যে কোনো একটির ফ্লাইওভার বা ওভারপাস নির্মাণ করা যেতে পারে। এতে ট্রেনের ও যান-বাহনের গতি অব্যাহত থাকতে পারে এবং ট্রেন ও যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে না।

(চ) অপ্রয়োজনীয় আইল্যান্ড বা ডিভাইডার ভেঙ্গে ফেলা দরকার। নির্মিত আইল্যান্ড বা ডিভাইডারসমূহ যাতে যানবাহনের চলাচলের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি বা দুর্ঘটনার কারণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিশেষত বাঁক নেবার স্থানে এক সড়ক থেকে আরেক সড়ক মুখে নির্মিত/ নির্মিতব্য আইল্যান্ড যাতে যানবাহনের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

(ছ) একই স্থানে বিভিন্ন দিক থেকে যানবাহনের যাতায়াত সুনিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে যে সকল স্থানে একই স্থানের মাধ্যমে যানবাহনে বিভিন্ন দিক থেকে যাতায়াত করে, তার থেকে অল্প দূরত্বে বাইপাস সড়ক নির্মাণ করে তার মাধ্যমে

যানবাহন একমুখী পদ্ধতিতে চালনা করার ব্যবস্থা করা যায়। এতে একই জায়গায় বিভিন্ন দিক থেকে যানবাহনের আগমন বন্ধ হতে পারে। যা সড়ক দুর্ঘটনা ও যানজট হ্রাস করে।

(জ) প্রত্যেক সাইড রোড বা পার্শ্ব রাস্তা থেকে সরাসরি বড় সড়কে যানবাহন উঠে আসা বন্ধ করে নির্দিষ্ট লেনের মাধ্যমে বামদিকে নূন্যতম ৫০ মিটার দীর্ঘ টার্নিং এর মাধ্যমে বড় সড়কে উঠে এসে যানবাহন প্রবাহের সাথে একত্রে চলাচলের ব্যবস্থা করা যায়। এতে এ সকল স্থানে যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ বা পার্শ্ব থেকে আসা যানবাহনের সাথে সংঘর্ষ রোধ হতে পারে। আবার একই সাথে এ সকল টার্নিং পয়েন্ট বা সড়ক মোড় যানজট মুক্ত থাকতে পারে।

(ঝ) সড়ক ও মহাসড়কের দুইপাশে বৃক্ষরোপণ করে মনোরম দৃশ্য সৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা/ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস করতে ও পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক হয়। ডিভাইডার বা আইল্যান্ডের উপর গাছপালা রোপণ করা পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক। সড়ক ডিভাইডার যথাসম্ভব অপ্রশস্ত করলে যানবাহন চলাচলের জন্য সড়কে বেশী স্থান থাকে।

(ঞ) যে সকল স্থানের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ যানবাহনের চলাচল নিরাপদতর হয় না, সে সকল স্থানে সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ করা ঠিক নয়। যেমনঃ নদী ও খাল বা কোনো জলাধারের পার্শ্ববর্তী জায়গা এবং হাট-বাজারের নিকটবর্তী স্থান।

(ট) সড়ক মহাসড়কে সৃষ্ট খানা-খন্দ ও জলজট দুর্ঘটনার কারণ হয়। বিশেষত খানা-খন্দ ভরা সড়কে জলাবদ্ধতা হলে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটা নিশ্চিত হয়ে যায়। কাজেই খানাখন্দ-ভাঙ্গাচোরা মেরামত ও জলাবদ্ধতার জল নিষ্কাশন না হওয়া পর্যন্ত সড়কের এ সকল স্থান দিয়ে যানবাহন চলাচল একেবারেই বন্ধ রাখা নিরাপদতম।

(ঠ) পাহাড় পর্বত অঞ্চলে সড়ক-মহাসড়কের যে পাশে খাদ থাকে, সে পাশে যথেষ্ট চওড়া স্থান রেখে পর্যাপ্ত বৃহদাকার গাছপালা রোপণ করা যায়। এ সকল স্থানে সড়ক-মহাসড়ক আরও নিরাপদতর করার জন্য সড়ক পার্শ্বস্থ চওড়া স্থান যে স্থানে শেষ হয় সে স্থান থেকে সামান্য উঁচু স্থান নির্মাণ করেন। পুনরায় আরো একটি চওড়া স্থান নির্মাণ ও তাতে আরও গাছপালা রোপণ দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন রক্ষা করতে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। এভাবে পাহাড়িয়া সড়ক-মহাসড়কের পারিপার্শ্বিকতা তৈরি করলে এ সকল পথে চলমান যানবাহনে সড়ক থেকে খাদে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ব্যাপক হ্রাস পায়। সড়ক মহাসড়কে যে স্থানে উভয়পাশে খাদ সেখানে অবশ্যই দু'পাশেই একইভাবে বড় আকারের গাছপালা রোপন করা যায়। আবার সড়ক-মহাসড়কের যে পার্শ্ব খাড়া পাহাড় সংলগ্ন সে পাশে যাতে ভূমিধ্বসে সড়ক-মহাসড়ক বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে সড়ক-মহাসড়কের এই পাশেও পাহাড়ের ঢালে গাছপালা রোপন করা যায়। পাহাড়-পর্বত অঞ্চলে সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখলে নিরাপদতর সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ হতে পারে।

আবার পাহাড়-পার্বত্য অঞ্চলের সড়ক-মহাসড়ক কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে দ্রুত মেরামত অত্যাবশ্যক।

১১। অবৈধ যাত্রীবহন : অন্যায় করার সুযোগ যদি সৃষ্টি হয় বা পরিবেশ থাকে তবে অন্যায়, অবৈধ কাজ কম-বেশী হয়ই। বাংলাদেশের অনেক যানবাহনে কিছু না কিছু অবৈধ যাত্রী বহন করার সুযোগ রাখা হয়। যার ফলে গাড়ির চালক/কন্ডাক্টর এই অবৈধ আসনসমূহে যাত্রী বহন করে। আবার অন্য গাড়ি অপেক্ষা আগে গন্তব্য পৌঁছানোর জন্য বা কখনও কখনও কম ভাড়ায় ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে এইসব অবৈধ আসনের যাত্রী হন অনেকেই। এইগুলো চালকের আসনের এত সংলগ্ন যে, যাত্রী বসার পর চালকের গাড়ি চালাবার সময় মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে সড়ক দুর্ঘটনার সমূহ আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। এই বিঘ্ন উপেক্ষা করেই অধিক অর্থনৈতিক লাভের আশায় এসব আসনে অবৈধভাবে যাত্রী বহন করা হয়। যারা এসব আসন গ্রহণ করেন, তাদের অনেকেই, গাড়ির চালক, কন্ডাক্টর, হেলপার প্রত্যেকেই ও অনেক যাত্রী সাধারণ জানেন যে, সিটগুলো অবৈধ। এইসব আসনের যাত্রীদের নিকট পূর্ণভাড়া আদায় করা যায় না। অর্থাৎ পূর্ণভাড়া দাবি করলেই আসনগুলো অবৈধ হয়ে যায়। আর কম ভাড়া দাবি করলেই আসনগুলি বৈধ হয়ে যায়। এটি একটি অদ্ভূত মানসিকতা। অবৈধ জেনেও সেই আসনসমূহে অনেকেই ভ্রমণ করেন; এমন কি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নির্লিপ্ত। অর্থাৎ জেনেও আইন মানা হয় না বা প্রয়োগ করা না। সকলেই কেমন যেন অন্ধত্বে ও ডুবে গেছে । আর জেনেও অনেকেই আইন মেনে চলেন না। দেখেও আইন প্রয়োগ হয় না। সকলেরই এ কৃত্রিম অন্ধত্ব, অজ্ঞতা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা দূর করা প্রয়োজন।

১২। শিক্ষা ও ড্রাইভিং পেশা: ড্রাইভিং পেশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পেশা। একজন ড্রাইভারের সামান্য ভুলের/দুর্বলতার কারণে বহু জীবনের সমাপ্তি ঘটে। নিরাপদে যানবাহন চালানোর লক্ষ্যে চালককে গাড়ি চালানোর বিষয়ে দৃঢ় মানসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতি, ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জানা ও মেনে চলা, সর্বোপরি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই অধিকতর উপযুক্ত। সুতরাং ড্রাইভিং বা যানবাহন পেশায় অধিক শিক্ষিত যুবক ব্যক্তিগণ নিয়োজিত হলে অবশ্যই সড়ক দুর্ঘটনা ব্যাপক হারে হ্রাস পেতে পারে। শিক্ষিত যুবকগণকে এ পেশায় আগ্রহী করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সামাজিক মর্যাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। একটি বিষয় বিবেচ্য যে, ড্রাইভিং পেশা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি পেশা, পেশায় নিয়োজিতগণের নিজের জীবনও বারবার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। সুতরাং এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের জীবনবীমা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ধরণের আরও যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত বিষয় এক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে এটি সহায়ক হতে পারে।

১৩। পথচারী ও চালকদের সচেতনতা : যে সকল স্থানে পথচারী পারাপার হয়, সে

সকল স্থানে যানবাহনের গতি অত্যন্ত নিরাপদ সীমায় রাখা প্রয়োজন। উপযুক্ত স্থানে পথচারী পারাপারের স্থানে ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ ও তার যথাযথ ব্যবহার নিরাপদে সড়ক পার হওয়া নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে ওভারব্রিজে ওঠার জন্য সিঁড়ির পরিবর্তে র‍্যাম্প নির্মাণ করলে প্রতিবন্ধীদের সড়ক পারাপারে সহজ ও নিরাপদতর হতে পারে।

(১) চলন্ত অবস্থায় চালকের অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করা, নিয়োজিত হওয়া: যানবাহন চলন্ত অবস্থায় চালক কোনো কারণেই নিজ দায়িত্ব পালন করা ছাড়া অন্য কোনো কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন না বা নিয়োজিত হতে পারেন না। চালকের সামান্য অমনোযোগিতার কারণে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

(২) চালকের অধৈর্য: চালকের অধৈর্য সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। কাজেই ধৈর্যের সাথে নিরাপদে যানবাহন চালনা করলে বহু দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৩) যানজট: অনেক ক্ষেত্রেই যানজটের কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সুতরাং যানজটহীন যানবাহন চালনায় সড়ক দুর্ঘটনার একটি কারণ রোধ হয়।

(৪) যানবাহন চালনার পেশাজীবীগণের দায়িত্বশীল হওয়া: যানবাহন চালক ও তার সহকর্মীগণের দায়িত্বের প্রতি অনান্তরিক হওয়া ও অপরিণামদর্শী কার্যকলাপে কখনও বা সামান্য ভুলের কারণে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কাজেই চালক ও তার সহকর্মীগণ যেন নিজ পেশা ও দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ আন্তরিক হন ও নির্ভুলভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকেন। এছাড়াও তারা যেন সদা সর্তক ও সাবধানে যানবাহন চালনা করেন। যানবাহন চালানো শুরু করার পূর্বেও চালকের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ আবশ্যক। এটি নিরাপদে ও দুর্ঘটনাহীনভাবে যানবাহন চালানোর গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

(৫) রাস্তায় চলাচলের সময় সাবধানতা অবলম্বন: জনগণের রাস্তায় হাঁটাচলা বা হালকা যানবাহন (যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক) ব্যবহারের সময় সচেতন থাকা ও নিয়ম মেনে চলা আবশ্যক। অসচেতনতা, অসতর্কতা, অসাবধ্যনতা থেকে এবং নিয়ম না মেনে রাস্তায় চলাচল করার কারণে বহুজন দুর্ঘটনার শিকার হন। এমনকি জীবনহানিও ঘটে। পথচারীদের রাস্তায় চলাচলের সময় অন্য কাজে নিয়োজিত হওয়া এবং অন্য কাজে মনোনিবেশ করা দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার অন্যতম কারণ।

১৪। সড়কের উপর জনসমাগম : সড়ক মহাসড়কের আশেপাশেই বা রাস্তার উপর যাতে বিপুল জনসমাগম স্থান, হাটবাজার, স্কুল কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সড়কের উপর সভা-সমাবেশ যানবাহনের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে । যা ট্রাফিক জ্যাম এবং অনেক সময় জীবনহানির মারাত্মক আশঙ্কা সৃষ্টি করে। রেললাইনের ক্ষেত্রেও এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সমান প্রযোজ্য।

১৫। ব্রিজ, কালভার্ট ও রেলিং : ব্রিজের রেলিং ভেঙ্গে বা ব্রিজে ওঠার সময় যানবাহন দুর্ঘটনা কবলিত হয়। অবশ্যই ব্রিজ বা কালভার্ট যথেষ্ট চওড়া, রেলিং অত্যন্ত মজবুত করে নির্মাণ করা প্রয়োজন। আবার ব্রিজ-কালভার্টে যানবাহন ওঠার সময়, ব্রিজ কালভার্ট পার হওয়ার সময় এবং ব্রিজ-কালভার্ট থেকে নেমে আসার সময় যানবাহন খুব সতর্কভাবে চালনা করা আবশ্যক।

১৬। সড়ক মহাসড়কের পারিপার্শ্বিকতা: (ক) সড়ক-মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী স্থানে খাল-নালা, পুকুর-ডোবা খনন করা ও ঢাকনাবিহীন ড্রেন নির্মাণ করা মোটেও সমীচীন নয়। উল্লেখিত স্থানসমূহে ইতোপূর্বে খননকৃত খাল, খানাখন্দ, পুকুর-ডোবা ইত্যাদি ভরাট করে ফেলা অত্যাবশ্যক। সড়ক পার্শ্বস্থ জমি খনন করে সড়ক পার্শ্বস্থ স্থান অধিকতর নিচু করা বন্ধ হওয়া আবশ্যক।

(খ) সড়ক পাশে চালকের মনোযোগ নষ্টকারী বিজ্ঞাপন ও উচ্চশব্দ উৎপন্ন না করা : সড়ক বা মহাসড়কের পাশে এমন বিজ্ঞাপন দেয়া একেবারেই অনুচিত, এটি সহজে চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বা মনযোগ নষ্ট করে। সড়ক-মহাসড়কের আশেপাশে কোথাও বিপুল শব্দের উৎস তৈরি করলে তাও চালকের মনোযোগ নষ্ট করে ও দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা সৃষ্টি করে। রাস্তার পাশে ব্যাপক আলোকসজ্জা ও শব্দ সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠান সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে।

১৭। প্রাকৃতিক দুর্যোগ: কোনো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বে যথাসম্ভব নিরাপদ স্থানে যানবাহন সংরক্ষণ করা আবশ্যক। কোনো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যানবাহন খুবই সতর্কতার সাথে চালনা করা আবশ্যক। আবার কোনো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়ক-মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের পরিপন্থী অবস্থা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে দুর্যোগের পর সড়ক-মহাসড়কে স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত পুনরায় নির্মাণ করা দরকার। চালকগণও যেন স্মরণ রাখেন যে, সড়ক-মহাসড়কে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে কোনো স্থানে সৃষ্ট প্রতিকূল অবস্থার জন্য দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই দুর্যোগের সময় ও পরে যানবাহন চালনা করতে হয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। ঝড়, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, ঘন কুয়াশা, প্রবল জোয়ার, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি উল্লেখিত দুর্যোগের উদাহরণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যানবাহন নিরাপদজনক স্থানে থামিয়ে রাখাই উত্তম

১৮। বিনয়ী ব্যবহার ও শান্ত পারিপার্শ্বিকতা : বিনয় মানুষের পারিপার্শ্বিকতা শান্ত রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ড্রাইভিং কাজে নিয়োজিত সকলকে অবশ্যই শান্ত মনে দৃঢ় প্রত্যয়ে দায়িত্ব পালন করতে হয়। দুশ্চিন্তা, অশান্ত মনমানসিকতা, ক্রোধ প্রভৃতির কারণে মানুষের একাগ্রতা, মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস করে। অশান্ত পারিপার্শ্বিকতা উপরোক্ত বিষয়টির অন্যতম কারণ। সুতরাং গাড়ি চলন্ত অবস্থায় কোনোক্রমেই গাড়ির ভিতরের পরিবেশ যাতে অশান্ত না হয়, সেদিকে গাড়ির যাত্রী চালক-কর্মচারী প্রত্যেকেরই সচেতন থাকা উচিত। সেই সাথে প্রত্যেক যাত্রীরই চালকের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৯। দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ: দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে প্রকৃতই দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে দুর্ঘটনা হ্রাস পেতে পারে। এক্ষেত্রে আইন প্রয়োগে যেন কখনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা হয়। আইন প্রয়োগে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা বা আইনকে নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া শুধু সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস নয়, সমাজের সকল বিশৃঙ্খলাসহ রাষ্ট্রীয় সকল অনিয়ম ও বেআইনী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে মূল্যবান ভূমিকা রাখে।

২০। দ্রুত গতিতে যানবাহনের চলাচলের রাস্তায় ধীরগতির যানবাহন চলাচল: দ্রুত গতিতে যানবাহন চলাচলের রাস্তায় ধীরগতির যানবাহন চলতে না দেয়াই উত্তম। অনেক সময় দ্রুত গতির যানবাহনের সাথে গতির সামঞ্জস্য রেখে ধীরগতির যানবাহন সাইড দিতে ব্যর্থ হয়, ঘটে যায় দুর্ঘটনা। আবার কখনও ধীর গতির যানবাহনকে নিরাপত্তা দিয়ে পাশ কাটানোর সময় দ্রুত গতির যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়। আবার হালকা গতির যানবান পাশ কাটানোর জন্য কখনও রাস্তার নিজ পার্শ্ব ছেড়ে অন্য পার্শ্বে আসতে হয়। ফলে বিপরীত দিক থেকে আগত যানবাহনের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। আবার হালকা গতির যানবাহন যেন নির্ধারিত লেন ছেড়ে মূল সড়কে না আসে। কখনো ধীরগতির যানবাহনকে নিরাপত্তা দিয়ে পাশ কাটানোর সময় দ্রুত গতির যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারায়। এসব ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণ দ্রুত গতির যানবাহনের সড়কে ধীরগতির যানবাহনের চলাচল । এটি অবশ্য কখনো কখনো ট্রাফিক জ্যামেরও অন্যতম কারণ হয়। কাজেই কোনো অবস্থাতেই দ্রুত গতির যানবাহন চলাচলের সড়ক বা মহা সড়ককে ধীরগতির যানবাহন চলতে দেয়া সমীচীন নয়। তবে প্রয়োজনে ধীরগতি ও হাল্কা যানবাহনের জন্য সড়ক মহাসড়কের পাশে আলাদা লেন করা যায়।

২১। সড়ক মহাসড়কে মোটর সাইকেলের দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ:

সাধারণত উঠতি বয়সে তরুণ-তরুণীরাই সড়ক মহাসড়কে খুব দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে মোটর সাইকেল চালনা করে। এরা মোটর সাইকেল খুব অনিরাপদ ও বিপদজনকভাবে চালনা করে। আবার সড়ক মহাসড়কে মোটর সাইকেল ও হালকা যানবাহনের নির্ধারিত লেন থাকলেও এরা সে লেনে মোটর সাইকেল চালনা করে না। দ্রুতগতির দূরপাল্লার গাড়ি চালনার স্থান দিয়ে মোটর সাইকেল চালনা করে। ফলে অনেকেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়। এটি বন্ধ হওয়া আবশ্যক। উঠতি বয়সে তরুণ-তরুণীদের হাতে মোটর সাইকেল না দেয়াই ভাল। আর রাস্তায় চলমান মোটর সাইকেল আরোহীর ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে কি না এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না এটি কঠোরভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক ও প্রভাবশালীগণ লক্ষ্য রাখতে পারেন।

২২। ধূমপান: চলন্ত অবস্থায় যেন চালক ধূমপান না করেন। এটি সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে।

২৩। অপরিণত বয়সের চালকের যানবাহন চালানো : অপরিণত বয়স্ক চালক দক্ষতার সাথে যানবাহন চালনা করতে সক্ষম হয় না এবং আবেগতারিত হয়ে ভুল করে বসে। আবার এরা দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয় ফলে দুর্ঘটনা ঘটে। আবার যানবাহন চালনার জন্য এদের শারীরিক যোগ্যতাও থাকে না। অর্থাৎ যানবাহন চালনায় শারীরিক-মানসিক অনুপযুক্ততা, অদক্ষতা এবং অনভিজ্ঞতার কারণে অপরিণত বয়স্কগণ নিরপদে যানবাহন চালনায় সক্ষম নয়। কাজেই অপরিণত বয়স্ক চালকদের হাতে কোন অবস্থাতেই যানবাহন চালনার দায়িত্ব দেওয়া সমীচিন নয়।

২৪। গণ সচেতনতা: (ক) এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, আমাদের সর্বশ্রেণির মানুষ সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন কিনা? আমি আমার অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিকতা থেকে নিশ্চিত যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত/অশিক্ষিত সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে খুব কমসংখ্যক মানুষ সচেতন। সকল শ্রেণির মানুষকে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন করা আবশ্যক। এই বিষয়ে সতর্কতা, প্রতিকার, দুর্ঘটনার সাথে সাথে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে সকলকে শিক্ষা দেয়া জরুরী। ট্রাফিক আইন সম্পর্কে যেমন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সচেতন করা দরকার; তেমনিভাবে সড়ক দুর্ঘটনার কারণ এবং এ বিষয়ে সতর্কতা ও দুর্ঘটনার পর প্রত্যেকের আন্তরিকতা, প্রাথমিক চিকিৎসা, মানবিক দায়িত্ববোধ প্রভৃতির উপর সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সড়ক দুর্ঘটনা ও ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে।

(খ) সড়ক দুর্ঘটনা রোধে এবং সড়ক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত সকল স্তরের মানুষকে সচেতন করার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠগণকে নিয়ে সভা/সেমিনার করে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জানানো যায়। বয়োজ্যষ্ঠগণ নিজ পরিবারের অনুজগণকে উল্লেখিত সভা/সেমিনারে আলোচিত বিষয়াদির ভিত্তিতে পরামর্শ দিতে পারেন। এভাবে পরিবার থেকেই সকলকে সচেতন করে সাবধানে চলাচল, নিরাপদে যানবাহনে যাতায়াত করা শিক্ষা দেয়া যায়।

(গ) সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকারের বিষয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

(ঘ) শুধুমাত্র আইন প্রয়োগেই সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ, পথচারী, যাত্রী সাধারণ, যানবাহনের হেলপার, কন্ট্রাক্টর, চালক, মালিক পক্ষ, যানবাহন চালনা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, সড়ক মহাসড়ক নির্মাণকারী বিভাগ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগ সকলের আন্তরিকতা ও সচেনতায়ই সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে পারে।

(ঙ) নিরাপদে যানবাহন চালনার জন্য গাড়ি চালনার পেশাজীবীদের সাথে নিয়ে মিটিং, মিছিল, মানববন্ধনসহ অন্যান্য সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করলে তাদের সকলেরই এতদবিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি সড়ক দুর্ঘটনা রোধে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

২৫। পরিষদ গঠন করা: সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী পদক্ষেপ হলো ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, যানবাহন মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে পরিষদ গঠন করা । তাদের যৌথ পদক্ষেপই উপরোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সহজ হতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ, সমার্থক সংবাদ প্রকাশ এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার,:-

১। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখঃ- ২২/০৭/২০১৫ খ্রিঃ
২। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখঃ- ১৭/০৮/২০১৫ খ্রিঃ
৩। মানব কণ্ঠ	তারিখঃ- ১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ
৪। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ২২/১০/২০১৫ খ্রিঃ
৫। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখঃ- ২৩/১০/২০১৫ খ্রিঃ
৬। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখঃ- ০৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ
৭। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ১০/০১/২০১৬ খ্রিঃ
৮। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখঃ- ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ
৯। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ১১/১২/২০১৬ খ্রিঃ
১০। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ২৯/০১/২০১৭ খ্রিঃ
১১। প্রথমআলো	তারিখঃ- ১৩/০২/২০১৭ খ্রিঃ
১২। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখঃ- ১৯/০২/২০১৭ খ্রিঃ
১৩। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখঃ- ২০/০২/২০১৭ খ্রিঃ
১৪। প্রথমআলো	তারিখঃ- ২২/০২/২০১৭ খ্রিঃ
১৫। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখঃ- ২৯/০৫/২০১৭ খ্রিঃ
১৬। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ০২/০৭/২০১৭ খ্রিঃ
১৭। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ১৪/১১/২০১৭ খ্রিঃ
১৮। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখঃ- ১৪/০১/২০১৮ খ্রিঃ
১৯। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ১২/০৪/২০১৮ খ্রিঃ
২০। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ২৪/০৪/২০১৮ খ্রিঃ
২১। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ
২২। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখ ঃ- ১৭/১০/২০১৮ খ্রিঃ
২৩। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ৩১/১২/২০১৮ খ্রি.
২৪। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখ;- ৩১/১২/২০১৮ খ্রি.
২৫। দেশ রূপান্তর	তারিখ ঃ- ৩০/০১/২০১৯ খ্রি.
২৬। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখ ঃ- ১৩/০২/২০১৯ খ্রি.
২৭। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ০৮/০৮/২০১৮খ্রি.
২৮। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখ ঃ- ০৪/০৭/২০১৯ খ্রি.
২৯। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখ ঃ- ০৬/০৭/২০১৯ খ্রি.
৩০। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ০২/০১/২০২০ খ্রি.
৩১। বাংলাদেশ প্রতিদিন	তারিখঃ- ০৭/০১/২০২১ খ্রি.
৩২। কালের কণ্ঠ	তারিখঃ- ১৯/০১/২০২১ খ্রি.
৩৩। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ- ২৮/০১/২০২১ খ্রি.
৩৪। আজকের দেশবাসী	তারিখঃ- ৩১/০১/২০২১ খ্রি.
৩৫। দৈনিক জনকণ্ঠ	তারিখঃ-২৫/০৪/২০২২ খ্রি.
৩৬। দেশ রূপান্তর	তারিখঃ- ০৯-০১-২০২২ খ্রি.
৩৭। গুগল	তারিখঃ- ০২-০৫-২০২২ খ্রি.

একটি সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের ইতিহাসে গত ২০১১ সালের ১১ জুলাই তারিখে চট্টগ্রামের মীরসরাইতে স্মরণকালের ভয়াবহতম ও মর্মান্তিকতম সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও ঘটনা বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বিষয় বের হয়ে আসে।

ঘটনার বিবরণ- মীরসরাই আবু তোরাব স্কুলের ছাত্রগণ ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ ও খেলা উপভোগ করার জন্য একটি মিনি ট্রাকে করে খেলার মাঠে গিয়েছিলো। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে মীরসরাই নামক স্থানে মিনি ট্রাক সড়কে চলমান একটি ভ্যানকে দ্রুত গতিতে পাশ কাটানোর সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। ফলে ছাত্র বহনকারী এ মিনি ট্রাকটি মহাসড়কে পার্শ্ববর্তী একটি খাদে পড়ে উল্টে যায়। খাদে অগভীর পানি ছিল। এ দুর্ঘটনায় ৪৪ জন প্রাণ হারায়। পরে ছেলের মৃত্যু সংবাদে শোকে একজন বাবা হৃদযন্ত্রে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। মিনি ট্রাকটি চালকের পরিবর্তে একজন হেলপার চালাচ্ছিল এবং হেলপারচালক মোবাইল ফোনে কথা বলতেছিল। এ দুর্ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় আলোচনায় চলে আসে।

১। ছাত্রগণ মালামল পরিবহনের মিনি ট্রাকে করে খেলায় অংশ গ্রহণ ও খেলা উপভোগ করতে গিয়েছিল। এটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। মালামাল পরিবহনের ট্রাকে মানুষ নয় শুধু মাত্র মালামালই পরিবহনযোগ্য। আহত নিহত ছাত্রগণকে তাদের অভিভাবকগণ নিজ বাড়িতে এটি শিক্ষা দেন নি যে, কোথাও যাতায়াত করার জন্য বাসে বা মিনি বাসে যাতায়াত করতে হয় ট্রাক বা মিনি ট্রাকে নয়। যার ফলে সকল ছাত্রই মিনিট্রাকে করে নির্দিষ্ট স্থানে যেতে ও ফিরে আসতে প্রতিবাদ করে নাই। পারিবারিক অসচেতনতা, যানবাহনে যাতায়াত সংক্রান্ত ও সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষা না দেওয়ার কারণে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

২। স্কুলের শিক্ষকগণও এ বিষয়ে অসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা দুর্ঘটনা কবলিত ঐ সকল ছাত্রদের অবশ্যই ট্রাকে নয় মানুষ পরিবহনের বাসে করে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে তা হয় নি। কাজেই এ দুর্ঘটনায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রের মৃত্যুর জন্য শিক্ষকগণের অসচেতনতা ও অদূরদর্শীতাও অনেকাংশে দায়ী।

৩। গাড়ী চালকের পরিবর্তে হেলপার গাড়ী চালাচ্ছিল। এটি সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। কোন অবস্থাই চালক তার স্টিয়ারিং হেলপারের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন না। আবার কোন হেলপারও অদক্ষতা নিয়ে সড়কে গাড়ি চালানর মত গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে পারেন না। আবার তারা মালামাল পরিবহনের পরিবর্তে মিনি ট্রাকে মানুষ পরিবহন করেছেন। উভয়ই শাস্তি যোগ্য অপরাধ। কাজেই এ দুর্ঘটনার জন্য গাড়ির মূল চালক ও হেলপার উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত করা যায়।

৪। চালক অসচেতনতাবশত গাড়ি চালানর সময় মোবাইল ফোনে কথা বলছিল। এটি খুবই আপত্তিজনক, যানবাহন চালানর সময় চালক যানবাহন চালান ছাড়া অন্য কাজে নিয়োজিত হলে বা মননিবেশ করলে দুর্ঘটনার সম্ভবনা সৃষ্টি হয়। কারণ মনযোগবিহীন কাজ দক্ষতর ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। বিশেষত যানবাহন চালান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটি অধিকতর গুরুত্বের সাথে স্মরণ ও পালনযোগ্য। ব্যতিক্রমে এই দুর্ঘটনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

৫। মালামাল পরিবহনের মিনি ট্রাকে মালামালের পরিবর্তে মানুষ পরিবহন করা হয়েছে- ট্রাফিক পুলিশ বা হাইওয়ে পুলিশগণের এতে বাঁধা দেওয়া প্রয়োজন ছিল। এ ট্রাকটি মহাসড়কে চলতে দেওয়া মোটেও আইনসম্মত হয় নি।

৬। হাইওয়েতে ভ্যান চলতে দেওয়া নিষিদ্ধ। যদি আশেপাশে কোন সাইড রাস্তা থাকে যাতে ভ্যান ও হালকা যানবাহন চলার সুযোগ থাকে তবে হাইওয়েতে ভ্যান বা হালকা যানবাহন চলতে দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ হওয়া সমীচীন। এদিকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের আরও কঠোর হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে তাদের অনান্তরিকতায় দুর্ঘটনা ঘটেছে।

৭। হাইওয়েতে ভ্যান বা হালকা যানবাহন চলার জন্য আলাদা লেন ছিল না। অথবা থাকলেও ভ্যান সে লেন ব্যবহার না করে মূল সড়কে উঠে আসার কারণেই এ দুর্ঘটনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। কাজেই ভ্যান চালকের অসচেতনতাও এ দুর্ঘটনার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৮। সড়ক মহাসড়কের পার্শ্বে কোন খানাখন্দ, গর্ত থাকা মোটেও সমীচীন নয়। কারণ যানবাহন যে কোন সময় যান্ত্রিক ক্রুটি বা অন্য কোন কারণে নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে এবং সড়কচ্যুত হতে পারে। সড়ক পার্শ্বে খানাখন্দ, গর্ত থাকলে নিয়ন্ত্রণ হারান যানবাহন খানাখন্দ বা গর্তে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ও জীবনহানী হয়। কাজেই সড়ক মহাসড়ক নির্মাণকারী কর্তৃপক্ষেরও উচিত ছিল সড়ক পার্শ্বস্থ খানাখন্দ গর্ত হতে না দেওয়া এবং বিদ্যমান গর্ত ভরাট করে ফেলা। এটি শুধু মাত্র এক্ষেত্রেই নয় সকল স্থানের জন্য সমান প্রযোজ্য।

উপরোক্ত সড়ক দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পরিবার থেকে শুরু করে গাড়ি চালক, অন্যান্য পেশাজীবী, যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, সড়ক মহাসড়ক নির্মাণকারী কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি পর্যন্ত অনেকেই সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী । কাজেই একক ভাবে কোন শ্রেণির মানুষ বা বিশেষ পেশাজীবীগণকে সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা সমীচীন নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

তথ্য সূত্র ঃ

১। দুর্ঘটনা সমসাময়িক বিভিন্ন মিডিয়া।

২। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ ঃ ১১-০৭-২০১৮ খ্রি.

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকারের আরো কিছু সুপারিশ

বাংলাদেশে যেসব সড়ক-মহাসড়কে খুব বেশি সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটছে, তার মধ্যে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ মহাসড়কে বিশেষত ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর পূর্বপাশ পর্যন্ত দুর্ঘটনা খুবই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। এর কারণ এ রুটে যত অঞ্চলে যানবাহন চলাচল করে, অন্য রুটে তত চলাচল করে না। এ কারণেই এ রুটে যানবাহন চলাচলের বিষয়টি আরও নিরাপদতর হওয়া প্রয়োজন। নানা কারণে নানা রকমের সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এরমধ্যে যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ অন্যতম। আর এ রুটে দুর্ঘটনায় বর্তমানে বেশি ঘটছে। এ রুটে নিরাপদে যানবাহন চালনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াদি অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যায়।

(ক) চালকের অসাবধানতা এটির প্রধান কারণ।

(খ) অদক্ষ চালক সামনের দিক থেকে আগত গাড়ি ক্রসিংয়ের সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। ফলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

(গ) যান্ত্রিক ক্রুটি। যানবাহনে যান্ত্রিক ক্রুটি থাকলে যানবাহনে নিয়ন্ত্রণে খুবই সমস্যা হয়।

(ঘ) চালক ও যানবাহন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা এ ক্ষেত্রে সচেতন হলে এটি কমতে পারে।

(ঙ) বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ফলেও এটি ঘটতে পারে।

(চ) অপ্রশস্ত রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অপ্রশস্ত সড়কে বিপরীত দিক থেকে আগত যানবাহনসমূহের মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে পারে। কাজেই যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তা যথেষ্ট চওড়া হওয়া দরকার।

(ছ) ট্রাফিক সাইন না মানার কারণে যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে পারে।

(জ) ট্রাফিক আইন না মানার কারণেও এটি ঘটতে পারে। সুতরাং উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সকল অবস্থাতেই মুখোমুখি সংঘর্ষ অনেকটা হ্রাস পেতে পারে। ঢাকা-টাঙ্গাইল রুট নিয়ে লিখছি। তাই এ রুটটের সমস্যা ও তার সমাধান এবং সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে সুপারিশ রেখে লেখা শেষ করতে চাই। মির্জাপুর রেলক্রসিংয়ের উপর অবিলম্বে ফ্লাইওভার নির্মাণ করার জন্য সদাশয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। কারণ কালের আবর্তন, জনগণ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ঢাকার সাথে টাঙ্গাইলসহ অন্যান্য অঞ্চল যেমন-জামালপুর, সরিষাবাড়ি, শেরপুর, তারাকান্দি, ময়মনসিংহ, মধুপুর, ভূঞাপুর, সমগ্র উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, ট্রাক ইত্যাদি যান্ত্রিক ও বিভিন্ন অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচলের জন্য স্থাপিত যোগাযোগ ব্যবস্থা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, চিকিৎসা, শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক অবস্থা ও শিল্পের উন্নয়নে নানা কাঁচামাল সহজে পরিবহনের জন্য রুটটি শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়; বরং দিনদিন এর গুরুত্ব বেড়েই চলেছে। সেই সাথে বাড়ছে চলাচলকারী যানবাহনের সংখ্যা এবং এটি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকাই স্বাভাবিক। পরিণতিতে চালকের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড, ভুল সিগন্যাল, যান্ত্রিক বিকলতা ইত্যাদি কারণে এ রেলক্রসিংয়ে দুর্ঘটনার সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। এতো আশঙ্কার কথা। বর্তমানে বাস্তবে যা ঘটছে তা হলো- রেলগাড়ি ক্রসিং অতিক্রম করার কিছু সময় পূর্বে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। তাই যানবাহন ও মালামাল পরিবহনের গাড়ির স্বাভাবিক চলাচল কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক গাড়ির দীর্ঘ লাইন। চালক অধৈর্য হয়ে ও ট্রাফিক নির্দেশনা অমান্য করে শৃঙ্খলা ভেঙ্গে ফেলেন কোনো কোনো সময়। পরিণতিতে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। সে সময় কোনো কোনো গাড়ি চালকের সিগনাল অমান্য করে নিষিদ্ধ পার্শ্ব দিয়ে ক্রসিং অতিক্রম করার প্রবণতা দেখা দেয়। আর নিষিদ্ধ পার্শ্ব দিয়ে গাড়ি চালনা করার কারণে এবং সিগন্যাল অমান্য করার কারণে ট্রেন-বাসের সংঘর্ষ হওয়াসহ অন্যান্য দুর্ঘটনা ঘটার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যা পরিণতিতে এক বা বহুজনের মৃত্যুর কারণ হয়। এসব বিষয় বিবেচনা করে অবিলম্বে এই রেলক্রসিংয়ের উপর ফ্লাইওভার নির্মাণ করা খুবই জরুরী। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিকারের জন্য স্থানে স্থানে ট্রমাসেন্টার করার উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ট্রমাসেন্টার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল তৈরি করা যায়। এতে দুর্ঘটনাস্থলে অতি দ্রুত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল পৌঁছে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং দুর্ঘটনার শিকার গুরুতর আহত ও মুমূর্ষ ব্যক্তিগণ দুর্ঘটনা স্থলেই দ্রুত চিকিৎসা পেতে পারেন। চিকিৎসকগণের সাথে প্রশিক্ষিত উদ্ধারকারী জনবল ও নিরাপত্তাকর্মীগণও থাকতে পারেন। সড়ক-মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী ও যুক্ত সকল অব্যবহৃত সড়কে যানবাহন একমুখী পদ্ধতিতে চলাচলের ব্যবস্থা করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই স্থানে বিভিন্ন দিক থেকে আসা যানবাহনের চাপ কমতে পারে। এতে ঐ স্থানে দুর্ঘটনার সংখ্যাও অনেক কমে যেতে পারে। সড়ক দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সাথে মানুষের বাঁচা-মরার বিষয় সম্পৃক্ত। কাজেই সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সকল মহলের সর্বোচ্চ আন্তরিক হওয়া অত্যাবশ্যক।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে যানবাহনের চালককে পুরস্কৃতকরণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাজীবীকে কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা, দক্ষতার জন্য পুরস্কৃত করা হলেও দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে যানবাহন/গাড়ী চালনার জন্য কোন চালককে পুরস্কৃত করা হয় না। কিন্তু দুর্ঘটনার কারণে চালককে শাস্তি দেয়া হয়। অর্থাৎ তার ভাল কাজের স্বীকৃতি নেই। এটি দুঃখজনক। মন্দ কাজের জন্য যেমন শাস্তি দেয়া হয় তেমনি ভাল কাজের জন্য পুরস্কারও দেয়া আবশ্যক। যানবাহন দুর্ঘটনা কবলিত হলে শুধু বহু জীবনই নষ্ট হয় না বিপুল আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় মালিকপক্ষ। যা প্রকারান্তে জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কাজেই জানমাল রক্ষার স্বার্থে দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে যানবাহন চালনার জন্য চালককে মালিকপক্ষ থেকে ও এবিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনাকারী অসরকারি সংস্থা কর্তৃক এবং জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার দেয়া যায়। এটি সকল চালককে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে উৎসাহী করতে পারে।

দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন উদ্ধার

সড়ক-মহাসড়কে যানবাহনে প্রায়ই যাতায়াত করি। অনেক সময় রাস্তায় বা পাশে সড়ক দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন দেখি। এগুলো উদ্ধার কাজও দেখি। উদ্ধার কাজ অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয় না। দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহনের কারণে আরও দুর্ঘটনা ঘটে। আবার ট্রাফিক জ্যামও হয়। দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন দ্রুত, সহজ ও নিরাপদে উদ্ধার করে যানবাহনের অবাধ যাতায়াত পুনরায় ব্যবস্থা করাসহ দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রোধ করার জন্য সড়ক মহাসড়ক অধিদফতর, গণপূর্ত অধিদফতর, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, অনেক অসরকারি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের অলস ক্রেন, বুলডোজার, লিফটার, স্কেলেটর ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। দুর্ঘটনা কবলিত যানযাহন, মালামাল দ্রুত উদ্ধারের জন্য এদেশে প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা খুবই কম। উল্লেখিত বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮

সড়ক মহাসড়ক যানজট ও দুর্ঘটনামুক্ত করার জন্য সুশৃঙ্খলভাবে যানবাহন চালানো বিকল্প নেই। আর সড়ক মহাসড়কে যানবাহন চালানোর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যানবাহন আইন মেনে চলার গুরুত্ব সর্বাধিক। সড়ক মহাসড়কে সুশৃঙ্খলভাবে যানবাহন চালানোর লক্ষ্যে ইতোপূর্বে প্রণয়নকৃত এদতসংক্রান্ত আইন আধুনিকায়ন ও সময়োপযোগী করার নিমিত্ত এ আইন প্রয়োজনীয় সংশোধন ও তাতে প্রয়োজনীয় সংযোজন করে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ প্রস্তুত করা হয়েছে। এ আইন যাতে যানবাহন চালক, যাত্রীসাধারণ ও পথচারীগণ মেনে চলে সে লক্ষ্যে এ আইন সকলকে অবহিত করাও আবশ্যক। এতদোদ্দেশ্যে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর উল্লেখযোগ্য ১৪টি বিধান নিচে উল্লেখ করা হলো-

১। সড়কে গাড়ি চালিয়ে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে হত্যা করলে ৩০২ ধারা অনুযায়ী মৃত্যু দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

২। সড়কে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালালে বা প্রতিযোগিতা করার ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে ৩ বছরের কারাদন্ড অথবা ৩ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আদালত অর্থ দণ্ডের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে।

৩। মোটরযান দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তি গুরুতর আহত বা প্রাণহানি হলে চালকের শাস্তি দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জেল ও সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা জরিমানা।

৪। ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া মোটরযান বা গণপরিবহন চালানোর দায়ে ৬ মাসের জেল বা ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

৫। নিবন্ধন ছাড়া মোটরযান চালালে ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে।

৬। ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার এবং প্রদর্শন করলে ৬ মাস থেকে ২ বছরের কারাদণ্ড অথবা ১ লাখ টাকা থেকে ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেয়া হয়েছে।

৭। ফিটনেসবিহীন ঝুঁকিপূর্ণ মোটরযান চালালে ৬ মাসের কারাদণ্ড অথবা ২৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড দেয়া হয়েছে।

৮। ট্রাফিক সংকেত মেনে না চললে ১ মাসের কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত করা হবে।

৯। সঠিক স্থানে মোটরযান পার্কিং না করলে বা নির্ধারিত স্থানে যাত্রী বা পণ্য উঠানামা না করলে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

১০। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা বললে ১ মাসের কারাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

১১। একজন চালক প্রতিবার আইন অমান্য করলে তার পয়েন্ট বিয়োগ হবে এবং এক পর্যায়ে লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে।

১২। গণপরিবহনে নির্ধারিত ভাড়ার চাইতে অতিরিক্ত ভাড়া, দাবি বা আদায় করলে ১ মাসের কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড দণ্ডিত করা হবে।

১৩। আইননুযায়ী ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হলে চালককে অষ্টম শ্রেণি পাশ এবং চালকের সহকারীকে পঞ্চম শ্রেণি পাশ হতে হবে। আগে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন প্রয়োজন ছিল না।
১৪। গাড়ি চালানোর জন্য বয়স অন্তত ১৮ বছর হতে হবে। এই বিধান আগেও ছিল।
১৫। এছাড়া সংরক্ষিত আসনে অন্য কোন যাত্রী বসলে ১ মাসের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :
১। গুগল

তারিখ :- ২১/১২/২০১৯ খ্রি.

অগ্নিকাণ্ডের কারণ প্রতিরোধ ও প্রতিকার

বসন্তকাল। কোকিলের সুমধুর কুহুতানে মুগ্ধ চারদিক। নবকিশলয়, ফুলে ফুলে ভরে যায় গাছগাছালি, বন-বনানী, প্রকৃতি নতুনভাবে সাজে এ সময়। আর প্রকৃতির অপরূপ সাজে সজ্জিত হওয়ার সাথে দিনে ও রাতের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমতে থাকে, বাড়তে থাকে শুষ্কতা। শুষ্ক আবহাওয়া ও বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রা অগ্নিকাণ্ডের অত্যন্ত সহায়ক, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। বসন্তকাল শেষ হয়, প্রচন্ড দাবদাহ নিয়ে আসে গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের খরতাপে প্রকৃতি রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। প্রচন্ড তাপে সকল দাহ্য-বস্তু আরও অধিক দাহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন হয়। এ সময়ে সামান্য একটু সুযোগ সৃষ্টি হলেই শুরু হয় আগুনের প্রলয়নৃত্য। সুতরাং বসন্তকাল শুধু প্রকৃতিকে অপরূপ সাজে সজ্জিতই করে না, বয়ে আনে গ্রীষ্মের খরতাপ, কালবৈশাখী ও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের অশনিসঙ্কেত।

কখনও কখনও সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আগুনের লেলিহান শিখায় ধ্বংস হয়ে যায় স্থায়ী অস্থায়ী সম্পদ। সেই সাথে বহু জীবনও বিলীন হয় মৃত্যুতে অথবা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ক্ষতচিহ্ন রেখে যায় মানুষ, পশু সকলের শরীরে। অগ্নিকাণ্ডের কারণে প্রতিবৎসরই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাজার, ধর্মীয় উপাসনালয় প্রভৃতি। উল্লেখ্য, দেশের সকল সম্পত্তিই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, জনগণ শুধু ভোগদখল করতে পারে মাত্র। অগ্নিকাণ্ডের কারণে বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়, বহু জনের শরীর আগুনের শিখায় ভয়াবহ ও মারাত্মকভাবে ঝলসে যাওয়ার কারণে চিকিৎসার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ অর্থের যোগান দিতে ব্যর্থ হওয়ায় অমানবিক, অবর্ণনীয় কষ্ট সইতে সইতে অবশেষে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে অগ্নিদগ্ধ হতভাগ্য ব্যক্তিগণ। অনাকাঙ্ক্ষিত যে কোনো ক্ষতিই জাতির অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে।

আর এটি অত্যন্ত নির্মম সত্য যে, অগ্নিকাণ্ডের করণে প্রতিবৎসরই জনপদ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আমাদের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, সামাজিক পরিবেশ, এতদসংক্রান্ত আইনের প্রয়োগহীনতা, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত শত্রুতা, বাড়িঘর ও বহুতল ভবন নির্মাণে অগ্নি-প্রতিরোধক কারিগরি বিষয়াদি বাস্তবায়ন না করা ইত্যাদি নানা কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা রোধ করা যায় না। যার কারণে এ দেশে অগ্নিকাণ্ডের কারণে অস্বাভাবিক মাত্রায় ক্ষয়-ক্ষতি হয়। আর শেষ পর্যন্ত এর মাশুল গুণতে হয় জাতিকেই। বাংলাদেশে গত ২০১২ খ্রিঃ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ৫ বৎসরে ৮৩,৬১৪ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে এবং এসব অগ্নিকাণ্ডে সর্বমোট ১০,৫২১,৬২২৬,১১৪ কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়। গত ২০১৭ খ্রিঃ বাংলাদেশে মোট ১৪,৮৩১টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এদেশে অগ্নিকাণ্ডে বৎসরে ২ শত ৩৩ জন মৃত্যুর শিকার হয়। আহত হয় ৫ হাজার মানুষ এবং বৎসরে ৪ হাজার ৮ শত ৩৪ কোটি

টাকা সম্পদ-সম্পত্তি/মালামল ভস্মিভূত হয়। গত ৬ বছরে দেশে মোট ৮৮ হাজার অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। গত ১০ বছরে সারা দেশে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ২১৫টি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে প্রাণ হারিয়াছে ২ হাজারের বেশি মানুষ। আহত হয়েছে প্রায় ১৩ হাজার মানুষ। ক্ষতির পরিমাণ সোয়া ৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি। ফায়ার সার্ভিসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ২০১৮খ্রি. এ সারা দেশে ১৯ হাজার ৬৪২টির ও বেশি অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে কমপক্ষে ১৩০ জন নিহত ও ৬৬৪ জন আহত হয় এসব অগ্নিকাণ্ডে সম্পদের ক্ষতি হয় ৪৩০ কোটি টাকার মত। গত ২০১৯ খ্রি. সারাদেশে ২৪ হাজার ৭৪টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।

এতে মারা গিয়েছে ১৮৫ জন আহত হয়েছে সহস্রাধিক। সম্পদহানি হয়েছে ৩৩০ কোটি ৪১ লাখ টাকা। গত ২০২১ সালে সারাদেশে ২২ হাজার ২২২ টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। যা ২০২০ সালের চেয়ে ১ হাজার ৪৯ টি বেশি। গত ১ বছরে অগ্নিকাণ্ডে দেশে ৩৩০ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এসব অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১১ হাজার ৯৯৯ জন আহত হয়েছে এবং ২ হাজার ৫৮০ জন নিহত হয়েছে। গত ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে দেশে ১ লক্ষ ৪ হাজার ৪৯৫ টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে আর্থিক ক্ষতির পরিমান ১ হাজার ৪৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৭২ টাকা। আহত হয়েছে ৩ হাজার ৪৮৩ জন। নিহত হয়েছেন ৭৩২ জন। বস্তিতে অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে ১৭৪টি এসব দুর্ঘটনায় ৭ কোটি ৩৩ লাখ ১১ হাজার ৮৯১ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেয়া হলো- গত ০৪/০৯/২০২০ তারিখে নারায়নগঞ্জের পশ্চিম তল্লারবাগে বায়েতুস সালাত জামে মসজিদে এসি বিস্ফারণ ও অগ্নিকাণ্ডে মসজিদে ৩৮ জন মুসুল্লী নামাজরত অবস্থায় আগুনে দগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়। গত ২৭/০৫/২০২০ তারিখে ঢাকাস্থ গুলশানে ইউনাইটেট হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে ৫ জন মারা যায় এবং অনেক মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গত ১১/০৩/২০২০ তারিখে ঢাকার মিরপুর-৬ এ মণিপুরী স্কুলের পাশের রূপনগর বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ৪ শত বস্তিঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ২ জন ফায়ার সার্ভিস কর্মী ও ১ একজন মহিলা আহত হয়। ২৭/০২/২০২০ তারিখে দিলু রোড মগবাজার ঢাকা অগ্নি দুর্ঘটনায় ৬ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়। এছাড়া ১ জন পুরুষ ১ জন মহিলা ও ১টি শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

গত ০৮/০২/২০২০ তারিখে ঢাকার বনানীস্থ টিএন্ডটি বস্তিতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে এতে ২শতাধিক বস্তিঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হিসাব অনুযায়ী ২০১৯ সালে গত ২৩ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে। গত ১৩ বছরে (২০০৭-২০১৯) বাংলাদেশে আগুনে পুড়েছে অন্তত ১২ হাজার মানুষ আর এর মধ্যে মারা গেছে ১ হাজার ৯১৬ জন। গত ১৩ বছরে সম্পদহানির পরিমাণ ৪ হাজার কোটি টাকা। প্রতি বছর গড়ে ১৯ হাজার আগুনের দুর্ঘটনা ঘটে। গত ১০ বছরে (২০০৯ থেকে ২০১৮) শিল্পে অগ্নিদুর্ঘটনার সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষতি হয় ২০১৫ সালে। ঐ বছর ১ হাজার ১৩টি আগুনের দুর্ঘটনায় আর্থিক ক্ষতি হয় ৬৪৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। শিল্পে অগ্নিদুর্ঘটনার প্রায় ২৫ শতাংশই তৈরি পোশাক খাতে। শপিংমল সেক্টরে ১০ শতাংশের মত ক্ষতি হয়। গত ১০ বছরে দেশের বস্তিগুলোয় ২ হাজার ২০০টির বেশি অগ্নিকাণ্ড হয়। এতে ক্ষতি হয়েছে ২ হাজার কোটি টাকার মত। ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ সালে ঢাকার বিভিন্ন বস্তিতে ২৯টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ধরণের স্থানে পরের বছর অগ্নিকাণ্ডের সংখ্য বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩ এ। ১২ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি এতে ক্ষতি হয় ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। ২০১৫ সালে রাজধানীর বস্তিগুলোয় ৪৭টি অগ্নিকাণ্ডে ৩ জন প্রাণ হারায়। আর ক্ষয়ক্ষতি হয় ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকার। পরের বছর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কিছুটা কমে ২৭ এ দাঁড়ায়।

এতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ১ জন নিহত হয়। ২০১৭ সালে রাজধানীর বস্তিগুলোয় ৩২টি অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারায় ১জন। পাশাপাশি এতে ক্ষতিহয় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। বিশেষজ্ঞদের মতে ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকা, গার্মেন্টসসহ শ্রমঘন শিল্প কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে। বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন তৈরির কারণে রাজধানী জুড়েই গিঞ্জি স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এসব স্থাপনা নিমার্ণে মালিকপক্ষ নিজেদের কোন জায়গা না ছাড়ায় গায়ে গায়ে লেগে থাকে ভবনগুলো। ফলে দুর্ঘটনায় উদ্ধারকার্য চালানো কিংবা ফায়ার সার্ভিসের সরঞ্জাম পৌছানো কঠিন হয়ে পড়ে। দেশে ভয়ানক আকারে বেড়ে গিয়েছে অগ্নি দুর্ঘটনা। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট, চুলার আগুন, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ এবং ফেলে দেওয়া জলন্ত সিগারেট থেকেই বেশির ভাগ অগ্নি কাণ্ডের সূত্রপাত হয়। মোট অগ্নিকাণ্ডের শতকরা ৬৫ থেকে ৭০ ভাগই বৈদ্যুতিক শটসার্কিট থেকে ঘটে। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শটসার্কিটই বর্তমানে অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারণ। অগ্নিকাণ্ডসমূহের একেক সময়ে একেক সূত্রে একেক রকম তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য সমূহের মধ্যে অনেক গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। এটি অনভিপ্রেত। একই বিষয়ে তথ্য সমূহ একই রকম হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও বাঞ্চনীয়। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে স্মরণীয় অগ্নিকাণ্ডের বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

গত ২৮/০৩/২০১৯খ্রি. তারিখে ঢাকার বনানীতে এফ.আর টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডে ২৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। গত ১৬/০৯/২০১৬ তারিখে গাজীপুরের টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে টাম্পাকো ফয়েলস এ এক মর্মান্তিক অগ্নি দুর্ঘটনায় ৩৪ জন পুড়ে মারা যায়। গত ২০/০২/২০১৯খ্রি. ঢাকা চকবাজারে চুরিহাট্টায় ওয়াহেদ ম্যানশনে গ্যাস সিলিন্ডার বিষ্ফোরণে ৭০ জনের প্রাণহানি ঘটে। গত ২৪/১১/২০১২ খ্রি. ঢাকার অদূরে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুরে তাজরিন ফ্যাশনে অগ্নি দুর্ঘটনায় ১১১ জন প্রাণ হারায়। এতে সরাসরি আগুনে দগ্ধ হয়ে ১০১ জন পোশাক শ্রমিক মারা যায়। গত ০৩/০৬/২০১০খ্রি. তারিখে পুরানো ঢাকার নিমতলীতে এ দেশে এ যাবৎ কালের সর্ববৃহত ও ভয়াবহতম অগ্নিকান্ড ঘটে। এ অগ্নিকাণ্ডে ১২৪ জন মানুষ পুড়ে মারা যায়।

অগ্নিকাণ্ডে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হল। দুবাই আকাশ চুম্বি টর্চ টাওয়ারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। গত ১৪/০৭/২০১৭খ্রি. তারিখে হাওয়াই এর অঙ্গরাজ্য হনলুলুতে ৩৬ তলা ভবনে আগুন লেগে ৩ জন মারা গিয়েছে। জর্জিয়ায় হোটেলে গত ২৪/১১/২০১৭ তারিখে আগুন লেগে ১১ জন মারা গিয়েছে। ভারতের মুম্বাইয়ে গত ১৮/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে একটি মিষ্টির দোকানে আগুন লেগে ১২ জন নিহত হয়েছে। এ মুম্বাইতেই গত ২৯/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে একটি রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ জন নিহত হয়েছে। গত ১৯/০৬/২০১৮ তারিখে ভারতের লক্ষ্ণৌতে হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে শিশুসহ ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৯/১২/২০১৭ খ্রি: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের একটি এপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ডে ১২ জন নিহত হয়েছে। গত ১৬/০৭/২০১৭ খি. তারিখে চীনে জিয়াং সু প্রদেশে একটি দোতলা বাড়িতে আগুন লেগে ২২ জন মারা গিয়েছে। গত ১৪/০৯/২০১৭ খি. তারিখে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এক মাদ্রাসায় অগ্নিকাণ্ডে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪/০৩/২০১৮ খি. তারিখে রাশিয়া সাইবেরিয়ার কেমোরেভয় শহরে উইন্টারচেরি শপিংমলে আগুন লেগে ৬৪ জন মারা গিয়েছে। গত ১৪/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে লণ্ডনের ল্যাকাস্টার ওয়েস্ট এর ২৪ তলা এপার্টমেন্ট ভবন গ্রেনফেল টাওয়ারে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৭৯ জনের প্রাণহানি হয়েছে।

ঙ) পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে, ততদিনই দুর্ঘটনা ঘটবে। তবে সকল দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার বাস্তব জ্ঞান অর্জন ও তার যথার্থ প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট আইনের বাস্তবায়ন ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমিয়ে দিতে পারে। অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়া অথবা এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য সকলের অবশ্যই সচেতন হওয়া এবং এ বিষয়ে উপযুক্ত সময়ে বাস্তবমুখী ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ করার জন্য নিচে অগ্নিকাণ্ডের কারণসহ কিছু সুপারিশ করা হলো। অগ্নিকাণ্ডের কারণ-

১। প্রাকৃতিক
২। কৃত্রিম
ক) অসচেতনতা,
খ) শত্রুতা

অগ্নিকাণ্ডের কারণ, প্রতিরোধ, প্রতিকারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১। প্রাকৃতিক কারণ:

অগ্নিকাণ্ডের প্রাকৃতিক কারণের জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না। যেমন- অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে, কখনও কখনও বজ্রপাতের কারণে, কখনও কখনও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে বন-জঙ্গলে দাবানল লাগা। দাবানল বনাঞ্চলের আশেপাশের জনপদে বিস্তৃত হতে পারে এবং জান মালের বিপুল ক্ষতি সাধন করতে পারে। গত কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে সুন্দরবনে দাবানল লেগে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গত কয়েক দশকের মধ্যে গ্রীস জুরে ছড়িয়ে পড়া সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলে অর্ধশত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ২০07 সালেও এ ধরনের ভয়াবহ দাবানলের সক্ষী হয়েছিল গ্রীস, সেবারের আগুন দক্ষিণাঞ্চলীয় পেলোপোনেস উপদ্বীপের কয়েক ডজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। গত সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে অস্টেলিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে সৃষ্ট দাবানল জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই। এ দাবানলে প্রায় ১৪.৫ মিলিয়ন একর বনভূমি পুড়ে গিয়েছে এবং প্রায় ৫০ লাখ পশু পাখি পুড়ে মারা গিয়েছে। ২ হাজার ঘড়বাড়ি ভস্মিভূত হয়েছে। এ দাবানলে ২৪ জন মানুষ মারা গিয়েছে এবং বহু লোক নিখোঁজ রয়েছে। নভেম্বর ২০১৮ এ উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানল ক্যাম্পফায়ারের তান্ডবে ১ লাখ ৫৪ হাজার একর বনভূমি এবং ১৪ হাজার ঘরবাড়ি পুড়ে ধ্বংস হয়েছে। এ দাবানলে ৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে বড় ও ভয়ঙ্করতম দাবানল। এ লেখা প্রস্তুত করা পর্যন্ত পৃথিবীর ফুসফুস ব্রাজিলের আমাজন জঙ্গলের বড় অংশ দাবানলে পুড়ে গিয়েছে। দাবানলে জীববৈচিত্র এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। বাংলাদেশে প্রতিবৎসর গড়ে বজ্রপাতে ২৫০ জন মানুষ মারা যায়। বজ্রপাত প্রতিরোধের কারিগরি বিষয়াদি অনুসরণ এবং বসতবাড়িতে গাছ লাগানো বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে সহায়ক হয়। বজ্রপাতে গত ৭ বছরে বাংলাদেশে প্রাণহানি ঘটেছে ১ হাজার ৭৪৪ জনের। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত প্রবণ এলাকা। বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাংলাদেশেই এখন সবচেয়ে বেশি। বজ্রপাতে প্রতি বছর সারা বিশ্বে যত মানুষ মারা যায় তারা প্রতি চার জনের একজন বাংলাদেশের। দেশে প্রতি বছর ২ থেকে ৩শজন প্রাণ হারাচ্ছে বজ্রপাতে। কাজেই বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগসমূহের একটি দুর্যোগ হিসাবে গণ্য করা যায়। বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে জরুরী ভাবে পালনীয় বিষয়সমূহ নিচে উল্লেখ করা হল :

১। ঝড় ও বজ্রপাতের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করা নিষেধ।
২। প্রতিটি বিল্ডিংয়ে বজ্র নিরোধক স্থাপন নিশ্চিত করা আবশ্যক।
৩। খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকের ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে থাকা আবশ্যক।
৪। কোন বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরপত্তা ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবারই আলাদা কক্ষে অবস্থান করা আবশ্যক।
৫। কোন খোলা জায়গায় বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া নিরাপদ নয়।
৬। ছেড়া বিদ্যুতের তার এবং তারের নিচ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।
৭। ক্ষয়ক্ষতি কমনোর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক।
৮। বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকের মত করেই চিকিৎসা দেওয়া যায়।
৯। বৎসরে অন্যান্য সময়ের তুলনায় এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত বজ্রপাত বেশি হয় । এ সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেলে ঘরে অবস্থান করা আবশ্যক।
১০। যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন।

১১। বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকা নিরাপদ নয় এবং ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দূরে থাকা আবশ্যক।

১২। ঘনকালো মেঘ দেখা গেলে অতি জরুরী প্রয়োজনে রাবারের জুতা পড়ে বাইরে যাওয়া যায়।

১৩। উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি ও মোবাইল টাওয়ার থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

১৪। বজ্রপাতের সময় জরুরী প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করা নিরাপদ।

১৫। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, মাঠ বা উঁচু স্থানে অবস্থান করা নিরাপদ নয়।

১৬। কালো মেঘ দেখা গেলে নদী, পুকুর, ডোবা, জলাশয় থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

১৭। বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখা এবং নিজেরও বিরত থাকা আবশ্যক।

১৮। বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে থাকলে পায়ের আঙ্গুলের উপরভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকা নিরাপদ।

১৯। বজ্রপাতের সময় গাড়ির মধ্যে অবস্থান করিলে গাড়ির ধাতব অংশ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

২০। বজ্রপাতের সময় মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করা জরুরী।

২১। বজ্রপাতের সময় ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা এবং যাত্রীগণকে ফেরি থেকে দূরে রাখা আবশ্যক।

প্রতি বছর সারা বিশ্বের বজ্রপাতের কারণে গড়ে ২৪ হাজার লোক মৃত্যু বরণ করে এবং আহত ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উন্নত বিশ্বে (যুক্তরাষ্ট, জাপান, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, বজ্রপাত ছিল একটি ভয়াবহ দূর্যোগ, কিন্তু বিংশ শতাব্দী থেকে বজ্রপাতে প্রাণহানির সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে মূলত নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং কৃষিজ জনসংখ্যার হ্রাসের কারণে। বিশ্বে মোট বজ্রপাতের ৭৮ শতাংশ সংঘটিত হয় ক্রান্তীয় অঞ্চলে। দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলাদেশ যেহেতু, ক্রান্তীয় অঞ্চলের খুব কাছাকাছি অবস্থিত, প্রাক-মৌসুম (মার্চ -জুন) থেকে শুরু করে মৌসুমে (জুলাই-অক্টোবর) সময় পর্যন্ত বজ্রপাতসহ বজ্রঝড় একটি নিয়মিত বিষয়। যদিও প্রতিবছর বজ্র ঝড়, কালবৈশাখী, টর্নেডোতে প্রাণহানিসহ ফসলের কিছু না কিছু ক্ষতি হয়েই থাকে, বজ্রপাতে নিহত বা আহত ব্যক্তিদের কোন পরিসংখ্যান বা ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এখন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয় নাই।

বজ্রপাতের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার পরিকল্পনা নেওয়া আবশ্যক। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আগে তাল গাছ ও খেজুর গাছ বজ্রপাত থেকে মানুষকে রক্ষা করত। এখন গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং শহরাঞ্চলে গাছের ডালপালা ছেটেফেলায় বজ্রপাতে ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে গিয়েছে। তাই মোবাইল ফোনের টাওয়ার ছাড়াও যে সব টাওয়ার বেশ উঁচু, সেগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আর্থিং এর মাধ্যমে বজ্রপাত থেকে মানুষ রক্ষা করা যেতে পারে।

২। কৃত্রিম কারণঃ

ক) অসচেতনা, অজ্ঞতা এবং কারিগরি জ্ঞানের অভাবে ও অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগহীনতা এবং দুর্ঘটনার সময় দিশাহারা হয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে অক্ষমতার কারণে ছোট অগ্নিকাণ্ডও বড় আকার ধারণ করে। মানুষের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপও কোনো কোনো সময় দাবানলের কারণ হয়। যা থেকে হাজার কোটি টাকার সম্পদ/ সম্পত্তি ধ্বংস হয়। বজ্রপাতের কারণে অবশ্য শহর বা গ্রামাঞ্চল সকল স্থানেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে।

খ) শত্রুতা সাধন করার জন্যও অনেক সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটান হয়। এটি নির্মমতম ও বর্বরতম কাজ। এরচেয়ে হিংস্র ও অমানবিক কাজ দ্বিতীয়টি নেই। কারণ আগুন শত্রু-মিত্র, জীব-জড়, আবালবৃদ্ধবণিতা কারও মাঝেই পার্থক্য নির্ধারণ করে না। আগুনের লেলিহান শিখা তার রাক্ষুসে ক্ষুধায় শত্রুর সীমা ছাড়িয়ে আশেপাশের নিরাপরাধ বহুজনের জীবন ও সহায়-সম্পত্তি ধ্বংস করে এক বা বহু পরিবার-পরিজনকে রাস্তায় বসিয়ে দেয়। সমাজের সকলের প্রতি সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ববোধ অনুসরণ, আইনের যথার্থ প্রয়োগ এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তকে সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেবার বিধি-বিধান প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন এটি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে। উদ্দেশ্যমূলক ও শত্রুতামূলক ভাবে ২০১২ সালে ১৭০টি, ২০১৩ সালে ২৩১টি, ২০১৪ সালে ২০৩টি, ২০১৫ সালে ২৩৮টি এবং সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ১০৮টি অগ্নিকাণ্ড ঘটান হয়।

গ) **ধূমপানঃ** মানুষের নিজের ও পরের ক্ষতিকর কাজে আগুন ব্যবহারের কারণসমূহের মধ্যে ধূমপানের জন্য আগুনের ব্যবহার অন্যতম। আর ধূমপানের আগুন থেকে অনেক সময় বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়।, সকল ধূমপায়ীর জন্য সর্বসময় স্মরণীয়, ধূমপানের জ্বলন্ত কাঠি, সিগারেটের জ্বলন্ত শেষাংশ কখনই দাহ্যপদার্থ যেমন-শুকনো পাতা, কাগজ, দাহ্য তৈল, বিশেষত পেট্রোল বা ডিজেল সংরক্ষণের স্থান, রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সংরক্ষণের স্থানে ও এর আশেপাশের এলাকায় ফেলা সমীচীন নয়। শুকনো জ্বালানী, জ্বালানী তৈল, রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সংরক্ষণের স্থান সামান্য একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংস্পর্শের কারণে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটতে পারে। সুতরাং এ সকল স্থানে আগুন জ্বালানো একেবারেই অনুচিত। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এ সকল স্থান নিরাপত্তার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পারেন এবং কেউই যাতে এ সকল স্থানে আগুন না জ্বালান, সে বিষয়ে সকলেরই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার নিয়ম কঠোরভাবে পালন করতে সকলকেই বাধ্য করা যায়। স্মরণীয়, যেখানে-সেখানে এমন কি নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও আগুন ধরানোর অন্যতম কারণ হলো সিগারেট ধরানোর জন্য আগুন জ্বালানো। যা কখনও কখনও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে

সব থেকে নিরাপদ হল ধূমপান না করা বা ধূমপায়ীগণকে এ সকল স্থানে প্রবেশ করতে না দেয়া। সিগারেট ধরানোর পর জ্বলন্ত কাঠি ও সিগারেট খাওয়ার পর শেষাংশ নিশ্চিতভাবে নিভিয়ে ফেলার পর স্থান ত্যাগ করাও অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ধূমপায়ীগণের স্মরণ রাখা দরকার যে, এমনিতেই তারা ধূমপান করে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছেন, উপরন্তু তাদের অসাবধানতা এবং যেখানে-সেখানে ফেলে দেয়া জ্বলন্ত সিগারেট ও ম্যাচের কাঠি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে। যার করণে মানুষের অমূল্য জীবন নাশ হওয়াসহ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় মূল্যবান সম্পত্তির ধ্বংস হতে পারে। সুতরাং ধূমপায়ীগণ সজাগ-সচেতন হোন, আপনার অসচেতনতার কারণে সৃষ্ট ক্ষতি এড়ানোর জন্য ধূমপান বর্জন করাই সর্বোত্তম পদক্ষেপ। আরও একটি অন্যতম কারণ হলো জ্বলন্ত কুপি, হ্যারিকেন বা এ জাতীয় আলোর আশেপাশে দাহ্য-বস্তুর অবস্থান। জ্বলন্ত কুপি, হ্যারিকেন বা এ জাতীয় আলোকের আশেপাশে দাহ্য বস্তু থাকলে সেটি তৈল সিক্ত হয়ে সহজে অগ্নিকান্ড ঘটাতে পারে। এছাড়াও যে কোনো আগুনের পার্শ্বে অবস্থিত দাহ্যবস্তুতে সহজে আগুন লাগতে পারে। যাতে কুপি বা হ্যারিকেন লিক করে জ্বালানী তৈল ছড়িয়ে অথবা উত্তপ্ত হওয়ার কারণে আগুন লাগার কারণ সৃষ্টি না হতে পারে, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। আবার ধুমপানের কারণে শুধুমাত্র অগ্নিকাণ্ডই ঘটে না সারা বিশ্বে প্রতি বছর যত মানুষ মারা যায় তার শতকরা ১০ জন ধুমপানজনিত কারণে মারা যায়। সিগারেটের টুকরা থেকে গত ২০১২ সালে ২৫৩৬টি, ২০১৩ সালে ২৬৬০টি, ২০১৪ সালে ২৮১৯টি ২০১৫ সালে ২৫৩২টি সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ১৭৮৫টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। উল্লেখ্য, এদেশে যত অগ্নিকাণ্ড ঘটে তার শতকরা ১৫টি অগ্নিকাণ্ড সিগারেটের আগুন থেকে ঘটে ।

মোমবাতির আগুন

কোনো অবস্থাতেই কোনো দাহ্যবস্তুর উপর জলন্ত মোমবাতি রাখা সমীচীন নয়। এমন হতে পারে যে, প্রয়োজন শেষ হলে মোমবাতি নিভানোর কথা স্মরণ থাকে না এবং মোমবাতি একসময় শেষ হয়ে নিচের দাহ্যবস্তুতে আগুন ধরে যায় ও অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। কুপি, হ্যারিকেন, মোমবাতি বা এ জাতীয় আলো খুব সাবধানে ব্যবহার ও বহন করা উচিত। নইলে এ থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।

গ্রাম এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম কারণ হলো-

১) কেউ কেউ রান্না করার সময় বা রাতের বেলায় কুপি বা হ্যারিকেন ধরানোর জন্য পার্শ্ববর্তী বাড়ি থেকে আগুন ধার করে নিয়ে আসেন। অনেক সময় প্রবল বাতাসের হাত থেকে আগুন রক্ষা করার জন্য অসচেতন মহিলাগণ পরনের শাড়ির আঁচল বা অন্য কাপড়ের আড়ালে আগুন সংরক্ষণ করেন, যার কারণে শরীরে আগুন ধরে যায় এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হন, এমনকি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবার কখনও কখনও অসাবধানে আগুন বহন করা ছোটখাট অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটায় এবং সঠিক ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণে সেই আগুন বড় আকার ধারণ করে এবং জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় একটির পর একটি বসতবাড়ি, অবশেষে সমগ্র গ্রাম। খোলা বাতি ব্যবহারের কারণে গত ২০১২ সালে ৭৩০টি, ২০১৩ সালে ৫৯৬টি, ২০১৪ সালে ৫৪০টি, ২০১৫ সালে ১০৮৩টি এবং সেপ্টেম্বর ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৩৬০টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।

২) কৃষকগণ হুক্কা ধরানোর জন্য অসাবধানে আগুন বহন করেন এবং হুক্কার আগুন যেখানে-সেখানে চরম অসাবধানে ফেলে দেন, যা পরবর্তীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের রূপ নেয়। এটি বন্ধ করা আবশ্যক । হুক্কা ধরানোর আগুন যাতে কেউ অসাবধানে বহন না করেন এবং এর আগুন যাতে যত্রতত্র ফেলে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত না ঘটান, সে বিষয়ে প্রত্যেক কৃষক ও পরিবারের সকলকে সাবধানতা অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া জরুরী। উল্লেখ্য, হুক্কা খাওয়া এক ধরনের ধূমপান এবং এর কারণে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ডকে ধূমপানজনিত অগ্নিকাণ্ড বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ধূমপানে সকলকে নিরুৎসাহী করা এবং জনগণের এতে আন্তরিক অংশগ্রহণ অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

৩। গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় নানা কারণে বিশেষত শীতের সময় ঘর উষ্ণ রাখার জন্য ঘরের মধ্যে একটি মাটি বা অন্য কিছুর দ্বারা নির্মিত পাতিল বা পাত্রে জ্বলন্ত আগুন রাখা হয়। অনেক সময় এই পাত্র থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। বিশেষত রাতের বেলায় এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড মানুষের দৃষ্টিতে পড়ার আগেই বড় আকার ধারণ করে এবং ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় ও জীবনহানি ঘটায়। গ্রাম-শহর সকল অঞ্চলেই শীতের সময় অনেকেই শীত নিবারণের জন্য অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসেন। এ সময় আগুনের পাশে বসলেও শরীরে অনেক কাপড় পরে বসেন। ফলে এদের শরীরে একবার আগুন ধরলে সে আগুন সহজে নেভানো যায় না। এদের অনেকেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয় অথবা মারা যায়। আবার অনেক নারী-পুরুষ অসাবধানে আগুনে শীত নিবারণ করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন। আগুনের পাশে শীত নিবারণের জন্য এমন পোশাক পরে যাওয়া উচিত নয়, যাতে আগুন ধরলে সহজে নিভানো যায় না। আবার এমন কাপড়ও পরিধান করে আগুনের কাছে যাওয়া উচিত নয়, যাতে সহজে আগুন ধরে। আর পরিধানের কাপড়ে আগুন ধরলে দৌড়াদৌড়ি না করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে এবং অদাহ্য অন্যকিছু দিয়ে ঢেকে বাতাসের সংস্পর্শ রোধ করে আগুন নেভানো শ্রেয়তর।

৪) গ্রামাঞ্চলে রান্না করার পর চুলা পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করার জন্য আগুন না নিভিয়েই অনেক সময় চুলা পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট স্থানে ছাই ফেলে দেয়া হয়। অধিকাংশ সময়ই এই সব ছাইয়ের মধ্যে আগুন থেকে যায়। আর সেই আগুন বাতাসে ছড়িয়ে আশেপাশের দাহ্যবস্তুতে ধরে যায়। সূত্রপাত হয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের। সে আগুনে অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির পর বাড়ি এমনকি সমগ্র গ্রাম জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কখনও কখনও এ সকল জ্বলন্ত বাড়ি থেকে মানুষ-পশু বের হয়ে আসার সুযোগ পায় না। জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় এবং অনেকেই পরিবারের অন্য সবার সামনেই অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। আবার

কখনও কখনও গৃহিণী রান্নার পর চুলার আগুন না নিভিয়েই স্থান ত্যাগ করেন। আর এই জ্বলন্ত চুলা থেকেও অনেক সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। রান্না করার সময় অসাবধানে জ্বালানী ও আগুন ব্যবহার করার কারণেও অনেক সময় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। এটি গ্রাম বা শহর যে কোনো অঞ্চলেই হতে পারে।

(৫) কৃষিতে উৎপন্ন শস্য, খাদ্যবস্তুতে পরিণত করতে উত্তাপ দেয়ার জন্য ব্যবহৃত চুলায় সাবধানে জ্বালানী ব্যবহার, আগুন সীমাবদ্ধ রাখা ও দ্রুত নির্বাপণের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। উত্তপ্ত শস্য রাখার নির্ধারিত স্থান অত্যন্ত সুরক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ব্যবস্থা কৃষকের বাড়ি, শিল্প প্রতিষ্ঠানে (বয়লার কারখানায়) সমান গুরুত্বের সাথে রাখা আবশ্যক। আবার যাতে এতে উৎপন্ন ছাই, কয়লা, বর্জ, ধোঁয়া পরিবেশের ক্ষতি না করে এবং এগুলো থেকে যাতে অগ্নিকাণ্ড না ঘটে; সে দিকে সাবধানতা অবলম্বন করাও বিশেষ প্রয়োজন। উত্তপ্ত ছাই/জ্বালানির কারণে ২০১২ সালে ৮৩৮টি, ২০১৩ সালে ৬৯৬টি, ২০১৪ সালে ৭৫২টি, ২০১৫ সালে ৬০৬টি এবং ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫৬৫টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।

৬। বাংলাদেশ দরিদ্রতর একটি রাষ্ট্র। এদেশের অনেক গ্রামই আজ অবধি স্যানিটেশনের আওতায় আনা সম্ভব হয় নাই। এ সকল গ্রামের বাড়িতে কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে। কাঁচা পায়খানা থেকে দুর্গন্ধ যাতে না ছড়ায় বা ময়লা ঢেকে রাখার জন্য ময়লার উপর ছাই ফেলে। কখনও কখনও সেই ছাইয়ে আগুন থাকে এবং পায়খানার বাঁশ অথবা পাটশোলার বেড়ায় লেগে যায়, যা থেকেও অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। আমি এ ধরনের অগ্নিকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী। গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেক পরিবারকে স্যানিটেশনের আওতায় আনা জরুরী, এতে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়াসহ আগুন লাগার একটি সম্ভবনা দূর হয়।

৭। জলন্ত মশার কয়েল সতর্কভাবে সংরক্ষণ না করার কারণেও অনেক সময় আগুন ধরে যায়। জীবন বিপন্ন হওয়াসহ মালামালের প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়। এটিও গ্রাম বা শহর যে কোনো অঞ্চলেই হতে পারে।

৮। শিশুরা আগুন নিয়ে খেলার সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে এবং নিজে ও পারিপার্শ্বিকতা অগ্নিদগ্ধ হতে পারে। ছোটদের আগুন নিয়ে খেলা করার সময় ২০১২ সালে ৪৩১টি, ২০১৩ সালে ৪৮৯টি, ২০১৪ সালে ৫০৫টি, ২০১৫ সালে ৫২৬টি, সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৩৭৮টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। কাজেই শিশুরা এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠরা যেন আগুন নিয়ে খেলা না করেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ক) রান্না শেষ হওয়ার পর চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলার বিষয়ে প্রত্যেক গৃহিণীকে সচেতন করা অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

খ) শীত নিবারণের মাটির পাতিল বা আইল্যা ছাই বা অগ্নিরোধক বস্তু দ্বারা ঢেকে ঘরের মধ্যে এমনভাবে রাখা দরকার, যাতে আগুনের ফুলকি বা কয়লার টুকরা না ছড়াতে পারে। এর আশেপাশে কোনো দাহ্যবস্তু না রাখাই উত্তম।

গ) আগুন স্থানান্তরের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে কোনো অবস্থাতেই আগুন বহনকারীর শরীরে বা আশেপাশের কোনো বস্তুতে না লাগতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন স্থানান্তর না করা এবং প্রয়োজনে দিয়াশলাই বা এর কাঠি ধার করে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা।

ঘ) চুলা পরিষ্কার করার সময় জ্বলন্ত ছাই বা কয়লা ফেলা হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অনেক সময় শিশুরা খেলার ছলে এইসব অগ্নিসহ ছাইয়ের সংস্পর্শে আসে এবং অগ্নিদগ্ধ হয়। এমনকি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাসা বাড়ি ও শিল্পের আগুনের ছাই ফেলার আগে ও পরে নিশ্চিত হওয়া দরকার যে, ছাইয়ের মধ্যকার আগুন নিভে গিয়েছে।

ঙ) গ্রামের মানুষকে অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে সচেতন করা এবং আগুন লাগার সাথে সাথে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান বা প্রশিক্ষণ দেয়া। ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে ন্যূনতম প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে ফায়ার সার্ভিস অফিস বা ফায়ার সার্ভিস ক্যাম্প স্থাপন করে মানুষকে অগ্নিকাণ্ডের কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে অগ্নিকাণ্ডের সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধসহ এতে জানমালের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে আনা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনে ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের জনবল বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এন.জি.ও কর্মীদের অথবা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষত বয়স্কাউট ও ক্যাডেটগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বৎসরে একটি নির্দিষ্ট সময় গ্রামে অবস্থান করে গ্রামের মানুষজনকে অগ্নিকাণ্ডের কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা যায় ইউনিয়ন পরিষদ এ বিষয়ে সহযোগিতা করলে এ বিষয়টি অধিকতর সফলভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে। এছাড়াও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রশিক্ষণে গ্রামের মানুষের অংশ গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। স্মরণীয়, যে কোন দুর্ঘটনায়ই সাধারণ কিছু নিয়ম-কানুন অনুসরণ করেই দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণসহ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক হ্রাস করা সম্ভব হতে পারে। অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য।

শহর ও শিল্পাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও প্রতিরোধ: শহর অঞ্চলের আবাসিক এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম কারণ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। অসচেতনতা

ক) ধূমপান থেকে অগ্নিকাণ্ড,

খ) গ্যাসের চুলার আগুন,

গ) বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট/ বৈদ্যুতিক লাইনে যান্ত্রিক সমস্যা এবং

ঘ) যান্ত্রিক কারণ

ক) অসচেতনতা ও ধূমপান থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

খ) গ্যাসের চুলার আগুন: বাংলাদেশে গ্যাস একটি সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ, তবে অফুরন্ত নয়। সুতরাং গ্যাসের অপচয় বন্ধ করে সবারই এর সদ্ব্যবহার করা উচিত। নিচের কারণে বসতবাড়িতে গ্যাসের অপচয় ও গ্যাসের চুলা থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হল। ২০১৯ সালে দেশে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার গ্যাস ও সাধারণ গ্যাস পাইপ লাইন থেকে ৮ শত ১৮টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে ৬৯ জন আহত ও ২৫ জন নিহত হয়েছে।

১) রান্না শেষ করার পর গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখায় যদিও খুব কম আগুন থাকে চুলায়, তবুও এটি গ্যাসের অপচয়ের অন্যতম কারণ। একটি বাড়িতে একটি চুলা জ্বালিয়ে রাখলে আর কতই গ্যাসের অপচয় হয়- এ রকম একটি ধারণা পোষণ করি আমরা সবাই। কিন্তু এটি ভাবার বিষয় যে, শুধু একটি বাড়ির কথা চিন্তা না করে, একটি বাড়ির মত হাজার বাড়িতে হাজার চুলা জ্বালিয়ে রাখার পরিণতিতে হাজার ঘনফুট গ্যাসের অপচয় হয়, যা দেশকে গ্যাস সম্পদহীন করে দেবার পর্যায়ে ঠেলে দিতে পারে। দেশে এ পর্যন্ত ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এগুলাতে মজুতের পরিমাণ ২৭ দশমিক ১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। প্রায় ১২ শতাংশ মানুষ বাসাবাড়িতে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ উপাদনে, শিল্পে ও পরিবহণ খাতেও প্রচুর গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বর্তমান হারে ব্যবহৃত হতে থাকলে অবশিষ্ট মজুত দিয়ে আর বছর ১৫ চলতে পারে। ব্যবহার বেড়ে গেলে মজুত আরও আগেই শেষ হতে পারে। চাহিদা বাড়তে থাকায় এখন দিনে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি থাকে। গ্যাসের অপচয়, অপব্যবহারে গ্যাস নিঃশেষ হওয়ার গতি এবং ঘাটতির হার আরও দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। এক সময় মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ শূণ্যের কোঠায় চলে যেতে পারে এবং জনগণের এ সংক্রান্ত সকল সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাজেই গ্যাস সম্পদের শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ও মিতব্যবহার আবশ্যক। আবার গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখার কারণে রান্নাঘরের তাপমাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে, যার কারণে এ ঘরে রক্ষিত যে কোনো দাহ্যবস্তুতে সহজে আগুন ধরার সম্ভবনা সৃষ্টি হয়। আবার জ্বলন্ত চুলা থেকেও অনেক সময় আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। ঘটে যেতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। অনেকে গ্যাসের চুলার নিচে/পাশে দিয়াশলাই রাখেন, এটি অনুচিত। কারণ দিয়াশলাইয়ের বারুদে চুলার তাপে যে কোনো সময় আগুন ধরে যেতে পারে এবং সেটি থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।

২। (ক) কাজ শেষ হওয়ার পর গ্যাসের চুলার নব উত্তমরূপে বন্ধ না করলে চুলা থেকে গ্যাস বেরুতেই থাকে। আর যদি রান্নাঘরের জানালা খোলা না থাকে বা উপযুক্ত ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে রান্নাঘরে প্রচুর গ্যাস জমে যায় এবং যে কোনো সময় একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কারণে ভয়াবহ বিস্ফোরণসহ অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। স্মরণযোগ্য, চুলা থেকে গ্যাস লিক করার কারণে রান্নাঘরের ছাদের নিচে ও কোণাসমূহে সবসময় গ্যাসের একটি স্তর থাকার সম্ভাবনা থাকে এবং এসব স্থান সামান্য একটু আগুনের সংস্পর্শে এলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে। সুতরাং রান্না শেষ হওয়ার পর বা আগুনের কাজ শেষ হওয়ার পর উত্তমরূপে চুলা বন্ধ করা অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের অন্যতম শর্ত। চুলার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেও চুলা থেকে গ্যাস লিক করতে পারে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে যাতে চুলা থেকে গ্যাস লিক করতে না পারে, সেজন্য টেকনিশিয়ান এনে মাঝে মাঝে চুলা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমাদের একটু সচেতনতা অনেক বড় বড় দুর্ঘটনাই আমরা এড়িয়ে যেতে পারি এবং ক্ষয়ক্ষতি থেকে রেহাই পেতে পারি। উল্লেখ্য যে, চুলা থেকে খুব সামান্য হলেও গ্যাস লিক করেই। অবশ্য চুলা ধরানোর ভুল পদ্ধতিও এজন্য কিছুটা দায়ী। সুতরাং রান্না ঘরের নির্মাণ কৌশল এমন হওয়া উচিত, যাতে সামান্যতম গ্যাস লিক করলেও সেই গ্যাস কোনো অবস্থাতেই যেন রান্না ঘরের ভিতর জমতে না পারে। শুধু গ্যাস লিক করার জন্যই নয়, রান্নার সময় উৎপাদিত ধোঁয়া যাতে সহজে বের হয়ে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। ঘরবাড়ির ডিজাইন প্লানিং-এর সময় প্রকৌশলীগণের এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এটি একদিকে যেমন অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সহায়ক, অন্যদিকে রান্নাঘরসহ সমগ্র বাড়ির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষিত থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পুরণ করে। উল্লেখিত বিষয়সমূহ ডিজাইন প্লানিং এ অন্তর্ভূক্ত না থাকলে সে ডিজাইন প্লান অনুমোদিত না হওয়া আবশ্যক।

(খ) রান্না করার চুলার আশেপাশে দাহ্যবস্তু থাকলে তাতে আগুন ধরতে পারে। কাজেই সকল ধরনের জ্বালানী ও দাহ্যবস্তু চুলা থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা আবশ্যক। এটি শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলেই সমানভাবে বিবেচ্য। চুলা থেকে ২০১২ সালে ৪২০৭টি, ২০১৩ সালে ৩৭৪৪টি এবং ২০১৪ সালে ৪০০০টি ২০১৫ সালে ৩৩৫৬টি এবং সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ২৫৫৩টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।

(গ) গ্যাসের সরবরাহ লাইন ত্রুটিপূর্ণ হলে, জরাজীর্ণ হলে ও মেরামতযোগ্য হলে অবিলম্বে তা মেরামত করা প্রয়োজন। অন্যথায় গ্যাস সরবরাহ লাইনে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট: বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে শিল্পাঞ্চল বা শহর এলাকার বিভিন্ন বহুতল বিশিষ্ট ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে চারিদিকে। একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বর্তমানে দেশের অনেক গ্রামেও বিদ্যুত পৌঁছেছে এবং যেখানে বিদ্যুতের সরবরাহ আছে সেখানেই শর্ট সার্কিট হতে পারে বা হয়। অর্থাৎ শর্ট সার্কিট থেকে গ্রামাঞ্চলেও অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। গ্রাস করতে পারে সমগ্র ভবন অথবা আশেপাশের সকল বসতবাড়ি। সুতরাং বৈদ্যুতিক সংযোগ নেবার সময় ব্যবহারযোগ্য তার ও সরঞ্জামাদি উন্নত ও সেগুলো সঠিকভাবে স্থাপন করা ও প্রতিটি জয়েন্ট দক্ষতার সাথে দেয়া আবশ্যক, যা দীর্ঘমেয়াদী নিরাপদতর হয় ও শর্টসার্কিট হওয়ার আশঙ্কা থাকে একেবারে নিম্নপর্যায়ে।

শর্টসার্কিট-এর কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-
১. বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় মেইনটেন্যান্সের অভাবে

২. আনাড়ি বা অদক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা কাজ সম্পন্ন করলে,
৩. অন্য কোনো কারণে ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে, (প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণ)
৪. ভিজা বা স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা ও ইমারতের উপযুক্ত মেরামত না করা।
৫. শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, অবস্থান, দাহ্যবস্তু সংরক্ষণ, পরিবহন, বর্জ্য ফেলা সক্রান্ত অসচেতনতা।
৬। বেশী ভোল্ট বা চাপের বৈদ্যুতিক লাইনে কম ভোল্টের বা চাপের বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করলে।
৭. বৈদ্যুতিক জয়েন্ট বক্স ও কন্ট্রোল বোর্ড ময়লায় বা মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ হলে
৮। বৈদ্যুতিক জয়েন্ট বক্স ও কন্ট্রোল বোর্ড ময়লায় বা মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ হলে শর্ট সার্কিট হওয়ার সমূহ কারণ সৃষ্টি হয়। কেননা ময়লা বা মাকড়সার জাল বিদ্যুৎ সুপরিবাহী না হলেও অপরিবাহী নয়। এদের মাধ্যমে বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যেতে পারে। আর এভাবে নেগেটিভ ও পজেটিভ লাইনের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়ে শর্টসার্কিট হতে পারে। বৈদ্যুতিক বক্সে ময়লা ও মাকড়সার জাল সৃষ্টি হওয়ার কারণে একদিকে যেমন শর্টসার্কিট হতে পারে, অন্যদিকে যে কোনো মানুষও বৈদ্যুতিক শকড্ হতে পারে। কেননা ময়লা ও মাকড়সার জালের মাধ্যমে বিদ্যুতের প্রবাহ ধাতব পদার্থের তৈরী বক্সে সঞ্চালিত হতে পারে এবং অসতর্কভাবে এই বক্স স্পর্শ করলে বিদ্যুতের শকড্ অবশ্যম্ভাবী। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় ময়লা আবর্জনা থাকার কারণে সমগ্র ব্যবস্থার ব্যবহার-কাল অনেক কমে যায়। বহু ভবনের বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রণবাক্স সিঁড়ি কোঠার নিচে অবস্থিত এবং এই বক্স সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। ফলে সকল মানুষেরই এর সংস্পর্শে আসতে পারে। বিশেষত বাচ্চাদের জন্য এটি একটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ । সুতরাং বিদ্যুতের শকড্ থেকে বয়স্ক/শিশু সকলকে রক্ষা করার জন্য বিদ্যুত নিয়ন্ত্রক বক্স যথেষ্ট উচ্চতায় স্থাপন করা এবং সর্বসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। সম্ভব হলে বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ বক্স বিদ্যুৎ ও অগ্নিপ্রতিরোধক বস্তু দ্বারা তৈরী করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক গোলোযোগ থেকে ২০১২ সালে ৫৯২৪টি, ২০১৩ সালে ৫৪৬৯টি, ২০১৪ সালে ৫৮৯৮টি, ২০১৫ সালে ৫৯২৩টি সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৫১০৪টি এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।

১) বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় মেইনটেন্যান্সের অভাব

যে কোনো কারিগরি সরঞ্জামাদির মেইনটেন্যান্স একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৈদ্যুতিক লাইনে, জয়েন্ট বক্সে, মেইনসুইচ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিতেও মেইনটেন্যান্স সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুতের এ সকল সরঞ্জামাদিতে প্রচুর নাট, বোল্ট, স্ক্রু ও অন্যান্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে। সময়ের ব্যবধানে এসব নাট, বোল্ট, স্ক্রু ঢিলা হয়ে যায় অর্থাৎ লুজ কানেকশনজনিত ত্রুটি এসে যায়। উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় লুজ কানেকশন মারাত্মক একটি ত্রুটি, যা থেকে অনবরত স্পার্ক হয় এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে অতি উচ্চতাপের সৃষ্টি হয়ে বৈদ্যুতিক লাইনে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত করে তারের নিরাপত্তা আবরণ পুড়িয়ে ফেলে ও নেগেটিভ পজেটিভ লাইন সরাসরি একত্র হয়ে শর্টসার্কিটের সৃষ্টি করে। যা থেকে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের। লুজ কানেকশনের কারণে কখনও কখনও বিদ্যুৎ পরিবহনের ধাতব তার জ্বলে গিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য তারের সাথে যুক্ত হয়ে শর্টসার্কিট সৃষ্টি করে, অথবা কন্ট্রোলবক্সের সংস্পর্শে এসে বক্সটি বিদ্যুতায়িত করে ফেলে। ফলে অগ্নিকাণ্ড আরও ব্যাপক এবং ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সময়ে সময়ে এই সরঞ্জামসমূহ মেইনটেন্যান্স করলে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে ময়লা বা মাকড়সার জাল এবং সহজে লুজ কানেকশন জনিত ত্রুটি থাকে না এবং লুজ কানেকশন থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনে অন্য কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সে সব ত্রুটি বিচ্যুতিও যথোপযুক্তভাবে সংশোধন ও মেরামত করা অত্যাবশ্যক। এ সকল ত্রুটি মেরামত করলে অগ্নিকাণ্ড ঘটার আশঙ্কা অনেক কমে যায়। উল্লেখ্য যে, দুর্ঘটনারোধে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অতি উত্তমরূপে স্থাপন করার বিকল্প নেই। উত্তমরূপে স্থাপিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে সাধারণত শর্টসার্কিট হয় না। এ বিষয়ে যারা কাজ করেন, তাদের আন্তরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে তাদের কারিগরি সঠিক জ্ঞানের প্রয়োগ আবশ্যক। আবার বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের কারিগরি জ্ঞানের (যদি থাকে) প্রয়োগও অনেক সময় শর্টসার্কিট হয় না ও বড় বড় দুর্ঘটনা রোধ করে। কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগহীনতা ও বৈদ্যুতিক ত্রুটিজনিত কারণে অনেক বড় বড় অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটে। সুতরাং কারিগরি জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রকে অনেক মারাত্মক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

২। আনাড়ি বা অদক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা বিদ্যুতের লাইনে কাজ করা:

হাতুড়ে চিকিৎসক যেমন মানুষকে অপচিকিৎসা করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় বা পঙ্গু করে দেয়, তেমনি অদক্ষ টেকনিশিয়ানও কারিগরি ব্যবস্থা ও সরঞ্জামাদির বিপর্যয় ডেকে আনে। যা পরিণামে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটায় ও কাজ করার সময় নিজের অথবা আশেপাশে অবস্থানরত অনেকের জীবন নাশ করে। কখনও কখনও অদক্ষ কারিগরের কাজ তাৎক্ষণিকভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া না করলেও পরবর্তীতে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটায়। আবার কোন সময়ে স্মরণাতীত ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে। বিদ্যুত ব্যবস্থাপনায় অদক্ষ কারিগরি ব্যক্তির দ্বারা কাজ সম্পন্ন করলে সমগ্র লাইনেরই নিরাপত্তা নষ্ট করে দেয়। ফলে শর্টসার্কিট হয়ে দুর্ঘটনার সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সুতরাং বিদ্যুতের লাইনে কাজ করার সময় অবশ্যই টেকনিশিয়ান দক্ষ কিনা সেটি জেনে নেয়া উচিত। আর মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে প্রত্যেক বিদ্যুৎ কারিগরি ব্যক্তির উচিত নিজের দক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর প্রাকটিক্যাল কাজে নিয়োজিত হওয়া। অন্যথায় কারিগরি কাজের নামে মানবজীবন ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়।

৩। অন্য কোনো অগ্নিকাণ্ডের কারণে শর্ট সার্কিট হওয়া:

বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনে কোনো কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তারের নিরাপত্তা আবরণ বা ইনস্যুলেশন জ্বলে যায় এবং শর্ট সার্কিট হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা আরও বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন যেন কোনো অবস্থাতেই অগ্নি স্পর্শ

না করে সেদিকে সকলেরই লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। অনেক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায়ও অগ্নিকাণ্ড ঘটে, যা থেকে শর্টসার্কিট হয় ও আরও ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। অনেক অপ্রাকৃতিক দুর্ঘটনাও শর্টসার্কিট সৃষ্টি করতে পারে। যা থেকেও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।

৪। ভিজা বা স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা ও ইমারতের উপযুক্ত মেরামত না করা:

বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনে বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহৃত হওয়ার সময় ভিজা বা স্যাঁতস্যাঁতে থাকলে বা সংস্পর্শে এলে শর্টসার্কিট হতে পারে। আর বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ সরবরাহের স্থান ভিজা বা স্যাঁতস্যাঁতে থাকা বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নষ্ট করে দেয়। সেজন্য ঘরবাড়ি ও সকল ইমারত ভবন নির্মাণের সময় কঠোর সতর্কতাসহ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যাতে বিদ্যুতের লাইন বা সরঞ্জাম কোনো অবস্থাতেই ভিজা বা স্যাঁতস্যাঁতে সংস্পর্শে না আসতে পারে। বিদ্যুৎ লাইনের নিরাপত্তার জন্য এটি অপরিহার্য। আর নির্মিত ভবনসমূহের মেইনটেন্যান্স করার সময়ও খেয়াল রাখা দরকার, যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনে বা সরঞ্জামাদির কাছে পানি বা বিদ্যুৎ পরিবাহী তরল পৌঁছুতে না পারে।

যান্ত্রিক কারণ:

অদক্ষতা ও ভুল পদ্ধতিতে কাজ করার কারণে ও উপযুক্ত মেইনটেন্যান্স এর অভাবে যন্ত্রপাতির তাপমাত্রা বেড়ে যায় ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে। বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিকতাকে উত্তপ্ত করে। আর উত্তপ্ত পরিবেশে সৃষ্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দেয়। উত্তপ্ত পরিবেশ শুধু অগ্নিকাণ্ডেরই কারণ নয়, কারখানা অভ্যন্তরে স্বস্থিদায়ক আবহাওয়া নষ্ট করে দেয়। ফলে শ্রমিকের শারীরিক অসুবিধার কারণে উৎপাদনের গতিও অনেকাংশে হ্রাস পায়। সুতরাং কারখানার ভিতরের পরিবেশ যাতে উত্তপ্ত না হয় ও দাহ্যবস্তু বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কারখানার অভ্যন্তরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, স্বস্তিকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এজন্য কারখানা নির্মাণ কৌশল লক্ষণীয়। কারখানা ভবন যেন মৃত্যুফাঁদ না হয়, সে বিষয়ে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ নজর রাখতে পারেন। আর মানবিক গুণাবলি অনুসরণ করে মালিকপক্ষ যেন নিজ দায়িত্বে তার অধীনস্থ কর্মীদের জীবন বাঁচানোর যাবতীয় ব্যবস্থা কারখানা নির্মাণ ও কাজের সময় বহাল থাকে, সে দিকে আন্তরিক হন। এতে শ্রমিকের জন্য কারখানা এবং অন্যান্য সকল কর্মরত জনের জন্য কর্মস্থল নিরাপদতর হয়। কারখানা ও কর্মস্থল নিরাপদতর হওয়ার কারণে কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার মননশীলতা, কর্মোদ্যম, কর্মস্পৃহা, কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনাও দক্ষতর হয়। উৎপাদনের গতি ব্যপক বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মরতদের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নততর হয়। এটি দক্ষ শ্রমিক তৈরীতেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। উৎপাদিত মানসম্মত পণ্য দেশে-বিদেশে ব্যপক সমাদৃত হয় এবং কারখানা ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অত্যন্ত সহায়ক হয়। যন্ত্রাংশের ঘর্ষণ জনিত কারণে ২০১২ সালে ৩৫৭টি, ২০১৩ সালে ৩০৬টি, ২০১৪ সালে ২৫২টি, ২০১৫ সালে ২৪৪টি এবং সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৯১টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।

ওয়েল্ডিংয়ের আগুন:

ওয়েল্ডিং এর সময় অত্যন্ত উচ্চতাপের সৃষ্টি হয়। বৈদ্যুতিক আর্ক ওয়েল্ডিং- এ এর পরিমাণ প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গ্যাস ওয়েল্ডিং- এর সময় প্রায় ২৮০০-৩৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই অতি উচ্চতাপে কাজ করার সময় ও অগ্নিশিখা বা আর্কের আশেপাশে কোনো দাহ্যবস্তু থাকলে তাতে আগুন ধরার সমূহ আশঙ্কা থাকেই। ওয়েল্ডিং- এর গলিত স্প্যাটার যাতে দাহ্য বস্তুর উপর না পড়ে, তারও ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। স্মরণযোগ্য, ওয়েল্ডিং- এর শিখা থেকে নিঃসরিত আলোকরশ্মি ত্বক ও চোখের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং ওয়েল্ডিং করার সময় যথার্থ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। তা নইলে এ থেকে অগ্নিদুর্ঘটনা তো ঘটতে পারেই, উপরন্তু আশেপাশে অবস্থানকারীর চোখ ও ত্বক খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ওয়েল্ডিং, রাসায়নিক পদার্থ, বয়লার বিস্ফোরণ, মশার কয়েল ইত্যাদি কারণে ২০১২ সালে ১০৪১টি, ২০১৩ সালে ১৪৮২টি, ২০১৪ সালে ১৩০৪টি, ২০১৫ সালে ১০৪৭টি এবং সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৮৫৭টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।

অন্যান্য কারণ:

বহু শিল্পে জ্বালানী হিসাবে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এসকল গ্যাস অসাবধানে ব্যবহারের কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। বাষ্প উৎপন্ন করার বয়লারে অনেক সময় বিস্ফোরণ ঘটে। কোনও ক্ষেত্রে আবার একশিল্পের অগ্নিকাণ্ড থেকে অন্য শিল্পে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। এ সকল অগ্নিকাণ্ড রোধ করার জন্য গ্যাস প্রেসার নিরাপদ সীমায় নিয়ন্ত্রণ করার বিকল্প নেই। বয়লারের বিস্ফোরণ রোধ করার জন্য বয়লার মাউন্টিং (বয়লারকে নিরাপদে চালানোর যান্ত্রিক সরঞ্জাম) এর যথার্থ ব্যবহার ও এর উন্নয়ন অপরিহার্য। গত ২০১৯ সালে মোট ১১টি বয়লার সংক্রান্ত বিস্ফোরণ ও অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় ১০ জন আহত এবং ১৫ জন নিহত হয়েছে।

অসচেতনতা ও অসতর্কতা:

যে কোনো ঘটনা/ দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে অজ্ঞতা, অসতর্কতা, অসচেতনতা ঘটনা/দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রেও এটি ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন এর কারণ জানা এবং সেই মোতাবেক সতর্ক থাকা ও সচেতন হওয়া। এ বিষয়ে সকল অফিস/ আদালতে

কর্মরত মানুষকে ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে সচেতনতা, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সভা-সেমিনার/ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়।

নিরাপদ কারখানা নির্মাণ, কারাখানার অভ্যন্তরে নিরাপত্তা বজায় রাখা,

নিরাপদে দাহ্যবস্তু সংরক্ষণ ও পরিবহন-

(১)শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে সকল স্থানে উচ্চতাপে কাজ করা হয় বা উচ্চ তাপে উত্তপ্ত হওয়ার যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে, সে সকল স্থানে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা আবশ্যক। আবার যে সকল যান্ত্রিক/অযান্ত্রিক ব্যবস্থা অতি উচ্চতাপে ব্যবহার করা হয়, সেগুলো যথার্থ নিরাপদতর ও ত্রুটিমুক্ত পদ্ধতিতে ব্যবহার হওয়া আবশ্যক। এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকায় প্রতিষ্ঠা/নির্মাণ না করাই নিরাপদতর।

২। যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান অতি উচ্চতাপ উৎপাদন করে ও ব্যবহৃত কারিগরি/অকারিগরি বস্তু উত্তপ্ত করে, সে সকল প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকায় নির্মাণ করার অনুমতি দেয়া সমীচীন নয়। এ ধরনের কারখানার আশেপাশে যেন কোনো দাহ্য বস্তু উৎপাদন সংরক্ষণ, ব্যবহার এমনকি যথার্থ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ব্যতীত বহনও করা না হয়, সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের খুবই সচেতন ও সাবধান থাকা প্রয়োজন। অননুমোদিতভাবে নির্মিত এ সকল কারখানা বন্ধ করে দিয়ে দাহ্যবস্তু তাপ ও তাপ উৎপন্নকারী বস্তু দ্রুত নিরাপদজনক স্থানে সরিয়ে ফেলা আবশ্যক।

৩। যে সকল কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার করা হয়, সে সকল কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। একই সাথে দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও পরিবহনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

৪। রাসায়নিক পদার্থসহ সকল দাহ্যবস্তু অতি দ্রুত নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা থাকা, এ বিষয়ে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও প্রদত্ত প্রশিক্ষণ যথসময়ে প্রয়োগ করা খুবই কার্যকরী হয়। রাসায়নিক পদার্থের বিধ্বংসী ক্ষমতা ভয়ঙ্করতম। সেক্ষেত্রে বর্ণিত বিষয়ে নিরাপত্তা আইন/নিয়ম কারখানা অভ্যন্তরীনভাবে ও সরকারিভাবে সময়ে সময়ে মনিটরিং করা যেতে পারে। উল্লেখিত ধরনের কারখানা এবং কারখানার অভ্যন্তরে মালামাল মজুদের স্থানে প্রাথমিক চিকিৎসা, সম্ভব হলে উন্নতমানের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা দরকার। দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ, বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদন, বিশোধন, সংরক্ষণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে জনবহুল এলাকা এবং অনুপযুক্ত সময় ও জনবসতিপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। দাহ্য রাসায়নিক দ্রব্য ও বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ যেন নিরাপদ দূরত্বে হয়, সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বোচ্চ সাবধান থাকা বাঞ্ছনীয়। বিস্ফোরক দ্রব্য ও রাসায়নিক পদার্থের নিরাপত্তার জন্য তাপমাত্রা সুনিয়ন্ত্রণ অতি জরুরী।

৫। শিল্পের উত্তপ্ত বর্জ্য যেখানে-সেখানে না ফেলে নির্ধারিত ও সংরক্ষিত স্থানে ফেলা উচিত। উত্তপ্ত বর্জ্য ঠান্ডা করে নিষ্কাশন করা বা ফেলে দেয়াই উত্তম। বায়বীয় উত্তপ্ত বর্জ্য যাতে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে না পারে এবং পরিবেশ দূষণ করতে না পারে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৬। শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে দাহ্যবস্তু যত্রতত্র ছড়িয়েছিটিয়ে অপরিকল্পিতভাবে ফেলে রাখলে দুর্ঘটনার সময় ইমার্জেন্সি এক্সিট বা কারখানা থেকে বের হয়ে আসার সাধারণ দরজার কাছে পৌঁছানোও খুব কঠিন হয়। বিশেষত অগ্নিকাণ্ডের সময় যত্রতত্র রাখা দাহ্যবস্তুতে আগুন ধরলে জ্বলন্ত মালামালের কাছ দিয়ে বা মধ্য দিয়ে নিরাপদজনক স্থানে আসা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ও কখনও অসম্ভব হয়। কাজেই প্রত্যেক শিল্প কারখানাতে সকল ধরনের দাহ্যবস্তু সংরক্ষণের উপযুক্ত গুদাম নির্মাণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। গুদাম নির্মাণ শুধুমাত্র দাহ্যবস্তু সংরক্ষণের জন্যই নয়, সকল ধরনের মালামাল সুষ্ঠুভাবে নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য অত্যাবশ্যক। আবার নির্মিত গুদামে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মালামাল সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা এটিও লক্ষণীয়। আর গুদাম বা ভাণ্ডার অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে মেইনটেইন করতে হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকা খুবই প্রয়োজন।

৭। কারখানার অভ্যন্তরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, স্বস্তিকর পরিবেশ পরিস্থিতি বজায় রাখা, পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো-বাতাসের জন্য কারখানা নির্মাণ কৌশল লক্ষণীয়। কারখানা ভবন যেন মৃত্যুফাঁদ না হয়, সে বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সতর্ক নজর রাখতে পারেন। আর মানবিক গুণাবলী অনুসরণ করে নিজ দায়িত্বে তার অধীনস্থ কর্মীদের জীবন বাঁচানোর যাবতীয় ব্যবস্থা কারখানা নির্মাণ ও কাজের সময় যেন বহাল রাখা হয়, সেদিকে মালিক পক্ষের আন্তরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৮। শিল্প কারখানায় পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা রাখা কারাখানায় স্বস্তিতে কাজ করার ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক হয়। একই সাথে কারখানার অভ্যন্তরে সকল সময় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সুবিধা থাকাও বাঞ্ছনীয়। কারাখানা নির্মাণ কৌশলে এগুলো নিয়ম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত। অথচ অনেক ক্ষেত্রে এগুলো বাস্তবায়ন করা হয় না। ফলে বহু কারখানার অভ্যন্তরভাগ মৃত্যুর দুর্গের সমতুল্য হয়। সেখানে অবস্থানকারীদের অস্বাস্থ্য ও অস্বস্তিকর পরিবেশসহ নিরাপদে কাজ করার সুযোগ একেবারে ন্যূনতম হয়। ফলে এ সকল কারখানায় কোনো ধরনের দুর্ঘটনায় অবস্থানরতদের জীবন সহজেই মরণাপন্ন হয়। অন্যদিকে উদ্ধারকাজও খুবই কঠিন হয়। কাজেই কারখানা নির্মাণের নিয়ম অনুসরণ করে কারখানা নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠিত বহু কারখানার রি-মডেলিংয়েরও প্রয়োজন। এ বিষয়ে কারখানা মালিক কর্তৃপক্ষ ও সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/বিভাগ যৌথভাবে আন্তরিকতার সাথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন।

৯। বহু আবাসিক ভবনের জন্য নির্মিত ইমারতে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি শিল্প কারখানার শ্রমিক/কর্মচারীগণের জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ। উপরন্তু ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য মালামালের যথাযথ সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। কেননা আবাসিক ভবন ও শিল্পকারখানা নির্মাণের প্রযুক্তিগত দিক ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত

মালামালের ধরন ও পরিমাণ ভিন্ন হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত পুরনো ভবনে শিল্পকারখানা গড়ে তোলা হয়। এসবই প্রাকৃতিক, কৃত্রিম সামান্য দুর্ঘটনায়, শিল্পকারখানা স্বাভাবিক কাজের সময় সৃষ্ট প্রতিকূলতা/চাপে বিধ্বস্ত হয়। কখনো কখনো অগ্নিকাণ্ডও ঘটে। শিল্পকারখানা ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা ধ্বংস হলে শুধু এক বা বহু জীবনই অবসান হয় না, ব্যক্তি এমনকি জাতিরও স্থায়ী সম্পদ এবং অর্থের বিপুল অপচয় হয়। কাজেই আবাসিক ভবনে ও পুরনো পরিত্যক্ত ভবনে কোনো অবস্থাতেই যেনো শিল্পকারখানা গড়ে না ওঠে এবং শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার সঠিক ডিজাইন, প্ল্যান যথার্থই অনুসরণ করেই শিল্পকারখানা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারেন। শিল্পকারখানা অবশ্যই জাতির অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষের জন্য মৃত্যুর কারণ হওয়ার জন্য নয়। এটি সকলেরই আন্তরিকভাবে স্মরণ রাখা বাঞ্চনীয়।

কারিগরি জ্ঞান: কারিগরি জ্ঞানের অভাবে নানাস্থানে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। অথবা অগ্নিকাণ্ডের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে সকল কারিগরি সামগ্রী ব্যবহার করি, সেগুলো জরুরী নিষ্ক্রিয় করতে শেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। অনেক সময় একটি মেইন সুইচ বা গ্যাসের চুলার নব ঘুরিয়ে বন্ধ করার ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য টুলস্ ব্যবহারের ক্ষুদ্র কারিগরি জ্ঞানের অভাবেই দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়। আবার কখনও কখনও কারিগরি জ্ঞান যথাসময়ে প্রয়োগে অনেক বড় দুর্ঘটনা রোধ হয়। সুতরাং নিজের বাড়িতে ব্যবহৃত কারিগরি সরঞ্জামের ব্যবহার শিখতে আমরা যেন অবহেলা না করি। উল্লেখ্য, শর্টসার্কিট হলে অত্যন্ত উচ্চ ভোল্টের বা বৈদ্যুতিক চাপের সৃষ্টি হয়। এই উচ্চ বৈদ্যুতিক চাপের দ্বারা যাতে ক্ষতি না হয়, সেজন্য কাটআউটের ব্রিজে প্রয়োজনীয় মাপের তারের সংযোগ থাকে। উচ্চ বৈদ্যুতিক চাপ সৃষ্টি হলেই এ তার তাৎক্ষণিকভাবে পুড়ে গিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সমগ্র বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় নিরাপত্তা সংরক্ষিত হয়। অনেক অসচেতন বা কারিগরি জ্ঞানহীন ব্যক্তি এ নিরাপত্তার বিষয়টি না জেনে কাটআউটের মধ্যে মোটা তার ব্যবহার করেন। ফলে যে কোনো কারণেই হোক না কেন, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের সময় কাটআউটের মোটা তার উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখে। যা সমগ্র বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় ও সৃষ্টি করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের। কোন অবস্থাতেই যেন কাটআউটে প্রয়োজনের তুলনায় মোটা তার ব্যবহার করা না হয় । কাটআউটের ব্রিজে প্রয়োজনের তুলনায় মোটা তার ব্যবহার করা বৈদ্যুতিক সরবরাহের নিরাপত্তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়। অবশ্য বর্তমানে দুর্ঘটনায় তাৎক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবারহ বিচ্ছিন্ন করার জন্য সার্কিট বেকার ব্যবহার করা হয়। এ সার্কিট বেকারের কার্যকারিতাও মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যাতে সময়ে বিদ্যুৎ সরবারহ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়।

কলেজের পাঠ্যসূচিতে দুর্যোগ/ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ:

ক) ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। ঋতুবৈচিত্রের এদেশে কখনও বন্যা, খরা, কখনও অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি, আবার কখনও জলাবদ্ধতায় জনজীবন বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত হয়, প্রকৃতি ছারখার হয়ে যায়। সেই সাথে কালবৈশাখী ও টর্নেডোর প্রলয়নৃত্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সমাজ-সংসার। আবার সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণের জনপদ ধ্বংস হয়ে যায় মাঝে মাঝেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এ দেশের অনেক অঞ্চলই আবার ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার আওতায় পড়েছে। আর অগ্নিকাণ্ড তো বৎসরের প্রায় সময়ই ঘটছে। অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়, প্রাকৃতিক/অপ্রাকৃতিক নানা দুর্ঘটনা আমাদের নিত্যদিনের সাথী। এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এ সবের কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। আর কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা সব থেকে কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হতে পারে। সুতরাং এদেশে প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক সকল দুর্যোগ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিষয়সমূহ স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। তাতে সকল শিক্ষিত মানুষ নানা বিপর্যয় থেকে নিজেকে, অন্যকে ও পরিবেশ রক্ষা করতে সক্ষম হতে পারে।

খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা যায় না। দুর্যোগের পূর্বে ও পরে যথাক্রমে সাবধানতা ও প্রতিকারের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমানো যায়। অবশ্য এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয় সাপেক্ষে হতে পারে। সাধারণত সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগেরই প্রাকৃতিক পূর্বাভাস পাওয়া যায়, ব্যতিক্রম ভূমিকম্প। ভূমিকম্প হওয়ার প্রাকৃতিক পূর্বাভাস পাওয়া যায় না ও এর লক্ষণ আজ অবধি কৃত্রিমভাবে আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। তবে প্রকৃতি স্বভাব-সুলভ আচরণে সকল দুর্যোগেরই লক্ষণ জানায়। দুর্যোগের আগে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন লক্ষ্য করে এটি বুঝা যেতে পারে ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলো সম্পর্কে মানুষের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা, বহুকাল ধরে প্রচলিত জনকথা এবং পৌরাণিক কাহিনীতে বর্ণিত (যদি থাকে) বিষয়-আশয় অনুসরণ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী ভূমিকম্প প্রবণ দেশ জাপানের ভূমিকম্পের আগে ও পরের সম্পাদিত কার্যাবলী উদাহরণ হিসাবে নিয়ে তার আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। তাদের এতদসংক্রান্ত কারিগরি বিষয়াদিও অনুসরণ করা যায়। অবশ্য প্রত্যেক দেশেরই আলাদা আলাদা আঞ্চলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য হতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের লক্ষণ ও পরের করণীয় বিষয় জনমানুষের জানা থাকলে দুর্যোগের পূর্বে ও পরে দ্রুত সতর্কতা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আর এলক্ষ্যে এ সকল বিষয়ে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি করার নিমিত্ত বর্ণিত বিষয় বাস্তবমুখী করে শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষা দেয়া যায়। এজন্যই বিষয়টি শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা যুক্তিযুক্ত। সারা বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভূমিকম্প প্রধান দুর্যোগ। এ দুর্যোগের পূর্বাভাষ না পাওয়া যাওয়ায় এর কারণে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ ও ধারণাতীত হয়। তবে ভূমিকম্পের পূর্বে ও ভূমিকম্পের সময়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় কম রাখা যায়। নিচে ভূমিকম্পের পূর্বে ও ভূমিকম্পের সময় অবশ্য করণীয় বিষয়াদি উল্লেখ করা হল।

১) ভূমিকম্প অনুভূত হলে আতঙ্কিত বা দিশাহার হবেন না। আপনি যদি ভবনের নিচ তলায় অবস্থান করেন, তাহলে দ্রুত বাইরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুন।

২) যদি ভবনের উপর তলায় অবস্থান করেন তাহলে কক্ষের নিরাপদ স্থান যেমন শক্ত খুটি বা টেবিলের নিচে,বীম বা কলামের পার্শ্বে অথবা কক্ষের কোনায় আশ্রয় নিন। বসে পড়ুন এবং বলিশ, কুশন, হেলমেট বা অন্য সুবিধাজনক কিছু দিয়ে মাথা সুরক্ষিত করুন।

৩) প্রথম ঝাঁকুনির সাথে সাথে দ্রুত খোলা জায়গায় আশ্রয় নিন।

৪) রুম বা ঘর থেকে বের হওয়া অথবা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আশে পাশের লোকজনকে জরুরী ভিত্তিতে উচ্চস্বরে ঘর থেকে বের হতে বলুন।

৫) ভূমিকম্প শেষ হওয়ার পরও অন্তত ৩০ মিনিট খোলা জায়গা বা রাস্তায় থাকুন, কেননা ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আধা ঘন্টার মধ্যে পুনরায় ভূমিকম্প হতে পারে।

৬) উচ্চতলা ভবন, গাছ, উঁচুবাড়ী, বৈদ্যুতিক খুটি থেকে দূরে খোলা স্থানে আশ্রয় নিন (ঘরের বাইরে থাকলে)।

৭) গার্মেন্টস, অন্যান্য শিল্প কারখানা, হাসপাতাল, মার্কেট, সিনেমা হল, ইত্যাদি স্থানে থাকলে বের হওয়ার জন্য দরজার সামনে ভীড় কিংবা ধাক্কা-ধাক্কি না করে দু'হাতে মাথা ঢেকে বসে পড়ুন। ব্যাটারী চালিত রেডিও, টর্চ লাইট, পানি এবং ফাষ্ট এইড চিকিৎসার সরঞ্জাম প্রয়োজনমত বাড়ীতে মজুদ রাখুন।

৮) রুম বা ঘরের অভ্যন্তরে থাকলে পাঁকা বাড়ী হলে শক্ত কলামের গোড়ায় আশ্রয় নিন। অথবা শক্ত খাট বা টেবিলের নিচে বসে থাকুন।

৯) গাছপালা, ভবন ও লাইটপোষ্ট থেকে দূরে থাকুন। ভূমিকম্পের সময় বর্ণিত যে কোন স্থানে বসে হাঁটু কোলের কাছে এনে হাত মাথার পেছনে রেখে অবস্থান করুন।

১০) অনতিবিলম্বে বৈদ্যুতিক ও গ্যাসের সুইচ বন্ধ করে দিন (যদি সম্ভব হয়)।

১১) সাথে কিছু নেওয়ার জন্য অযথা সময় নষ্ট করবেন না, মনে রাখবেন সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

১২) ভূমিকম্প চলাকালীন লিফট ব্যবহার করবেন না।

১৩) গাড়ীতে খাকাকালীন চালককে গাড়ী থামিয়ে রাখতে বলুন এবং কোন অবস্থাতেই সেতু পার হবেন না।

১৪) কোন অবস্থাতেই তাড়াহুড়া করবেন না। দুর্ভাগ্যবশত ধব্ংসস্তুপে আটকে পড়লে সাহস হারাবেন না। কেননা উত্তেজনা ও ভয় অধিকতর ক্ষতিকর হতে পারে। আর মনে রাখবেন, মানুষ মানুষের জন্য। তাই বিলম্ব হলেও উদ্ধারকারী দল আসবেই।

১৫) ভূমিকম্পে আহতদের জন্য সম্মিলিতভাবে জরুরী চিকিৎসার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১৬) আপনি যদি কোন বিধ্বস্ত ভবনে আটকা পড়েন এবং আপনার ডাক উদ্ধারকারীগণ শুনতে না পায় তাহলে শক্ত কোন কিছু দিয়ে মেঝেতে বা দেওয়ালে আঘাত করে উদ্ধারকারীগণের মনযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করুন।

১৭) ভূমিকম্পকালীন আশ্রয়স্থলে পানি, শুকনো খাবার, ব্যাটারী চালিত টর্চ, বাশি ও প্রদর্শনের জন্য লাল কাপড় ইত্যাদি সংরক্ষণ করুন।

১৮) ভূমিকম্পের আগাম পূর্বাভাষ দেওয়ার কোন যন্ত্র আজ অবধি আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং সচেতনতা এবং পূর্ব প্রস্তুতিই ভূমিকম্প মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায়।

১৯) বাড়ীঘর বা যে কোন ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণ আইন অনুসরণ করুন।

প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে জানা:

এটি শুধু অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রেই নয়, সকল দুর্যোগ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রতিরোধই সর্বোত্তম সমাধান। অগ্নিকাণ্ড কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, সে বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ প্রয়োগের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ অগ্নি প্রতিরোধের সার্থক পদক্ষেপ হতে পারে। সকল কিছুর পরও কখনও কখনও প্রাকৃতিক/ অপ্রাকৃতিক/ মানুষের সৃষ্ট ভুলের কারণেই হোক না কেন, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ জানা এবং তার সার্থক প্রয়োগ।

অগ্নিনির্বাপনের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা এবং সরঞ্জামের ব্যবহার:

অগ্নিনির্বাপনের পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে অগ্নিনির্বাপণে বহু সময় নষ্ট হয় এবং আগুনের লেলিহান শিখার ধ্বংসযজ্ঞ চলতেই থাকে। সুতরাং অগ্নি-নির্বাপণের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অগ্নিনির্বাপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অনেক সময় ছোট দুর্ঘটনা শুরুতেই যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা হলে সেই দুর্ঘটনা অধিকতর ক্ষতিকর হয় না। সুতরাং অগ্নিনির্বাপণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ও তার সঠিক সময়ে প্রয়োগ অনেক বড় অগ্নিকাণ্ড থেকে সকলকে রক্ষা করতে পারে। যেমন- তৈল জাতীয় পদার্থের আগুন লাগলে পানি ব্যবহার করা যায় না, কোন ধরনের আগুনে বালি বা নিষ্ক্রিয় করা গ্যাস ব্যবহার করা দরকার সে বিষয়ে জানা, আবার সাধারণ অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হলে পানি ব্যবহার করে আগুন নিভিয়ে ফেলা এবং সাথে সাথে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাসহ সকল দাহ্যবস্তু সরিয়ে ফেলা বিষয়ে জানা। অধিক উচ্চ দাহ্যবস্তুর আশেপাশে যেন কোনো অবস্থাতেই সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ না ঘটে, সেদিকে সাবধান থাকা দরকার। ক্বদাচিৎ অনিবার্য/ অসাবধানতার কারণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হলেও সেটি সীমাবদ্ধ করা ও ত্বরিৎ নিভিয়ে ফেলা আবশ্যক। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অগ্নি নির্বাপণের কাজে যে সকল নির্বাপণ যন্ত্র ব্যবহৃত হয় বা অন্যান্য ব্যবস্থা থাকে সেগুলোর ব্যবহার না জেনে শুধু প্রদর্শনী হিসাবে রাখার কোনো অর্থ নেই। এই বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন অফিস আদালতে ও আবাসিক ভবনসমূহে এবং শিল্পাঞ্চলে অধিকতর আন্তরিকতার সাথে প্রশিক্ষণের ও প্রদত্ত প্রশিক্ষণের ফলোআপের ব্যবস্থা করলে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে সময়ে সময়ে পাবলিসিটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলে আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যেতে পারে।

অগ্নিনির্বাপণে দক্ষ জনবল তৈরি করা:
যে কোনো অফিসে বা কার্যালয়ে অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশার বা বিভিন্ন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী থাকেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে বাছাইকৃত কয়েকজনকে অগ্নি-নির্বাপণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে এ বিষয়ে দক্ষ করা যেতে পারে। যাতে অগ্নিকাণ্ডের সময় এই গ্রুপের জনবল অগ্নিনির্বাপণে নেতৃত্ব দেন ও অগ্নিকাণ্ড থেকে সকলকে রক্ষা করার যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে ও অগ্নিকাণ্ড থেকে সকলকে রক্ষা করতে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অবশ্য দক্ষ জনবল তৈরির সাথে সাথে অগ্নিনির্বাপণের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। তা নইলে প্রয়োজনের সময় দক্ষ জনবল কার্যকরী ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও পদ্ধতি অনুরসরণ যে কোনো সমস্যারই সমাধান নিরাপদতর ও সহজ করতে পারে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দক্ষ জনবলও অকেজো হয়ে পড়ে, যদি সংশ্লিষ্ট কাজের আধুনিক ও উপযুক্ত সরঞ্জাম না থাকে। অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণের ক্ষেত্রেও এটি সমান প্রযোজ্য। আবার আধুনিক সরঞ্জাম দ্বারা পুরান, জরাজীর্ণ ও অনুন্নত সরঞ্জাম অপেক্ষা অনেক বেশি দক্ষতার সাথে কাজ করা যায়, যা অগ্নিকাণ্ড ও অন্যান্য দুর্ঘটনা থেকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় সকল সম্পত্তি সুরক্ষায় অধিকতর সহায়ক হয়। প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপণের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজে দক্ষ জনবল তৈরি ও আধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এইক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ফায়ার সার্ভিস বিভাগ আরও উন্নত করা প্রয়োজন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট জনবলকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং আরও দক্ষতর প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। সেই সাথে প্রয়োজন সকল কার্যালয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও জনপদে এ বিষয়ে দক্ষতা সৃষ্টি করা। যাতে তারা অগ্নিকাণ্ডের প্রাথমিক পর্যায়েই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এতে অগ্নিকাণ্ডের কারণে ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হতে পারে। আর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে খুব সহজে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। বহু জীবন ও বিপুল মালামাল সহজে রক্ষা করা সম্ভব হয় ।

আগুন নির্বাপণ সম্পর্কে ন্যূনতম কারিগরি জ্ঞান রাখা:
আমাদের ঘর-বাড়িতে প্রাত্যহিক জীবনে যে সকল সরঞ্জামাদি ব্যবহার করি, তাদের ব্যবহার সম্পর্কে ন্যূনতম কারিগরি জ্ঞান রাখা অনেক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সহায়ক । যেমন- বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের সময় মেইন সুইচ বন্ধ করা, গ্যাসের চুলায় কোনো সমস্যা হলে বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া। অগ্নিকাণ্ডে পানি নিক্ষেপ অব্যাহত রাখা। বৈদ্যুতিক আগুনে, তৈল, গ্যাস ও রাসায়নিক দ্রব্যাদিতে, পরনের জামা কাপড়ে আগুন ধরলে তা নির্বাপণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে জানা ও সাহসিকতার সাথে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সহায়ক। এ সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে ট্রেনিং সকলেরই গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও দ্রুত চিকিৎসা:
যথাসময়ে প্রাথমিক চিকিৎসা মানুষ, পশু, সকলকেই অনেক বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে পারে। এমন কি যথা সময়ে একটু প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে মানুষ পরবর্তীতে অনেক বড় চিকিৎসা করেও শরীরের ক্ষতি এড়াতে না পেরে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর আগুনে পোড়া ক্ষত ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক ও দুর্নিরাময়যোগ্য। প্রায়শই যা চিকিৎসার পর আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত অন্যত্র প্রেরণ আবশ্যক হয়। অন্যথায় শুধু সাধারণ চিকিৎসা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং মানুষের অমূল্য জীবন ধ্বংস হয়। এই ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালসমূহে উন্নত বার্ন ইউনিট থাকা বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। বাংলাদেশের কোনো শিল্পাঞ্চলেই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কোনো কোনো এলাকায় হাসপাতাল আছে, যা শুধু সাধারণ হাসপাতাল হিসাবেই স্বীকৃত। বিসিক বা অন্যান্য শিল্পাঞ্চল, যেখানে শুধু অগ্নিকাণ্ড ছাড়াও বহু রকমের দুর্ঘটনা ঘটে সে সব স্থানে তাৎক্ষণিক দ্রুত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা। আর এই হাসপাতাল না থাকার কারণে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়তই যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অনেক দক্ষ জনবলের জীবনহানি ঘটে। আর একজন দক্ষ জনবলের জীবনহানিতে দেশ-জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং শিল্পাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডসহ সকল দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিগণের যথার্থ চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী এবং সেই সাথে প্রয়োজন প্রত্যেক শিল্পাঞ্চলে ফায়ার সার্ভিসের কার্যক্রম আলাদাভাবে স্থায়ী/অস্থায়ী ভাবে পরিচালনা করা। আহত মানুষকে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণের পূর্বে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুমূর্ষু মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, দুর্ঘটনাকবলিত মানুষকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যও হাসপাতালে প্রেরণ ছাড়া ন্যূনতম চিকিৎসা করা যায় না। আর এভাবে প্রেরিত অনেকের রাস্তায়ই মৃত্যু হয়। অথচ দুর্ঘটনাস্থলে সামান্য একটু চিকিৎসা হলে দুর্ঘটনার শিকার অনেকেরই জীবন রক্ষা পায়। সুতরাং দুর্ঘটনাকবলিত মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য দুর্ঘটনা বিশেষত অগ্নিদগ্ধ হয়ে চরম ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য তাৎক্ষণিক চিকিৎসা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের অধীনে চিকিৎসক নিয়োগ করা যেতে পারে। যারা অগ্নিকাণ্ডসহ যে কোনো দুর্ঘটনার সময় অপারেশনকারী টিমের সাথে দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত আহত মানুষজনকে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। যতদিন ফায়ার সার্ভিসের অধীনে চিকিৎসক নিয়োগ করে ও দুর্ঘটনা কবলিত মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা বা প্রবর্তন করা না যায়, ততদিন ফায়ার সার্ভিসের অপারেশনে যাওয়ার সময় সাধারণ হাসপাতাল থেকে (সরকারি/অসরকারি) চিকিৎসকটিম নিয়ে যাওয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করা যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য আহত ব্যক্তিদের দ্রুত অন্যত্র প্রেরণের সুবিধা থাকাও প্রয়োজন। দুর্ঘটনাস্থলের আশেপাশে অবস্থানকারী সকল চিকিৎসাবিদ বা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অগ্নিকাণ্ডের/দুর্ঘটনার

সময় মানবিক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলে অনেক মানুষের জীবনই সহজে মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে পারে।

ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট-এর উন্নয়ন:

ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ডিপার্টমেন্টের কার্যক্রমের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ বহু জীবন ও বিপুল পরিমাণ সম্পদ রক্ষায় অধিকতর সহায়ক। বর্তমান ফায়ার সার্ভিস উন্নত বা কর্মদক্ষ জনবল নেই, আমি তা বলছি না। এই ডিপার্টমেন্টের উন্নয়নের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার অর্থ হলো যে, এই ডিপার্টমেন্ট যত উন্নত হবে, তত বেশি মানুষের উপকার হতে পারে ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান হতে পারে। অবশ্য দ্রুত সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রের কাছে সকল নাগরিকের প্রত্যাশা। ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের জনবলের নিকট থেকে অধিকতর দক্ষ সেবা পাওয়ার জন্য তাদেরকে উন্নত সরঞ্জামাদি সরবরাহসহ দায়িত্ব পালনের সকল সুবিধা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের সেবার মান এবং ফায়ার সার্ভিসের কার্যক্রম অধিকতর দক্ষ করার জন্য এই ডিপার্টমেন্টের সাথে হেলিকপ্টার ও প্রয়োজনীয় নৌযান সংযুক্ত করা যেতে পারে।

গ্রামের মানুষজনকে ফায়ার সার্ভিস সুবিধার আওতায় আনা:

গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গণমানুষকে অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক ইউনিয়ন পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস কার্যক্রম স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ও সরঞ্জামাদিসহ জনবলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়া-আসা করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার কারণে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনো ধরনের যানবাহনে যাতায়াত সম্ভব হয় না। যার কারণে ঐ সকল স্থানের জনগণ ফায়ার সার্ভিসের সুবিধাসহ অনেক রাষ্ট্রীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। সুতরাং ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের উন্নয়নের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যাবশ্যক।

দ্রুত এবং নিরাপদতর বহির্গমনের নিশ্চয়তা:

প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। এই দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জরুরী ঘটনাস্থল ত্যাগ করা আবশ্যক। আর এ জন্যই প্রত্যেক ভবনেই দ্রুত ও নিরাপদতর বহির্গমনের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। আমি জাপানে এটি প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের এদেশেও অগ্নিকাণ্ড প্রায় নিয়মিত একটি দুর্ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বৎসরে প্রায় সময়ই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কারণে অগ্নিকাণ্ডসহ অন্যান্য দুর্ঘটনা ঘটছে এবং ব্যক্তিসহ রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। আর এসব ক্ষতির অন্যতম কারণ হিসাবে দ্রুত মানুষজনসহ মূল্যবান সম্পত্তি দুর্ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে না নেয়া বা এতদসংক্রান্ত ব্যবস্থা না থাকাকে চিহ্নিত করা যায়। চিহ্নিত এ সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রত্যেক ভবনে জরুরী ও নিরাপদতর বহির্গমনের ব্যবস্থা রাখা খুবই প্রয়োজন। আবার এটিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, জরুরী ও নিরাপদতর বহির্গমনের ব্যবস্থায় যেন কোনো ত্রুটি না থাকে। বহির্গমনের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলে এর মাধ্যমে মানুষজন ও মালামাল নিরাপদে সরানো যায় না। অর্থাৎ জরুরী বহির্গমনের সময়ও জানমালের প্রভূত ক্ষতি হয়। বহু কারখানার বহির্গমনের রাস্তা এতো সংকীর্ণ যে, এ সকল সিঁড়ি বা পথ নিরাপদ তো নয়ই, বরং দ্রুত বহির্গমনের সময় পুনরায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। কোনো কোনো কারখানার দ্রুত বহির্গমন ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত দরজা খোলার ব্যবস্থাও থাকে না। আবার কোনো কোনো বহুতল ভবনের জরুরী বের হওয়ার রাস্তা অসম্পূর্ণ। অর্থাৎ এ সড়ক বা সিঁড়ির একতলার সাথে অন্য তলার বা নিচের তলায় নামার কোনো যোগাযোগ থাকে না। এ ধরনের ত্রুটিযুক্ত দ্রুত ও জরুরী বহির্গমনের ব্যবস্থা শীঘ্রই ত্রুটিমুক্ত করা আবশ্যক। সুতরাং সকল দুর্ঘটনা থেকে মানুষ ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক ভবনে উপযুক্ত জরুরী বহির্গমনের সুবিধাও নিশ্চিত করে ভবনসমূহের ডিজাইন ও প্ল্যান করা উচিত এবং ডিজাইনকৃত ভবনের প্ল্যান পাস করার সময়ও এটি কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভবন নির্মাণের অনুমতি দেয়ার বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করার কোনো বিকল্প নাই। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলই ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার আওতায় পড়েছে এবং যে কোনো সময়ই এসকল অঞ্চলে মারাত্মক ভূমিকম্প ঘটতে পারে। সকল অঞ্চলে নির্মিত সকল ভবন থেকে প্রাকৃতিক/অপ্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সময় দ্রুত বহির্গমনের নিশ্চয়তাসহ বিদ্যমান দ্রুত বহির্গমনের ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করা আবশ্যক। উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জরুরী বহির্গমন (Emergency Exit) এর দরজা স্বয়ংক্রিয়ভবে উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা যায়। এ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত এবং সবসময় সচল ও অব্যাহত রাখার জন্য এবিষয়ে সময় সময় সরকারি মনিটরিং থাকা আবশ্যক।

মানবিক অধিকার লঙ্ঘন না করা:

যে কোনো দুর্ঘটনার সময় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের জীবন অপেক্ষা কোনো সম্পদই মূল্যবান নয় এবং মানুষের জীবন বাঁচানোই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সুতরাং দুর্ঘটনায় একজন অথর্ব-পঙ্গু মানুষের জীবনও যাতে বিপন্ন না হয়, সেদিকে দুর্ঘটনা কবলিত ভবন বা স্থানের সকলেরই লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিতর অসহায় মানুষজন রেখে লোহার গেটে তালা দিয়ে দারোয়ান চলে যায় শুধু ইন্ড্রাস্ট্রির কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য এবং সকল জড় সম্পদ রক্ষা করার জন্য। এমন অমানবিক, নিষ্ঠুর, নির্মমতম ঘটনাও এদেশে ঘটে। দায়িত্ব পালনের নামে মানুষকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বন্দী করে পুড়িয়ে মারার মত নিষ্ঠুর ও বর্বরতম ঘটনার কারণ খুঁজে বের করে এর প্রতিকার করা অতি জরুরী। তা না হলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় এবং অসহায় মানুষগণের করুণ আর্তনাদ স্তব্ধ করে দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতেই থাকে। দায়িত্ব পালনের নামে মানুষজন পুড়িয়ে মেরে ফেলার ঘটনার জন্য নিম্নোক্ত কারণ ও প্রতিকার উল্লেখ করা হলো। অশিক্ষা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার অভাবে এ ধরনের অমনাবিক ঘটনা ঘটে। মানুষের জীবনের চেয়ে মূল্যবান কোনো সম্পদ থাকতে পারে না। তাই যে কোনো দুর্ঘটনায় সর্বপ্রথম প্রয়োজন মানুষকে নিরাপত্তা

দেয়া। এই বোধ সর্বাপেক্ষা সফলভাবে আসতে পারে সুশিক্ষার মাধ্যমে। আমাদের দেশে যে সকল লোক গার্ড হিসাবে চাকরি গ্রহণ করে, তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অতি অল্পশিক্ষিত। এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে দায়িত্ব পালন বলতে শুধু পেশাগত কাজটুকু সম্পন্ন করার প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। তাদের কাছে গেটে সর্বক্ষণ তালা মেরে রাখা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুম ছাড়া কাউকে বাইরে না যেতে দেয়াই বড় বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক (অবশ্য এটি তার মূল দায়িত্বও বটে)। কিন্তু স্মরণীয়, দুর্ঘটনার সময় ব্যতিক্রম অতিক্রম করতে হয় সকলকেই। এ সময় মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য গেট খোলা রাখার হুকুম দেয়ার মত মানসিক অবস্থা কারও থাকে না। কেননা এই আদেশ দেয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও বিপন্ন থাকেন। সুতরাং যারা গেটে গার্ডের দায়িত্ব পালন করেন, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কারখানার অভ্যন্তরে কর্মরত শ্রমিকগণ তাদের মতই মানুষ, এদের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি আছে। গার্ড হিসাবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এদের জীবন রক্ষা করাও তাদের মানবিক দায়িত্ব। মানুষের জীবন বিপন্ন করে ইন্ডাস্ট্রির জড় সম্পদ রক্ষা করার জন্য কারও চাকরি দেয়া হয় না। মানবতার আইনে এ ধরনের বিধান নেই যে, মানুষের জীবন বিপন্ন করে দায়িত্ব পালনের নামে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া যায়। উল্লেখ্য, মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য সময়ে সাধারণ আইন অমান্য করলে কারও শাস্তি হয়েছে, এ রকম নজির সারাবিশ্বে কোথাও নেই। কেননা মানবতার আইন সবচেয়ে বড় আইন। অবশ্য অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জীবন রক্ষা করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব পালন ও নিশ্চিত করা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে গার্ডকে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যে, যে দুর্ঘটনায় কারখানা অভ্যন্তরে আটকা পড়লে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়, সে ধরনের দুর্ঘটনার সময় অবশ্যই সদর দরজা ও ইমার্জেন্সি এক্সিট খোলা রাখা বাধ্যতামূলক এবং এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তার সর্বোচ্চ আন্তরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুর্ঘটনার সময় প্রতিষ্ঠানের ভিতরে অবস্থানরতদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়া গার্ডের সাধারণ পেশাগত দায়িত্ব অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এজন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার করা সব থেকে বেশি কার্যকর। কারণ স্বল্পবেতনে কর্মরত একজন গার্ড জীবনজীবিকার প্রশ্নে সহজে নিয়মের বাইরে যেতে চায় না। এতে তার কর্মচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। আর আমাদের দেশ বেকার সমস্যাসঙ্কুল একটি দেশ। এই দেশে চাকরি যেখানে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, সেখানে কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেয়া আইন অমান্য করে পূর্ব ইনস্ট্রাকশন ব্যতিত কেউই মানবিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার সাহস পায় না । স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এ জন্য গার্ড বা যে কোনো কর্মচারীকেই সাধারণ আইন অনুসরণ করতেই হয়। এটি অনিবার্য। কিন্তু দুর্ঘটনার সময় জীবন বাঁচানোর জন্য নিরাপদে ও দ্রুত সকলকে কারখানার বাইরে বের করে দেবার মানবিক দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে পালন করার বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য।

ট্রাফিক জ্যাম: ট্রাফিক জ্যামের কারণে যথাসময়ে কারও পক্ষেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের যানবাহনের চলাচলের সময়ও এটি ব্যতিক্রম নয়। আর যনজটের কারণে বিলম্বে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পৌঁছতে আগুনের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মানুষ-পশু সকলের জীবন ও বিপুল সম্পদ ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং অগ্নিকাণ্ড থেকে জন, জনগোষ্ঠী ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেক।

পরিবেশ: (১) ঘরবাড়ি নির্মাণের সময় অগ্নিকাণ্ডসহ সকল দুর্ঘটনারোধ করার বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখলে বিষয়টি সহজ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে।

২) প্রত্যেক ভবন বা মার্কেটের পার্শ্বে বা অভ্যন্তরে ন্যূনতম ২০০০-২৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পানির ট্যাংক নির্মাণ করা জরুরী। যাতে অগ্নিকাণ্ড ঘটার সময় সহজে এখান থেকে পানি ব্যবহার করা যায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। আবার এসকল পানির ট্যাংক ভবনের কাছে এমন স্থানে নির্মিত হওয়া আবশ্যক যেখান থেকে অগ্নিকাণ্ডে এবং অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনীয় কাজে সহজে ও দ্রুততম সময়ে পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৩) প্রত্যেক এলাকায় ১-২ কিলোমিটার এর মধ্যে পুকুর বা জলাধার রাখা অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। এটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনাযোগ্য যে, সাধারণ অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণে পানি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। আর এ কাজের জন্য প্রয়োজন পানির সহজলভ্যতা। প্রত্যেক এলাকায় পুকুর বা জলাধার খননের বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে পারেন। জলাধারে সংরক্ষিত পানি আশেপাশের কিছু এলাকার মাটির আর্দ্রতা, পরিবেশের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। এসব জলাধারের পানি সময়ে সেচ কাজেও ব্যবহৃত হতে পারে।

৪) যে সকল স্থানে সাধারণ যন্ত্রপাতিসহ ফায়ার সার্ভিসের সেবকবৃন্দ পৌঁছাতে অক্ষম হন, সে সকল স্থানে কাজ করার জন্য উন্নত ও উপযুক্ত সরঞ্জাম ক্রয় করে সময়ে সে সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৫) ফায়ার সার্ভিসের জনবলের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্বরিৎ অপারেশন সম্পন্ন করা দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আর এই শর্ত পূরণের জন্য নির্মিত সকল মার্কেট, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কার্যালয়, ধর্মীয় উপাসনালয় ও আবাসিক এলাকার অলিগলি যথেষ্ট প্রশস্ত করার পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক। নির্মিতব্য ভবন, শিল্প এলাকা, মার্কেট, আবাসিক এলাকা, ধর্মীয় উপাসনালয় প্রভৃতির প্ল্যান ও ডিজাইনে এই বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কিনা, সেটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করলে আগামীতে দুর্ঘটনার সংখ্যা ব্যাপকহারে হ্রাস পেতে পারে।

ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের সময় নষ্ট না করা:

ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী ও ত্বরিৎ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হয়। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই এদেরকে মিসগাইড বা বিনা প্রয়োজনে অথবা শুধুই বালখিল্যতা প্রদর্শনের জন্য ডেকে নেয়া গর্হিত অপরাধ। সমাজের কোনো মানুষই যেন এই কাজটি না করেন। এতে অনেক ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করা সম্ভব না হলেও সকলেরই বুঝা দরকার যে, যে সময়ে ফায়ার সার্ভিসের জনবলকে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হয়, সে সময়ে প্রকৃতই কোথাও দুর্ঘটনা ঘটলে সেই দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনা জটিল হয়ে যায়, যা বহু জনপ্রাণির মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটায় ও বিপুল সম্পদ ধ্বংস করে দিতে পারে। সুতরাং ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের জনবলকে কোনো অবস্থাতেই বিনা প্রয়োজনে বা খুব ক্ষুদ্র দুর্ঘটনা, যা সহজে নিজেরা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, সে সকল অঘটনে ডেকে আনা মোটেও সমীচীন নয় (ব্যতিক্রম হতে পারে)। এক্ষেত্রে অবশ্য দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে কোনো দুর্ঘটনার সময় ফায়ার সার্ভিসের জনবলের সর্বপ্রথম দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর ও প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা। এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলেও অনেক সময় যথাসময়ে এই ডিপার্টমেন্টের লোকজনের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি প্রকাশ ও প্রচার করা হয় না। এটি তাদের জন্য দুঃখজনক। যা তাদের উৎসাহ হ্রাস করার প্রয়াস পায়। অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ/ কাজের স্বীকৃতি ও প্রচার সকল কাজের মূল্যায়ন হওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ সব বাস্তবায়নে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের উৎসাহ ও কর্মস্পৃহা বাড়িয়ে দিতে পারে। যা থেকে অধিকতর দক্ষ ও উন্নত সেবা নিশ্চিত হতে পারে।

ফায়ার সার্ভিসের সেবা জনগণকে অবহিত করা :

অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ/ফায়ার সার্ভিস বিভাগের সাথে দুর্ঘটনার সময় তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগের সুবিধার জন্য বা দ্রুত সহজে যোগাযোগের জন্য প্রত্যেক এলাকায়/মহল্লায় বা শহর/বন্দর গঞ্জের জনবহুল স্থানে ও সহজ দর্শনীয় স্থানে এ বিভাগের টেলিফোন নম্বর, ডিউটি অফিসারদের ফোন নম্বর বড় আকারে বিলবোর্ড করে লিখে রাখা যায়। জনগণ যাতে আত্মবিশ্বাসের সাথে এ নম্বর প্রয়োজনে ব্যবহার করে, সে বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। একইসাথে আইনশৃঙ্খলা বিভাগের টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর প্রদর্শন করা যায়।

সহযোগিতা করা ও হিংসাত্মক প্রবণতা পরিহার করা:

অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের জনবলকে অপারেশনের সময় সহযোগিতা করা সকলেরই সামাজিক দায়িত্ব। যে কোনো দুর্ঘটনারই দ্রুত ও নিরাপদতর সমাধানের জন্য পারিপার্শ্বিকতার সহযোগিতা অপরিহার্য। দুর্ঘটনাস্থলের রাস্তা দেখিয়ে দেয়াসহ দুর্ঘটনার সময় আশেপাশের সকলে যদি মানবিক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসে, তবে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনা খুবই সহজ হয়। দুর্ঘটনার সময় যে কোনো কারণেই হোক না কেন, হিংসাত্মক ভূমিকা দুর্ঘটনার ভয়াবহতা আরও বাড়িয়ে দেয়। চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অনেক নিরীহ মানুষ প্রাণি ও সম্পদ।

প্রশিক্ষণ:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স- এর প্রশিক্ষণে সমাজের সর্বস্তরে মানুষকে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে উৎসাহী করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট, স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজসেবা অধিদফতর যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। যুবক ও স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা যায়।

সুশৃঙ্খলা বজায় রাখা:

যে কোনো স্থানে দুর্ঘটনা ঘটলে সুশৃঙ্খলভাবে সেই স্থান ত্যাগ করা দুর্ঘটনার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যে কোনো স্থানে বা যে কোনো যানবাহনে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে দ্রুত শৃঙ্খলার সাথে দুর্ঘটনাকবলিত স্থান বা যানবাহন ত্যাগ করা খুবই জরুরী।

শিক্ষা:

অশিক্ষিত জনগণ অপেক্ষা শিক্ষিত জনগণকে যে কোনো বিষয়ে শিক্ষা দেয়া সহজ। অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যও তাই শিক্ষিত জনগণের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। অনেক সময় অশিক্ষিত জনগণ ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের বিষয়ে আন্তরিক না হয়ে তাদের প্রতি হিংসা ও অমানবিক আচরণ করে, যা সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে আরও বেশী ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়। এটি যেন কখনই না ঘটে, সেদিকে সমাজের সকলেরই সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্চনীয়।

অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্পর্কে জানা:

সর্বস্তরের মানুষকে আগুন নিভানোর পদ্ধতির বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান দিয়ে এবং সেই জ্ঞান প্রয়োগে সচেতনতা, আগ্রহ, তৎপর হতে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। এছাড়াও অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াদির উপর সফল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিম্নোক্ত নির্দেশনা ও পরামর্শ অবশ্য পালনীয়।

১) রান্নার পর চুলার আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলুন।

২) বিড়ি বা সিগারেটের জলন্ত অংশ নিভিয়ে নিরাপদ স্থানে ফেলুন।

৩) ছোট ছেলেমেয়েদের আগুন নিয়ে খেলা থেকে বিরত রাখুন।

৪) খোলা বাতির ব্যবহার কমিয়ে দিন (এ ধরণের বাতি ব্যবহার না করাই ভাল)।

৫) অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিশিয়ান দ্বারা নিয়মিত ভবনের বৈদ্যুতিক ক্যাবল ও ফিটিংস পরীক্ষা করুন।

৬) হাতের কাছে সব সময় দুই বালতি পানি ও বালু মজুদ রাখুন।

৭) বাসগৃহ, কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপনী যন্ত্রপাতি স্থাপন করুন এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা ব্যবহার করুন।

৮) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে অগ্নিপ্রতিরোধ, নির্বাপন, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন। প্রতিটি শিল্প কারখানা ও

সরকারি- অসরকারি ভবনে অগ্নিপ্রতিরোধ ও নিবাপন আইন- ২০০৩ ও বিধিমালা ২০১৪ অনুযায়ী অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন।

৯) স্থানীয় ফায়ার ষ্টেশনের ফোন নম্বর সংরক্ষণ করুন এবং যে কোন জরুরী অবস্থায় সাহায্যের জন্য সংবাদ দিন।

১০) রোগী পরিবহনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের এ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ করুন।

১১) অগ্নিকাণ্ডের স্থান হতে কাগজপত্র কাপড় ও অন্যান্য দাহ্যবস্তু যথাসম্ভব দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে দূরে সরিয়ে ফেলুন।

১২) গায়ের জামা কাপড়ে আগুন লাগলে দৌড়াদৌড়ি না করে মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নিভানোর চেষ্টা করুন।

১৩) সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখুন। করণীয় সকল কাজ ধৈর্য্য ও নিরাপত্তার সাথে দ্রুত সম্পন্ন করুন।

পরিশেষেঃ

সচেতনতা, মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সমস্যার কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানা, প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান অর্জন ও তার যথার্থ প্রয়োগ সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, পেশাগত দায়িত্ব পালনে অধিকতর আন্তরিক হওয়া ও জনগণের আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা অনেক সমস্যারই অতিদ্রুত ও নিরাপদতম সমাধান দিতে পারে।

২। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ১৯/০৫/২০১৭খ্রিঃ
৩। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ১৮/০৬/২০১৭ খ্রিঃ
৪। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ১২/০৭/২০১৭ খ্রিঃ
৫। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ১৬/০৭/২০১৭ খ্রিঃ
৬। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ১৭/০৭/২০১৭ খ্রিঃ
৭। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ১৯/০৭/২০১৭ খ্রিঃ
৮। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ০৫/০৮/২০১৭ খ্রিঃ
৯। বাংলাদেশ প্রতিদিন তারিখ- ১৫/০৯/২০১৭ খ্রিঃ
১০। বাংলাদেশ প্রতিদিন তারিখ- ২১/০৯/২০১৭ খ্রিঃ
১২। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ২৬/১১/২০১৭ খ্রিঃ
১৩। বাংলাদেশ প্রতিদিন তারিখ- ১৯/১২/২০১৭ খ্রিঃ
১৪। বাংলাদেশ প্রতিদিন তারিখ- ২৬/১২/২০১৭ খ্রিঃ
১৫। এন টি ভি তারিখ- ২৯/১২/২০১৭খ্রিঃ
১৬। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ২৯/০৩/২০১৮ খ্রিঃ
১৭। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ০১/০৪/২০১৮ খ্রিঃ
১৮। বাংলাদেশ প্রতিদিন তারিখ- ৩০/০৪/২০১৮ খ্রিঃ
১৯। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ১০/০৫/২০১৮খ্রি.
২০। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ২০/০৬/২০১৮খ্রিঃ
২১। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ২৫/০৭/২০১৮খ্রিঃ
২২। অগ্নি প্রতিরক্ষা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৬।
২৩। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ-০৬/০৮/২০১৮খ্রি.
২৪। গুগল, ফেসবুক তারিখ- ২৬/১১/২০১৮খ্রি
২৫। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ০৭/০৫/২০১৮খ্রি.
২৬। বাংলাদেশ প্রতিদিন তারিখ-৩০/০৩/২০১৯খ্রি.
২৭। গুগল তারিখ- ১৫/০৬/২০১৯খ্রি.
২৮। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ১২/১২/২০১৯খ্রি.
২৯। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ০৬/০১/২০২০খ্রি.
৩০। গুগল তারিখ- ০৭/০১/২০২০খ্রি.
৩১। বাংলাদেশ প্রতিদিন তারিখ- ১২/০১/২০২০খ্রি.
৩২। দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ- ১০/০১/২০২২ খ্রি.

তথ্য সংগ্রহ, সমার্থক সংবাদ প্রকাশ এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ-

১। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর, টাঙ্গাইল ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা।

সন্ত্রাস দমনে করণীয়

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ঘাতক ব্যাধি যেমন বিশাল জনগোষ্ঠীকে ধ্বংসের দরজায় ঠেলে দেয়, বাংলাদেশে সন্ত্রাসও তেমনি দানবীয় থাবায় সর্বস্তরের মানুষের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। সমগ্র দেশে প্রতি মাসে গড়ে ৮৫-৯০ জন মানুষ খুন হয়। তার মধ্যে শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকাতে প্রতিমাসে গড়ে ২১ জন মানুষ খুন হয়। সহিংসতায় গত ২০১৫ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ৪৪ জন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছেন। গত ১/৭/২০১৬ খ্রি. তারিখ রাতে ঢাকার গুলশানে অবস্থিত হলে আর্টিজান রেঁস্তোরায় সন্ত্রাসীদের হামলায় ২২ জন মানুস নিহত হয়। উদ্ধার অভিযানে ২ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়। পুলিশের পাল্টা অভিযানে ১ জন সন্দেহভাজনসহ ৬ জঙ্গী নিহত হয়। পুলিশ সদর দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৫ বছরে সারাদেশে খুনের ঘটনা ঘটেছে ১৬ হাজার ৯৭৪টি। একই সময়ে রাজধানীতে খুন হয়েছে ১ হাজার ১২ জন।

এর মধ্যে অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডই বীভৎস ও রোমহর্ষক। এর মধ্যে ২০১৭ সালে বিভিন্ন ঘটনায় খুন হয়েছে ৩ হাজার ৫৪৯ জন। ২০১৬ সালে ৮৭৯ জন, ২০১৫ সালে ৪ হাজার ৩৫ জন, ২০১৪ সালে ৪ হাজার ৫২৩ জন, ২০১৩ সালে ৩ হাজার ৯৮৮ জন খুন হয়েছে। গত ২০১৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ৫ বছরে শুধু রাজধানীতে খুন হয়েছে ১ হাজার ১২ জন এর মধ্যে ২০১৭ সালে ২১৮ জন, ২০১৬ সালে ৪৮ জন, ২০১৫ সালে ২৩৯ জন, ২০১৪ সালে ২৬২ জন, ২০১৩ সালে ২৪৫ জন। সন্ত্রাসের কি ভয়াবহ চালচিত্র। সন্ত্রাস নামক এই দানবকে রুখতে না পারলে আমরা দিনে দিনে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়বো। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে উপহার দিয়ে যাবো এক চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সামাজিক অবস্থা। অথচ শিক্ষিত ও যোগ্যতর পূর্বসুরি হিসাবে আমাদের অবশ্য কর্তব্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সুখী সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল, নিরাপদতর ও উন্নয়নমুখী সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দেশের উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখা ও উন্নততর সামাজিক অবস্থা গঠনের জন্য সন্ত্রাস দমন ও নির্মূল অপরিহার্য।

এ জন্য আমাদের প্রত্যেকের এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা অর্থাৎ গবেষণা করা এবং গবেষণা লব্ধ ফলাফল বাস্তবায়নের নিমিত্তে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। কারণ এটি সত্য যে, দেশ ও জনগণের জন্য কল্যাণকর ও উন্নয়নমুখী কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক অবস্থা। আর স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক অবস্থার জন্য অবশ্যই সর্বপ্রথম সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা অত্যাবশ্যক। এটির কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশের মানুষের একটি সাধারণ ধারণা রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য যে কোনো কল্যাণকর ভূমিকা গ্রহণ করবে সরকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নের যে কোনো কার্যক্রমের সফলতায় শুধু সরকারের ভূমিকাই যথেষ্ট নয়। বিশ্বের যে সকল রাষ্ট্র উন্নতির শীর্ষে অবস্থান করছে তাদের প্রতিটি রাষ্ট্রেই উন্নয়নের জোয়ারে সরকারের পাশাপাশি রাষ্ট্রের সকল স্তর থেকে ফলপ্রসূ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের দেশেও অবশ্যই সামাজিক স্থিতি ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বস্তরের মানুষের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তবেই সন্ত্রাস নামক এ দানবের হাত থেকে দেশও জাতি রক্ষা পেতে পারে। এ বিষয়ে সরকারি ও অসরকারি উভয় পর্যায় থেকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকগণ গ্রহণ করতে পারেন।

১। সন্ত্রাস একটি সামাজিক সমস্যা। এই সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য যারা এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন, অভিজ্ঞ হন এবং গবেষণা করেন অর্থাৎ যারা সমাজবিজ্ঞানী তাদের সুপারিশ ও কার্যকরী পদক্ষেপই সর্বপ্রথম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা উচিত। আর এই সামাজিক সমস্যা, এই সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করার জন্য সমাজ বিজ্ঞানীগণেরও দেশ এবং জাতির প্রতি সর্বোচ্চ দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা অবশ্য কর্তব্য।

২। সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ। একটি অপরাধ আরেকটি অপরাধী বা ব্যক্তি। সন্ত্রাস করার প্রবণতা মানুষের চিন্তা-চেতনার ভিতরে অবস্থান করে। আর যার ভিতরে সন্ত্রাস করার প্রবণতা থাকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সেই সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়। আমাদের দেশে সন্ত্রাস করে যুব সম্প্রদায়। তাদের মন, চিন্তা-চেতনা থেকে সন্ত্রাস করার প্রবণতা দূর করা আবশ্যক। কেন একজন সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনার মানুষ সন্ত্রাস নামক দানবকে নিজের ভিতরে আশ্রয় দেয়, তার কারণ খুঁজে বের করা দরকার। এটি এজন্যই জরুরী যে, কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সমস্যার কারণ খুঁজে বের করা ও তা চিহ্নিত করা। সমস্যার কারণ খুঁজে বের করে চিহ্নিত করতে না পারলে সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ, জীবনের ইতিহাস, মন-মানসিকতা পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝা যায় যে, সন্ত্রাসের সাথে জড়িত বিপথগামী যুবকদের অধিকাংশই কোনো না কোনো ভাবে হতাশাগ্রস্থ। কোন এক অসুরিক শক্তি যেন যুব সমাজের অনেকেরই আশা আকাঙ্ক্ষা দাবিয়ে রেখে তাদের ভিতরে হতাশার অন্ধকারের বীজ বপন করে গেছে। সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত হচ্ছে সন্ত্রাস নামক সমাজ ও মানব জীবন হরণকারী এক দুর্হনন উদ্ভিদের । যা দিনে দিনে বিশাল রাক্ষুসে মহীরুহের আকারে বেড়ে উঠেছে। আর বিষাক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ও ধ্বংসকারী শাখা-প্রশাখা ছাড়িয়ে আশেপাশের সকল নিয়মনীতি শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে এবং মানব সভ্যতা ধংস করে দেয়। যুব সমাজের মন থেকে এই প্রাণঘাতী ও শান্তিশৃঙ্খলা সংহারী মহীরুহের বীজ সমূলে উৎপাটন করে, সেই অন্ধকারে জ্বেলে দিতে হবে ভবিষ্যত জীবনের সুন্দর স্বপ্ন ও উন্নততর জীবনযাত্রা পরিচালনা করার আশা-আকাঙ্ক্ষা । উৎসাহ উদ্দীপ্ত করতে হবে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করাসহ অন্যের জন্য শান্তিপূর্ণ সামাজিক অবস্থা সৃষ্টির নির্মল ও দৃঢ়

প্রত্যয়। তাদের মনে সৎ, সুন্দর, কল্যাণকর কাজের অদম্য আগ্রহ জাগ্রত করা আবশ্যক।

৩। উন্নত রাষ্ট্রসমূহের মত আমাদের দেশেও শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দেয়ার বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। মানুষের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ এবং কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা খুবই প্রয়োজন। যেন সৎ উপার্জিত পারিশ্রমিকের দ্বারা মানুষ উন্নততর জীবন ব্যবস্থা গঠন করতে পারে। তবেই আমাদের দেশের সকল শ্রেণির মানুষের মন থেকে বিশেষত উঠতি বয়সের যুব-কিশোর বা যুব সম্প্রদায় ও ছাত্র-সমাজের ভিতর থেকে অন্যায়ের পথে পা বাড়ানোর প্রবণতা দূর হতে পারে।

৪। রাজনৈতিক ব্যক্তিগণই দেশের সমাজ, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি ও শিল্পনীতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি সন্ত্রাসের ভিত্তিতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়, তাহলে সেই রাজনৈতিক ব্যক্তির কাছে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কখনই সামাজিক উন্নয়ন ও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো অবদান আশা করা যায় না। এ কারণে কোন সন্ত্রাসকারী বা সন্ত্রাসে মদদ যোগানো ব্যক্তিকে রাজনৈতিক দলে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিক শক্তি দেশের সবচেয়ে বড় প্রভাবশালী শক্তি। সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসে মদদদানকারী ব্যক্তিগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তিকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসের কাজে, যা নিয়ন্ত্রণ করা এমনকি যে কোনো সরকারের পক্ষেও দুঃসাধ্য। সুতরাং দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যেন কোনো অবস্থাতেই কোনো সন্ত্রাসী রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভূক্ত না হয়। সন্ত্রাসীর কোনো দল থাকতে পারে না। সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। এই উক্তি দুটি দৃঢ় ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। কোনো দলে কোনো সন্ত্রাসী থাকলে সে যেই হোক না কেন, তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করার ব্যবস্থা নেয়া অতি জরুরী। প্রত্যেক রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসারী ব্যক্তিগণ যেন এই ধারণা সর্বসময় পোষণ করেন যে, মানবসমাজকে অন্যায়-অবিচার, অনিরাপত্তা থেকে রক্ষা করার জন্যই তাদের রাজনীতিতে আগ্রহী হওয়ার একমাত্র কারণ। সন্ত্রাস নামক বিধ্বংসী দানবকে আশ্রয় প্রশ্রয় ও লালন-পালন করার জন্য নয়। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়, যুব সম্প্রদায়ের যারা সন্ত্রাসের ধ্বংসাত্মক পথে পা বাড়ায়, তাদের অধিকাংশই নিজেদের পরিবারের কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, এরা নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির দ্বারা, অথবা নীতিভ্রষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতিবিদগণ নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে পারেন।

(ক) রাজনৈতিক দলের কোনো সদস্য বা সমর্থক যাতে লঞ্চ/বাস টার্মিনাল, হাট/বাজার, জল-মহল টোল আদায়ের স্থান, আহ্বানকৃত দরপত্র এবং অন্যান্য অর্থ যোগানকারী স্থান/উৎস অনিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণে না নেয় সেদিকে দলের স্থানীয় ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের অবশ্যই কঠোর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। উল্লেখিত দরপত্র ও স্থান যাতে নিরঙ্কুশ, নিরপেক্ষ বিধিবদ্ধভাবে উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হয়, সে বিষয়ে সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিক ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বিষয়টির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে।

(খ) সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নিবিড়ভাবে জড়িত। সন্ত্রাস ব্যতীত চাঁদাবাজি হয় না। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে মারাত্মক ক্ষতি করার হুমকি দেওয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে চাঁদা দিতে অস্বীকারকারীকে সামাজিকভাবে অপমান, শারীরিক নির্যাতন এবং এমনকি হত্যা করা হয়। এ অপরাধের সাথে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বিভাগের অসাধু জনবল, অনেক প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতা জড়িত থাকে। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাঁদাবাজির কোন প্রতিকার হয় না। মানুষ নিরবে ও গোপনে নিজের উপার্জিত আয়ের বড় অংশ চাঁদাবাজদের দাবী অনুযায়ী দিতে বাধ্য হয়। চাঁদাবাজির কারণে স্বাভাবিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে যত চাঁদাবাজি হয় তার মধ্যে শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকা শহরের বাজারসমূহে প্রতিদিন ৫ কোটি টাকা চাঁদাবাজি হয়। এ চাঁদার টাকা স্থানীয় রাজনীতিবিদ, ছাত্র সংগঠন ও ধরাছোয়ার বাইরে থাকা গডফাদারদের পকেটে চলে যায়। অন্যায় ভাবে ও হুমকি দিয়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে নেওয়া জঘন্য অপরাধ এবং নিজের জন্যও সম্মানহানীকর। মানুষকে এটি শিক্ষা দেওয়া চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে। জনগণের চাঁদা প্রদান ও চাঁদাবাজ বিরোধী মনোভাব, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগের কঠোর ও নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগ সর্বোপরি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চাঁদাবাজি প্রশয় না দেওয়া ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধী পদক্ষেপ এ অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

(গ) রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো ক্ষমতা গ্রহণের জন্য কোনো দলের কোনো সদস্য, সমর্থক বা নেতৃত্ব যেন সন্ত্রাস বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ না হন এবং দলের ও দেশের সার্বিক কার্যক্রম যাতে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুসম্পন্ন হয়, সেদিকে প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতৃত্বের লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। এটি সত্য যে, ক্ষমতার অপব্যবহার নিজ দলের এমন কি রাষ্ট্রেরও ধ্বংস ডেকে আনে। ক্ষমতার যথার্থ ব্যবহার শুধু রাজনৈতিক দলের জন্য নয়; বরং সর্বস্তরের সামাজিক কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

(ঘ) রাজনৈতিকভাবে সর্বস্তরে গণতন্ত্রের স্রোত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রমের গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রাখা এবং এই স্রোতকে আরও বেগবান করার বিষয়ে প্রত্যেকেরই সক্রিয় হওয়া সন্ত্রাস দমনসহ দেশ ও জাতীয় উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

(ঙ) সাংসদগণের নিজ এলাকায় অবস্থান করে এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা সন্ত্রাস দমনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যে সাংসদের এলাকার সন্ত্রাসের ঘটনা প্রকৃতই সর্বনিম্ন হবে তাকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করার এবং

যার এলাকায় সন্ত্রাসের ঘটনা সর্বপেক্ষা বেশি হবে তাকে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করাসহ পরবর্তী টার্মে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ না দেয়ার বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়। তবে এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

(চ) রাজনৈতিক শক্তিই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। কাজেই রাজনৈতিক ভাবে সন্ত্রাস মদদ ও প্রশ্রয় দিলে সন্ত্রাস নির্মূল সম্ভব হয় না। অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাবে সমর্থিত সন্ত্রাস অপ্রতিরোধ্য হয়। তাই কোন অবস্থাতেই যেনো কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি দ্বারা সন্ত্রাস সমর্থন না পায়। প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যক্তির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রকৃতই কঠোর অবস্থান নেওয়া আবশ্যক।

(ছ) কোনো অঞ্চলে রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাস ঘটলে সেই অঞ্চলের সংসদ সদস্য এবং বিরোধী দলীয় নেতৃত্ব উভয়কে সংসদে এ বিষয়ে জবাবদিহি করার বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এই বিষয়ে রাষ্ট্রের/দলের উচ্চপর্যায়ের নেতৃবৃন্দের আন্তরিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। জবাবদিহির চর্চা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক এমনকি রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

(জ) রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ যাতে নিজে সন্ত্রাস থেকে বিরত থাকে ও অন্যদেরকেও বিরত থাকতে উৎসাহিত করেন সে লক্ষ্যে তাদের সুশিক্ষার দিকে নেতৃবৃন্দের সচেতন থাকা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক রাজনৈতিক সদস্যের সাধারণ শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দলীয় সদস্যগণ যাতে মানবতাবোধ অর্জন করতে পারে ও সুসভ্যতা অনুসারী হয় সে বিষয়ে তাদের মানসিকতা গঠন করার লক্ষ্যে দলের অভ্যন্তরেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক রাজনৈতিক দল যেন সদস্যবৃন্দকে রাজনৈতিক নীতি আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার সাথে জনমানুষের শান্তি-স্বস্তি, নিরাপত্তা, সংরক্ষণ, নিজের চরিত্র গঠন ও ব্যক্তি জীবনে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শিষ্ঠাচার শিক্ষা দেওয়ার ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট হয়। তবেই রাজনৈতিক কর্মীদের সন্ত্রাস করার ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার প্রবণতা জনগণের আশানুরূপ সুনিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে। রাজনীতি হতে পারে কলুষমুক্ত ফলে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের প্রতি জনমানুষের শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। দেশে-বিদেশে তারা অনুসরণীয় হতে পারেন।

ঝ) বৃহত্তর শক্তির সমর্থন ব্যতীত কোন ক্ষুদ্র অস্তিত্বই ক্ষমতাশালী হয় না। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দুঃশাসন ইত্যাদিসহ সকল বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম সৃষ্টি প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনাযোগ্য। আবার অন্যায় অসুন্দর, অসত্য, বর্বরতা, পাশবিকতা দমন করে সত্য ন্যায়, সুশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা সুন্দর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ লাভের জন্যও এটি সমান প্রযোজ্য। অর্থাৎ ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষমতাশালী হয়ে অন্যের উপর বা তার চেয়ে বৃহৎ কোন কিছু উপর প্রভাব বিস্তার করে অন্যায় ইচ্ছা বাস্তবায়নে তখনই সক্ষম হয় যখন ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বৃহত্তর কোন শক্তির সমর্থন পায়। আবার বিপরীত ভাবে অসত্য, অন্যায়, অসুন্দর ও ক্ষতিকর দমনে বড় শক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়ে ক্ষুদ্র শক্তি ক্ষমতাশালী হয়ে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও বিকশিত করতে পারে। কাজেই অকল্যাণকর ক্ষুদ্র অস্তিত্ব যেন বৃহত্তর শক্তিদ্বারা কখনই সমর্থিত না হয়। পক্ষান্তরে বৃহত্তর শক্তি যেন ক্ষুদ্র ও কল্যাণকর শক্তি দিয়ে সমর্থন যোগায় এবং সে সমর্থন অব্যাহত রাখে। তাহলেই সমাজ সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অসামাজিক কার্যকলাপসহ বহু অপরাধমুক্ত থাকতে পারে।

৫। সন্ত্রাসী সর্বসময় সকলের কাছে পরিত্যাজ্য। তাকে সমাজ ও পরিবার উভয় ক্ষেত্র থেকেই বয়কট করা প্রয়োজন। একজন সন্ত্রাসী যেমন সমাজের কাছে অপরাধী ও তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা প্রয়োজন, তেমনি পরিবারের কোনো সদস্যও যদি সন্ত্রাসের পথে পা বাড়ায়, তবে তাকে পরিবার থেকে বহিষ্কার করা সমান জরুরী। তবে বিপথগামী সদস্যকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিকভাবে ও সমাজের অন্যদের সহযোগিতায় সংশোধনের চেষ্টা করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিপথগামী মানুষটিকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সকলে সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে শোধরানোর চেষ্টা করলে অনেক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যেতে পারে। একান্তই যদি পরিবারে কোনো সদস্য সন্ত্রাসের পথ পরিহার না করে, তাহলে তাকে কোনো ধরনের প্রশ্রয় না দিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মায়া-মমতা উপেক্ষা করে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নিকট ধরিয়ে দেয়াই শ্রেয়তর।

৬। সন্ত্রাসীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তবে তারা সংগঠিত। আবার এটিও সত্য যে, কোনো এলাকার বিপুল সংখ্যক জনগণ যখন সুসংগঠিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসে, তখন সেই অঞ্চলের সন্ত্রাসীদের সংগঠিত শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। সন্ত্রাসমুক্ত হয় সেই অঞ্চল। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন জনগণের আত্মবিশ্বাসের উন্নয়ন ও সামাজিক সুশৃঙ্খলা রক্ষা করার সুদৃঢ় মানসিকতা। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, জনগণের একতাবদ্ধ শক্তি সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে গিয়ে সন্ত্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়। জনগণ যেন দেশ ও সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসন বিভাগকে সহযোগিতা করে মাত্র, আইন হাতে তুলে না নেয়।

৭। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার বিষয়ে প্রত্যেক নাগরিকেরই সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসা প্রয়োজন। স্মরণীয়, সন্ত্রাস একটি দুরারোগ্য সামাজিক ব্যাধি। আর এ ব্যাধিতে আক্রান্ত প্রত্যেকেরই উপযুক্ত প্রতিষেধক ও আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা না হলে এই ঘাতক সামাজিক ব্যাধি গ্যাংগ্রিনের মতো সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। পরিণামে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ধ্বংসসহ সমাজের স্বাভাবিক গতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

৮। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের অবশ্যই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। সমাজে যারা চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত তাদেরকে যেন

কোনো অবস্থাতেই জন প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা দেয়া না হয়। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সমাজের প্রকৃত শিক্ষিত, সৎ, সমাজকর্মী, জনকল্যাণমূলক চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করা অত্যাবশ্যক। মাননীয় সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যাতে কোনো অসাধু ব্যক্তি অসাধু পন্থায়/হুমকি দিয়ে মনোনয়ন গ্রহণসহ নির্বাচনে নির্বাচিত হতে না পারে। তবেই এটির বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে। অসাধু ব্যক্তি যদি নির্বাচনে জয়ী হয়, তাহলে সন্ত্রাসসহ সকল সামাজিক অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পায়ই।

৯। যেহেতু সন্ত্রাস মানুষের অপরাধ প্রবণতা থেকে সৃষ্ট সুতরাং সন্ত্রাসী গ্রেফতার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে যাতে তাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন হয় এবং শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে তারা যাতে পুনঃসন্ত্রাসের সাথে জড়িত না হয়; এ বিষয়ে তাদের আত্মিক উন্নয়নের শিক্ষা দেয়া ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরী। ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করার বিষয়টি এখানে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা যায়। এ বিষয়টি শাস্তি ভোগরত অপরাধীর ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১০। সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ চাঁদাবাজি। চাঁদাবাজির লক্ষ্যে নিজ প্রভাব বহাল রাখার জন্য একেক এলাকায় একেকজন গডফাদার থাকে । এসব গডফাদারের আবার বড় ক্ষমতাবান গডফাদার থাকে। বড় গডফাদারেরা ছোট গডফাদারদের চাঁদাবাজির বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করে। প্রভাব বিস্তার করার জন্য এবং নিজ এলাকায় অন্যকারও হস্তক্ষেপ বা কর্তৃত্ব মুক্ত রাখার জন্য গডফাদারেরা সন্ত্রাসী বাহিনী লালনপালন করে। কোনো গডফাদারের এলাকায় অন্য গডফাদার হস্তক্ষেপ করলে সে এলাকার গডফাদারের সাথে ভয়াবহ সন্ত্রাস সংঘটিত হয় । এতে এক বা বহু জীবন বিনষ্ট হয় । আবার সাধারণ মানুষের সম্পদ-সম্পত্তিও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের সময় সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের আঘাতে ও গোলগুলিতে নিরীহ নিরঅপরাধ মানুষও আহত ও নিহত হয় । চাঁদাবাজির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কারণে অনেক সৎসাহসী মানুষও ক্ষতিগ্রস্থ হন। এমনকি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। চাঁদাবাজির কারণে যে কোনো পেশায় নিয়োজিত অনেকেই আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অসৎ বা অবৈধ পথে অর্থসম্পদ উপার্জনে আগ্রহী হয় । আবার চাঁদাবাজির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা ক্ষতির সম্মুখীন হলে সরকারি অসরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী ঘুষ দুর্নীতিতে জড়িত হয় । এসবই সামাজিক অবক্ষয় এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং রাজনীতিতে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি লালন করার কারণে হয়। সামাজিক অবক্ষয় রোধ, আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন, শান্তি শৃঙ্খলা সংরক্ষণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে দুর্নীতি ঘুস রোধে এবং সর্বোপরি রাজনীতিতে স্বচ্ছতা ও নিষ্কলুসতা প্রতিষ্ঠা করে সরব নীরব সকল ধরনের চাঁদাবাজি বন্ধ করা আব্যশক।

১১। মানুষের ভিতরে বিবেক ও পাশবিক ইচ্ছা পাশাপাশি অবস্থান করে। যখন পাশবিক শক্তি বিবেক-বিবেচনা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়, তখন মানুষ বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। আর বিভিন্ন ধরনের অপরাধের মধ্যে ভয়াবহ অপরাধ হলো সন্ত্রাস। সামাজিক অবস্থা যদি এমন হয়, যাতে পশুশক্তি বিবেকের চেয়ে শক্তিশালী হতে না পারে, তাহলে মানুষের সন্ত্রাসসহ অন্যান্য অপরাধ করার প্রবণতা ব্যাপকভাবে কমে যায়। মানুষের অন্যায় প্রবণতা দূর করার ক্ষেত্রে এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

১২। (ক) হত্যা, লুণ্ঠন, চাঁদাবাজি, সহিংসতা ইত্যাদি অপেক্ষা জঘন্যতম সন্ত্রাস হলো ধর্ষণ। এই জঘন্যতম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো মানুষের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়। আর এই অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হলো নীলছবি প্রদর্শন ও অশ্লীল দৃশ্য সম্বলিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং টিভি প্রোগ্রাম ও ফেসবুক। কারণ চলচ্চিত্র, টি.ভি ও ফেসবুক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচার ও প্রকাশ মাধ্যম। এই মাধ্যম দুটিতে যা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়, তা সহজেই মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এসবের সেন্সর খুব কঠোর শালীনতার অনুসারী হওয়া প্রয়োজন। কঠোরতম পদক্ষেপে বন্ধ করতে হবে নীলছবি প্রদর্শন ও এর ব্যবসা। তা নইলে যুবক ও যুব-কিশোর সম্প্রদায়ের চরিত্রের অবক্ষয় হতেই থাকে। আর একটি অন্যায় অনুসরণ করে অন্যান্য অপরাধও সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হবে। যা অনেক ক্ষেত্রেই বহু জীবনসংহারী সন্ত্রাসের আকার ধারণ করে। সুতরাং চলচ্চিত্র ও টি.ভি অনুষ্ঠান এমন হওয়া উচিত, যার মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন হয়। উন্মেষ ঘটে বিবেক বিবেচনার, মানুষ অপরাধকে ঘৃণা করতে শিখে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে জীবনযাপনে আগ্রহী হয়। অবশ্য অশিক্ষা, কুসংস্কার, নৈতিকতার অবক্ষয় আইনের অপপ্রয়োগ ও অপ্রয়োগও ধর্ষণ নামক এই জঘন্যতম অপরাধের জন্য দায়ী। আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চলচ্চিত্র ও টি.ভি (বিশেষত চলচ্চিত্রে) আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ভূমিকা এমনভাবে প্রদর্শন করা হয়, যাতে ঐ বিভাগের কর্মরত ব্যক্তিগণ মানুষের নিকট হাস্যকর চরিত্রে পরিণত হন। কোনো সামাজিক সমস্যা বা সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে পুলিশের আইনগত পদক্ষেপের দক্ষতা ও আন্তরিকতা এবং বুদ্ধিমত্তা এমনকি আইন বিভাগের যোগ্যতা, সঠিকভাবে অনুসন্ধান করার পদ্ধতি অপেক্ষা নায়ক-নায়িকার অলীক ও অবাস্তব কিছু ভূমিকা প্রদর্শন করা হয়, যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, আইন ও বিচার বিভাগের অযোগ্যতাই প্রকাশ পায়। এ কারণেও মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা সৃষ্টি হয়, যা প্রকারান্তরে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ডেকে আনার প্রয়াস পায়। কাজেই চলচ্চিত্রে ও টিভি প্রোগ্রামসমূহে পুলিশ, বিচার ও আইন বিভাগের ভূমিকা এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত যাতে উল্লেখিত বিভাগসমূহের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পায়। তবেই মানুষের অন্যায় ও সমাজ বিধ্বংসী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার পথ আশাব্যঞ্জকভাবে প্রসার হতে পারে।

(খ) বর্তমান সর্বশ্রেণির মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে। ফেসবুকে অনেক সময়ই অশ্লীল ছবি প্রদর্শণ করে পুরুষ নারীকে ও নারী পুরুষকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করে। এটি আপত্তিজনক। ফেসবুকে অশ্লীল ছবি প্রদর্শণের কারণে বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির মানুষই নৈতিকতাহীন আচার আচরণ করতে পারে। যা থেকে ধর্ষণ নামক ঘৃন্য ও বর্বর অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। এবং অপরাধ করার প্রবণতা অনেককেই আবেশিত করতে পারে। এটি রোধ করার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ ফেসবুক ব্যবহারের বিষয়ে সেন্সর করতে পারেন।

(গ) সব ধরণের অপরাধ স্থানে মানুষের নৈতিকতা উন্নয়ন াতি গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতা উন্নয়নের নিমিত্ত শিশু কিশোর বয়স থেকে মানুষকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া যায়। এ লক্ষ্যে শিশু কিশোরদেও শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ঘ) মানুষের অপরাধ প্রবণতা দমনের জন্য সুশিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ধর্মীয় অনুশাসন পালনের সাথে চরিত্র গঠনের শিক্ষা অতি বিবেচ্য বিষয়।

(ঙ) সামাজিক শিক্ষা ও সুষ্ঠু নিরাপদ অবস্থা মানুষকে ধর্ষণসহ অন্যান্য অপরাধ থেকে বিরত রাখে। কাজেই সকল ধরনের অপরাধ সংঘটিত না হওয়ার জন্য অপরাধ প্রবণতা রোধ হওয়ার জন্য এ বিষয়ে উন্নত সামাজিক ব্যবস্থা ও তার থেকে শিক্ষা গ্রহণের সামাজিক অবস্থা গঠন করা আবশ্যক। শুনেছি সারা বিশ্বে জাপানে সবচেয়ে কম নারী ধর্ষণের অপরাধ সংঘটিত হয়। এদেশেও এক্ষেত্রে তাদের এ ধরনের অপরাধ দমনের সামাজিক অবস্থা গঠন এবং অপরাধ দমনের কার্যক্রম অনুসরণযোগ্য হতে পারে।

(চ) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে আগত অনেক নারী নানা প্রলোভনে অসাধু/ভণ্ড ব্যক্তিদের অনুসারী বা সরাসরি অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ধর্ষণের শিকার হয়। সাধারণত সমস্যাগ্রস্থ নারীরা এসব অমানবিক আচরণের শিকার বেশি হয়। ভণ্ড ধার্মিকদের প্রবর্তিত আচার অনুষ্ঠানে এ অপরাধ বেশি ঘটে থাকে। কাজেই ধর্মের নামে অধার্মিক এবং আদর্শহীন কার্যকলাপের প্রবর্তক ভণ্ড সাধুদের আচার অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিলে বহুসংখ্যক নারী ধর্ষিতা হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। একই সাথে সর্বশ্রেণির মানুষকে ধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোতে আনা কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। এতে বিপুল সংখ্যক মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ থেকেও রেহাই পেতে পারে। স্মরণীয়, সকল ধর্মেই আদর্শহীন ও অন্যের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কাজেই সামাজিকভাবে মানুষকে নিরাপদে রাখার জন্য সকল ধর্মের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করে সকল ধর্মের আলোকে মানুষকে অন্যায় অসংযত আচারণ থেকে বিরত থাকতে এবং সচেতন হতে উৎসাহিত করা যায়। আবার সমস্যায় পতিত মানুষকে ধর্মের আলোকে সমস্যা থেকে উত্তোরণের পথ প্রদর্শন করা যায়।

(চ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ যেখানে বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষের একত্রিত হওয়ার সুযোগ থাকে বা বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষ একত্রিত হয় সেসব স্থানে অলক্ষ্যে অগোচরে অনেক নারী ধর্ষিতা হয়। আবার অনেকেরই পথভ্রষ্ট হওয়া ও পরিণতিতে ধর্ষিতা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এসমস্ত ক্ষেত্রে নারী বা অপরিপক্ক চিন্তাচেতনার অল্প বয়স্ক নারীর অভিভাবকগণের সচেতনতা খুবই প্রয়োজন। অবশ্য ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ ও নৈতিকতাপূর্ণ সংযত চিন্তাচেতনা ও কার্যকলাপ নারীকে ও নিজেকে ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। সর্বোপরি এসব আচার অনুষ্ঠানের স্থান ও সামগ্রিক কার্যক্রম কঠোরভাবে নজরদারিতে রাখলে বহু নারী ধর্ষণ হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে।

১৩। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করা আবশ্যক। আমাদের দেশে যুব সম্প্রদায়ের বিশাল অংশ বেকার। বেকারত্বের কারণে এদের অনেকেই বিপথগামী হয়ে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির পথ অনুসরণ করছে। ভেঙ্গে ফেলছে সামাজিক শৃঙ্খলার নিয়মনীতি। বিপন্ন বিপর্যস্ত হচ্ছে অসংখ্য মানুষ। দেশের আপামর জনগণ যাতে বেঁচে থাকার জন্য ও উন্নত জীবনযাত্রা পরিচালনা করার লক্ষ্যে কোনো অবস্থাতেই অপরাধের সাথে জড়িত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বেকারত্ব দূর করার নিমিত্ত কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি করাসহ আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রীয়ভাবে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সেই সাথে বৈধ শ্রমের মাধ্যমে মানুষ যাতে জীবনের মান আরও উন্নত করার সুযোগ পায়, সেদিকে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সফল বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা প্রয়োজন। শিক্ষা শেষে শ্রমের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে শ্রম অধিদফতর ও শিক্ষা অধিদফতর যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এই কার্যক্রমের আওতায় অধিক সংখ্যক কারিগরি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাসহ সকল স্কুল কলেজে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যায়। মানুষ যাতে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সরকারি ও অসরকারি উভয় পর্যায় থেকে সহজ শর্তে আর্থিক সহযোগিতা পায়- এই বিধান চালু করা যেতে পারে। আবার ঋণ অথবা আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীগণকে উৎসাহী করা যেতে পারে। ঋণ/আর্থিক সহযোগিতা গ্রহীতার গৃহীত প্রকল্পের উপযুক্ত ফলোআপ প্রদত্ত ঋণের যথার্থ ব্যবহার ও ঋণ পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে।

১৪। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ। যদিও একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সন্ত্রাসী ব্যক্তি আর সন্ত্রাস মানুষের প্রবণতা। শাস্তি প্রদানের জন্য সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখীন করার উল্লেখযোগ্য ৩টি কারণ থাকতে পারে-

(ক) একটি নির্দিষ্ট স্থানে সন্ত্রাসীদের অন্তরীণ রেখে অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখা এবং সাজার ভয়ে যাতে শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে পুনঃঅপরাধ করা থেকে বিরত থাকে।

(খ) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে বা অবগত হয়ে সমাজের অন্যরা অপরাধ করতে ভয় পায় ও অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

(গ) কারাগারে অন্তরীণ অপরাধীদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। অর্থাৎ কারাগারের অবস্থানরত সকল অপরাধী যাতে সাজা শেষ হওয়ারপর বা কারাগার ত্যাগের পর অপরাধ করা থেকে বিরত থেকে সুন্দর সুষ্ঠু জীবনযাপন করে সে লক্ষ্যে তাদেরকে কারিগরি এবং সদমানবিক গুণাবলী অর্জনের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়। এ লক্ষ্যে আদর্শ জীবনযাপনের বিষয়ে কারাগার অভ্যন্তরেই অপরাধীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। একই সাথে সাজা থেকে অব্যহতি পাওয়ার পর তাদেরকে পুনর্বাসনের উদ্যোগও নেওয়া যায়। এ লক্ষ্যে জেল কর্তৃপক্ষ নিজ পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। আবার সমাজসেবা অধিদফতর এবং বিভিন্ন অসরকারি সংস্থার সাথে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। গৃহিত পুনর্বাসন কার্যক্রমের ফলোআপ করলে বিষয়টি অধিকতর সাফল্য মণ্ডিত হতে পারে। কারাগার বন্দীশালা নয়, কারাগার হউক অপরাধ সংশোধন এবং পুনর্বাসনের সফল প্রতিষ্ঠান।

মানুষকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখার জন্য ৩টি বিষয়ই যথেষ্ট নয়। মানুষের অপরাধ করার প্রবণতা দূর করার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো সামাজিক আন্দোলন এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে নিম্নোক্ত বিষয়ে সচেতন করা যায়।

(১) মানুষ কখনই সন্ত্রাস করার জন্য জন্ম গ্রহণ করে না। সন্ত্রাসসহ যে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া মানুষের জন্য অত্যন্ত ঘৃণাজনক। সমাজ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী যে কোনো পদক্ষেপের জন্যই নষ্ট হয় মানব জন্মের সার্থকতা।

(২) প্রত্যেক অভিভাবকেরই উচিত তার অধীনস্থ কিশোর যুবক প্রত্যেকের সম্পর্কে উপযুক্ত খোঁজখবর রাখা এবং তাদেরকে সব ধরনের অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে সৎপথে পরিচালনা করা। সর্বোপরি প্রত্যেক অভিভাবকের নিজের সন্তান সন্তাততি ও পোষ্যদের প্রতি খেয়াল রাখা প্রয়োজন তারা যেনো নিজের জীবন সুন্দর ভাবে গঠনে চর্চা করে এবং একই সাথে পরিপার্শ্বিকতার অন্যরাও যেনো তাদের দ্বারা সুন্দর চিন্তা চেতনা নিয়ে বেড়ে উঠার সহযোগিতা পায়। এ বিষয়ে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ কঠোর ভাবে শাসন করা উচিত। শিশু-কিশোরগণ যাতে তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ করে বেড়ে ওঠতে পারে, যাতে তারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, নীতি জ্ঞানসম্পন্ন এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হয়, সেদিকে প্রত্যেক অভিভাবকেরই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এতে সময়ের ব্যবধানে ক্রমে ক্রমে সন্ত্রাসসহ সমাজের সকল অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূর হওয়ার পথ সুপ্রশস্ত হয়।

(৩) কোন অভিভাক তাদের সন্তানের খোঁজখবর রাখতে উদাসীন হলে অন্যরা এ ঔদাসীন্যতা কাটিয়ে উঠতে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে যেনো এগিয়ে আসেন।

(৪) প্রত্যেক পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের উচিত কনিষ্ঠজনের খোঁজ খবর রাখা, যাতে কেউ ছোট ছোট অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথেও জড়িত না হয়। সবারই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ক্ষুদ্র একটি অপরাধ করার সাথে সাথে এগিয়ে আসে আরেকটি বড় অপরাধ করার প্রবণতা। আর এভাবে আমাদের পরিবারের অনেকেই সমাজ সংহার মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে পরিণত হয় সন্ত্রাসীতে; বিপন্ন বিপর্যস্ত করে মানব সভ্যতা। সুতরাং সমাজের প্রত্যেকেই যদি কনিষ্ঠজনদের দিকে সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখেন, তবে অনেক কিশোর/যুবকই সন্ত্রাসীতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায় না। যা সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে ও সামাজিক সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে। উল্লেখ্য, যে পরিবারে অনুজগণ বয়োজ্যেষ্ঠগণের শাসন উপদেশ মেনে চলে, সেই পরিবারের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সমাজ যদি হয় একটি পরিবার আর এই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যদি কনিষ্ঠদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করার পদক্ষেপ নেন আর কনিষ্ঠগণ সেটা মেনে চলেন, তাহলে সেই সমাজের সন্ত্রাসসহ সব ধরনের শান্তি শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপ সুনিয়ন্ত্রণে থাকে, এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। অরাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরির মাধ্যমেও এই অধ্যায়ের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যায়।

(৫) এলাকায় এলাকায় সামাজিক পর্যায়ে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে কিশোর-যুবকগণকে সন্ত্রাসসহ সকল অপরাধ অন্যায় থেকে বিরত থেকে সুন্দর সু-শৃঙ্খল আদর্শ জীবনযাপনের শিক্ষা দেওয়া যায়। এতে তারা তাদের জীবনে সন্ত্রাস করা থেকে বিরত থাকাসহ অন্যান্য অন্যায় অপারধ থেকে দূরে থাকতে পারে। সামাজিক অবস্থাও সকলের জন্য নিরাপদতর হতে পারে।

১৫। (ক) শিশু-কিশোরদের সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত খেলাধুলা চর্চার ব্যবস্থা করা যা প্রত্যেক শিশু-কিশোরের শরীর স্বাস্থ্যের এবং মনমানসিকতার উন্নয়নে সহায়ক হয়। আর এ লক্ষ্যে প্রত্যেক ইউনিয়ন/ওয়ার্ডে একটি করে শিশুপার্ক ও জিমনেসিয়াম নির্মাণ করা যেতে পারে। শিশু-কিশোর-যুবকগণ যাতে পড়াশোনার অবসরে সেই পার্কসমূহে নিয়মিত খেলাধুলা করে ও গঠনমূলক কাজের চর্চা করে, সেদিকে প্রত্যেক অভিভাবকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সেই সাথে তাদেরকে সংস্কৃতির দিকে সমান আগ্রহী করা দরকার। স্মরণীয়, শিশু-কিশোররাই জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক। অবশ্যই তাদেরকে সুনাগরিক করে গড়ে তোলার জন্য সবাই সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। আর শিশু-কিশোরদের সুনাগরিক করে গড়ে তুলতে পারলেই সমাজের অনেক অনিয়ম, শান্তি-শৃঙ্খলা পরিপন্থী অবস্থার অবসান হতে পারে। উল্লেখ্য, যে শিশু সুস্থ-স্বাভাবিক, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে, ওঠে সে শিশু অবশ্যই উন্নত মানসিকতার অধিকারী হয়। যা তাদেরকে অপরাধের সাথে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখে। এ বিষয়ে সকলেরই আন্তরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) এলাকায় এলাকায় স্কুলে স্কুলে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে শিশু কিশোরদেরকে অন্যায় অসদাচারণ থেকে বিরত থেকে সুন্দর সুষ্ঠু জীবন গঠনের শিক্ষা দেওয়া যায়।

প্রদত্ত শিক্ষা পরবর্তীতে বাস্তব জীবনে ধরে রাখে কিনা এবং অনুসরণ করে কিনা এ বিষয়ে ফলোআপ করা যায়। একার্যক্রমে অসফল অংশের জন্য পুনরায় কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

১৬। মাদকদ্রব্য যুব সমাজকে সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দেয়। দুভাবে এটি হতে পারে। একটি হলো মাদকদ্রব্য গ্রহণে নেশা ও অন্যটি মাদক দ্রব্যের ব্যবসা-

(ক) মাদকদ্রব্য গ্রহণের জন্য যে অঙ্কের টাকার প্রয়োজন, সে পরিমাণ টাকা বৈধভাবে সংগ্রহ করা অনেক যুবকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। তারা হতাশার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বা খারাপ সংসর্গে পড়ে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে সপ্রণোদিত) মাদকাসক্তির কারণে মাদকদ্রব্য ক্রয়ের অর্থ সংগ্রহ করে সন্ত্রাসের পথে। সুতরাং পরিবারের কেউ যাতে মাদকাসক্ত না হয়, সেদিকে প্রত্যেকেরই সচেতন থাকা দরকার।

(খ) মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় ব্যবহৃত হয় যুব সমাজ। উচ্চ অর্থনৈতিক লাভের আশায় অনেক যুবক এই অবৈধ ব্যবসার সাথে জড়িত হয়। আর অন্ধকারের ব্যবসা সেই যুবককে শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসীতে পরিণত করে। এটি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন এ বিষয়ে কঠোরতম আইন প্রণয়ন ও তার যথার্থ প্রয়োগ। সেই সাথে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সরকার ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর সচেতন করা প্রয়োজন; যাতে মানুষজন আত্ম ও সমাজ ধ্বংসকারী সর্বনাশা মাদকদ্রব্য ব্যবহার থেকে নিজে বিরত থাকে এবং অন্যকেও বিরত থাকতে উৎসাহীত করে।

১৭। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর আরও অধিক নিরপেক্ষ, নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সন্ত্রাসী গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব করা সমীচীন নয়। এমন কি কোনো ধরনের সুপারিশের কারণে কোনো সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার ও শাস্তির জন্য আদালতে প্রেরণ থেকে বিরত হওয়া মোটেও সমীচীন নয়। এই বিভাগের প্রত্যেক সদস্যের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, তাদের বেঁচে থাকার ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেবার ও পেশাগত জীবনের উন্নতির সোপান তৈরি করার অর্থের যোগান দেয় জনগণ, কোনো ব্যক্তি-বিশেষ নয়। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই কোনো দল বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ও অন্য কিছুর বিনিময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ধ্বংসকারীকে কোনো অবস্থাতেই ছাড় দেয়া যায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী গঠন করা হয় শুধু সমাজ ও জনগণের শান্তিশৃঙ্খলার নিশ্চয়তা দেবার জন্যই, ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী বিশেষের ক্রীড়নক হওয়ার জন্য নয়।

১৮। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত হওয়া আবশ্যক । একই ভাবে এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত প্রশাসন ও বিচার বিভাগেরও দুর্নীতিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে দুর্নীতিমুক্ত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও উন্নততর কর্ম পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা সন্ত্রাসসহ সব ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে দক্ষতর করাসহ কাজের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের ব্যবহারের যানবাহন, সরঞ্জাম, অস্ত্র প্রভৃতির উন্নয়ন ও আধুনিকতর করা অত্যাবশ্যক। পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণকে সকল সময়ই আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সুতরাং সার্বিকভাবে, আত্মরক্ষার কৌশল ও আক্রমণে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তাদের যোগ্যতর হওয়া প্রয়োজন। পেশাগত সকল দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত দক্ষ করার জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দের জন্য দেশে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১৯। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর কোনো সদস্য যদি কোনো অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়, অপরাধে মদদ যোগায় বা সহযোগিতা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধি-বিধান প্রয়োগ করা যায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০। উন্নত রাষ্ট্রসমূহে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর পেশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পেশা হিসাবে গণ্য করা হয়। এই বিধি-বিধান আমাদের দেশেও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যেহেতু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাজকে অত্যন্ত সম্মানজনক কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়; সেহেতু এই বিভাগে কর্মরত সকল স্তরে বিভিন্ন পদে অধিক শিক্ষিত জনবল নিয়োগের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যে, উন্নত বিশ্বে জনসংখ্যার সাথে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সংখ্যার যে অনুপাত রাখা হয়, আমাদের দেশেও সেই অনুপাত রাখা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে দেশের পুলিশ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে পুলিশের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ১২ হাজার। অর্থাৎ প্রতি ১ হাজার মানুষের নিরাপত্তায় রয়েছে মাত্র ১ জন পুলিশ সদস্য। এদেশের পুলিশরা আবার রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং রাজনীতিবিদের প্রটোকলে ব্যস্ত থাকে, যেখানে সাধারণ নিরাপত্তা ভূলুণ্ঠিত হয়। ভারতে প্রতি ৭৩০ জনের জন্য ১ জন এবং জাপানে ২৫০ জনের নিরাপত্তায় ১ জন করে পুলিশ সদস্য রয়েছে।

২১। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পেশা অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ পেশা। সুতরাং যথার্থ মূল্যায়নের জন্য বিশেষ পেশা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে।

২২। যিনি বা যারাই আইন প্রয়োগ করেন তাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আন্তরিকতা সার্থকভাবে আইন প্রয়োগে সহায়ক হয়। সুতরাং পুলিশের জনগণের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জনের আন্তরিক চেষ্টা করা আবশ্যক। সেই সাথে জনগণেরও অবশ্যই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অহেতুক পুলিশের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা ও বীতশ্রদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় তাদের আইন প্রয়োগে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে; যা শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণে অন্তরায়।

২৩। সন্ত্রাসীরা যাতে সন্ত্রাস করার জন্য কোনো এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে এবং সন্ত্রাস করার পর যাতে এলাকা থেকে বের হয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে

প্রত্যেক এলাকার/মহল্লার প্রবেশ মুখে একটি করে পুলিশ বক্স নির্মাণ ও তাতে সার্বক্ষণিকভাবে পুলিশের উপস্থিতি, দায়িত্ব পালন সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। এছাড়া রাস্তাঘাটে পুলিশের নিয়মিত টহল ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা অত্যাবশ্যক।

২৪। জনগণের নিকট থেকে সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর জনগণকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেয়া আবশ্যক। অন্যথায় জনগণ এই কাজে এগিয়ে আসতে নিরুৎসাহী হতে পারে। ফলে এতদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করা সম্ভব নয় এবং জনগণের নিরাপত্তা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। আইন-শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যবৃন্দের জন্য স্মরণীয়, সদাসর্বদা জনগণের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত যে কোন সমস্যায়ই সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখা তাদের সর্বোচ্চ পেশাগত দায়িত্ব। এটি শুধুমাত্র আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্যই নয় বরং সামাজিক ও মানুষের ব্যক্তিগত অনেক সমস্যা সমাধানের জন্যেও সমান জরুরী। অর্থাৎ একজন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকর্মী অবশ্যই যেন প্রয়োজনে একজন ভাল সমাজকর্মীর দায়িত্বও পালন করেন। আর এভাবেই তাদেরকে প্রস্তুত করা আবশ্যক।

২৫। যে সকল স্থানে অবস্থান করে সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস করে বা সন্ত্রাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে বা আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ যে সকল স্থান অন্ধকার জগত পরিচালনা করার দুর্গরূপে ব্যবহার করে; সে সকল স্থান, সেই সমস্ত দুর্গ ধ্বংস করে দেয়া আবশ্যক। জনগণ এ বিষয়ে সহযোগিতা করলে সরকারি কর্তৃপক্ষ আরও সহজে সার্থক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

২৬। অস্ত্রের লাইসেন্স দেবার সময় কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে প্রণীত আইন অনুসরণের দিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অস্ত্রের লাইসেন্স দেবার সময় আবেদনকারীর উপযুক্ততা বিবেচনা করেই লাইসেন্স দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, প্রভাবশালীর চাপে নত হওয়া, বা নিয়মবহির্ভূত কিছু করা সমীচীন নয়।

২৭। দেশে আগ্নেয়াস্ত্র বা এর সমতুল্য কোনো অস্ত্র আইন বহির্ভূতভাবে তৈরি করা, সংরক্ষণ করা, ব্যবহার ও বহনকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা সার্থকভাবে প্রয়োগ খুবই প্রয়োজন। এই বিষয়ে সকলেরই নিরপেক্ষতা বজায় রাখা দরকার।

২৮। দেশের অবৈধ অস্ত্রের আমদানির উপর সর্বোচ্চ সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। কোনো অবস্থাতেই যেন দেশে অবৈধ অস্ত্র আসতে না পারে। এটি সন্ত্রাসীদের শক্তি বিপুলাংশে কমিয়ে দেয়। যা সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সহায়ক।

২৯। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বিভাগ, প্রশাসন, বিচার বিভাগের ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি অধিকতর দক্ষ করার জন্য উন্নততর পদ্ধতির প্রবর্তন ও অনুসরণ এই বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে। উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন ও অনুসরণ শুধু সন্ত্রাস দমনের স্বার্থে নয়, রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করার জন্যও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রমের উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রচলন করার নিমিত্তে নীতি নির্ধারকগণ আন্তরিকভাবে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

৩০। বিভিন্ন অফিস-আদালতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। আর্থিক লেনদেনের কার্যালয়সমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যেন কোনো ত্রুটি না থাকে। এটি অফিস-আদালতে সন্ত্রাসসহ অন্যান্য ধ্বংসাত্মক অপকর্ম রোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩১। অন্ধ ব্যক্তি যেমন বুঝতে পারে না তার সামনের পথটা কতটা বন্ধুরতা নিয়ে অপেক্ষা করছে, তেমনি একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিরও ভালো, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, বিবেক-বিবেচনা, মানবিক, অমানবিক, হিংস্রতা, পাশবিকতা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের বিষয়ে বোধশক্তি থাকে একেবারে ন্যূনতম ও চরম অনিয়ন্ত্রিত। যার ফলে অশিক্ষিত ব্যক্তিরা সহজে নানারকম কুসংস্কার, ব্যক্তি স্বার্থ, বেঁচে থাকার অবলম্বন ও কোনো ক্ষেত্রে সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে হিংস্রতা ও পাশবিকতার পথ গ্রহণ করে। এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলার জন্য হুমকি হয়ে নিজেদেরকে অন্ধকার সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। তাদের সেই হিংস্রতা পাশবিকতা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আরও শত-সহস্রজনকে ইন্ধন যুগিয়ে ও নিয়ন্ত্রণ করে ধ্বংসের এক বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। যার ফলে বিশাল অঞ্চলের শান্তিশৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যায়, বিপন্ন বিপর্যস্ত হয় বিস্তীর্ণ জনপদ। কখনও সমগ্র রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলাও হুমকির সম্মুখীন হয়। শিক্ষা মানুষকে আলো দেয়; শিক্ষার সে আলো মানুষের জীবন থেকে কুসংস্কার, অপরাধ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রবণতা, অমানবিক আচরণ, সকল পাপ-পঙ্কিলতার অন্ধকার দূর করে সত্য-সুন্দর ন্যায়ের দীপ্তশিখা জ্বেলে দেয়। শিক্ষার আলোতে উদ্দিপ্ত হয়ে মানুষ অর্জন করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার অদম্য মনোবল। শিক্ষার গৌরবের মুকুট ভূলুণ্ঠিত হয়, যদি কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি মানব সভ্যতা ও সমাজ ধ্বংসকারী অন্যায় করার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ না করে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন এবং তার কার্যকলাপ সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। কোনো শিক্ষিত মানুষের পক্ষে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দুরূহতর। কাজেই সমাজ থেকে সন্ত্রাসসহ অন্যান্য রাষ্ট্র রিবোধী কার্যকলাপ দূর করার জন্য সর্বপ্রথম জাতিকে সুশিক্ষিত করা প্রয়োজন। এটি অনস্বীকার্য যে, জাতিকে সুশিক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া সমাজের সকল উন্নয়ন এবং শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার প্রথম ও প্রধান শর্ত। এই শর্ত পূরণে সরকার ও সর্বস্তরের মানুষের সর্বাপেক্ষা আন্তরিক হওয়া

উচিত। আবার একই সাথে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী কোন মানুষ যেন কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সন্ত্রাস করতে না পারে সেদিকে পরিবার থেকে সমাজের সকলেরই সজাগ সচেতন থাকা আবশ্যক। দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষার দিকে অদমনীয় আগ্রহী ও নিষ্ঠাবান করার লক্ষ্যে সমাজসেবা ও শিক্ষা অধিদফতর যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

৩২। ক) অর্থ-সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে আধিপাত্য বিস্তারের জন্য ধর্মীয় উগ্রতা জন্ম হয় এবং সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটায়। কখনও কখনও উগ্রধর্মীয় চিন্তা চেতনা ভয়নকর ও বিপুল সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ হয়। ধর্মীয় উগ্রতা যে দেশে সৃষ্টি হয় সে দেশের সীমা ছাড়িয়ে বহু দেশ জাতিতে এটি প্রভার বিস্তার করে। যা বিশ্ব মানবতাকে ব্যাপক ও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ করে। কাজেই কোথাও যাতে ধর্মীয় উগ্রতা সৃষ্টি না হতে পারে সে দিকে ব্যক্তি, সমাজ নিয়ন্ত্রক এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সতর্ক থাকতে পারেন। এর জন্য প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেকের নিজ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। উল্লেখ্য, কোন ধর্মেই উগ্রতা, হিংস্রতা ও অমানবিক আচরণ সমর্থন করে না। আর এটি না জানার কারণেই ধর্মীয় উগ্রতা বিস্তার লাভ করে, লাভবান হয় ব্যাক্তি ও গোষ্ঠি বিশেষ। এদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয় সাধারণ ও অজ্ঞ মানুষ । উগ্র ধর্মীয় চিন্তা চেতনা যাতে সৃষ্টি না হয় এবং বিস্তার লাভ না করতে পারে সে লক্ষ্যে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ সকল ধর্মীয় উপসনলায়ে ধর্মীয় আচার - অনুষ্ঠান পালণ করা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে গোড়ামীমুক্ত ধর্মীয় বিধি নিষেধ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে নিজের ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহৃত হতে না দেওয়া, হিংসা-বিদ্বেষ, হিংস্রতা, পাশবিকতা, বর্বরতা পরিহার করে সুন্দর-সুশৃঙ্খল, সৌহার্দপূর্ণ জীবনযাপন করা, পারিবারিক, সামাজিক দায়িত্ব পালন করা এবং মানুষের আদর্শ অনুসরণ করা শিক্ষা দেওয়া যায়। অন্য ধর্মের উপসনালয় ও অন্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যথার্থ সম্মান করা এবং এতে বিঘ্নতা সৃষ্টি না করা শিক্ষা দেওয়াও জরুরী । আবার আধিপাত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ধর্মের প্রতি মানুষের অনুরাগ ব্যবহারে ধর্মীয় অনুশাসন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান দেওয়া এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলার বিষয় ধর্মের আলোকে শিক্ষা দেওয়া যায়। এসকল শিক্ষা ধর্মীয় কারণে সন্ত্রাস সৃষ্টি ও বিস্তৃত না হওয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এলক্ষ্যে ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহ শুধু মাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য ব্যবহার না করে প্রকৃত ধর্মীয় জীবন ও মানবিক গুনাবলী অর্জন শিক্ষা দেওয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা যায়। মানুষের ধর্মীয় অনুভুতি কাজে লাগিয়ে যেমন চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস জন্ম দেওয়া যায় তেমনি আবার ধর্মীয় অনুভুতি কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় পর্যায়ে এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ বহুবিধ বিষয়ে সর্বোচ্চ উন্নতি করা যায়। কাজেই সন্ত্রাসমুক্ত, সুন্দর, শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ নিরাপদতর দেশ, মহাদেশ ও বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে সকলেরই ধর্মীয় অনুভূতির সঠিক ও মানবিক ব্যবহারে আন্তরিক হওয়া বাঞ্চনীয়। একই সাথে ধর্মীয় অনুভুতির সুযোগে যে বা যারা বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া অত্যাবশ্যক। সাধরণত যারা ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশোনা করেন তাদের মধ্যেই ধর্মীয় উগ্র চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপ সৃষ্টি হয় (সময়ে ব্যতিক্রম হতে পারে)। এটি রোধ করার জন্য সকল ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এর বিধ্বংসী সম্ভাবনা মানসিকতা সৃষ্টিকারী বিষয় দূর করা প্রয়োজন (যদি থাকে)। ধর্ম আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবন এবং সম্পদ ধ্বংস করার জন্য অবতীর্ণ হয় নি। বরং মানুষের জীবন রক্ষা ও আল্লাহ্‌/ঈশ্বরের মহীমা প্রকাশের জন্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে; এটি দৃঢ়ভাবে সকলের মনে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ধর্মের নামে উগ্রতা, হিংস্রতা ও অমানবিক আচরণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন ও পূর্বে প্রণয়নকৃত আইনের সংশোধন করা যায়। আর তা বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নাই। আন্তর্জাতিক পদক্ষেপেও এটি রোধ করা সমান জরুরী। নিচে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিক কালে উগ্রধর্মীয় কারণে সংঘটিত কিছু সন্ত্রাসের চিত্র উল্লেখ করা হলো:

(১) গত ১৯৯৯ সালে যশোরে উদীচীর লোকজ উৎসবে সন্ত্রাসের কারণে ২৫০ জন আহত, ১৫০ জন পঙ্গু এবং ১০ জন নিহত হয়।
(২) ২০০1 খ্রিস্টাব্দে রাজধানী ঢাকার রমনা বটমূলে বৈশাখ বরণ অনুষ্ঠানে জঙ্গিরা ভয়াবহ বোমা হামলা চালিয়েছিলো। বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক চেতনার মূলে আঘাত করতে মৌলবাদী গোষ্ঠী এ হামলা চালিয়েছিলো বলে পরে তদন্তে প্রকাশিত হয়। এ বোমা হামলায় ১০ জন মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করে। আহত হয় বহু মানুষ।
(৩) গত ২০০৮ সালে ২৬ নভেম্বর তারিখে ভারতের মুম্বাইতে তাজ হোটলে ও অন্যান্য স্থানে সন্ত্রাসের কারণে ১৬৪ জন নিহত হয়।
(৪) সম্প্রতি ইরানের রাজধানী তেহরানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই স্থাপনা দেশটির পার্লামেন্ট ও ইসলামী বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ্‌ রুহুল্লা খোমেনির মাজারে আলাদাভাবে জঙ্গী হামলা হয়েছে। এ হামলায় ৪২ জন আহত ও ১৩ জন নিহত হয়েছে।
(৫) গত ২০১৯ সালে ১৫ মার্চে নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে ২ টি মসজিদে সংঘটিত সন্ত্রাসে ৪৯ জন প্রাণ হারায়।

(৬) ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। স্পেনের বার্সিলোনা ও ক্যামব্রিলস্ এ কয়েক ঘন্টা পরপর সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। বার্সিলোনার জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা লাস র‍্যামব্লাসে পথচারীদের উপরে গাড়ি উঠিয়ে দিয়ে ১৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে। একইভাবে ক্যাব্রিলস্সেও সন্ত্রাস ঘটানো হয়। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন ও যুক্তরাজ্যে কয়েকদফা সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে ফিনল্যান্ডেও। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্র বিমানবন্দর ও মেট্রোস্টেশনে একযোগে ৩টি সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। এ সকল সন্ত্রাসী হামলায় বহু মানুষ হতাহত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের এসকল নির্মম হিংস্র ও বর্বর কার্যকলাপে বিশ্বের মানুষ স্থম্ভিত, ব্যথিত ও ক্ষুদ্ধ। ক্ষুদ্র বৃহৎ যে পর্যায়ে সন্ত্রাস পরিচালিত হোক না কেন সাধারণ মানুষকেই তার চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয়। মানুষ একবারের জন্যই জীবন পায়। সে জীবন সন্ত্রাসের শিকার হয়ে অকালে ঝরে না যায় বিশ্ববাসী সেটিই প্রত্যাশা করে। সন্ত্রাসবাদ মানবতার শত্রু হিসাবেই শনাক্তহয়। বিশ্বের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সব সময়ই সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। বিশ্ব নেতাদের কর্তব্য হলো পৃথিবী নামক এ গ্রহ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য সম্মিলিত ভাবে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া, সন্ত্রাস জন্ম দেয়া, পালন করা ও উস্কে দেয়া নয়। ধর্মের নামে দেশে দেশে সন্ত্রাস সংঘটনকারীদের যে কোন মূল্যে রোধ করা আবশ্যক।

৩৩। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদ অন্য সম্প্রদায় ও অন্য জাতিকে চরম অবমূল্যায়ন করতে শিক্ষা দেয়। এ উগ্রতার কারণে মানুষে মানুষে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ও জাতিতে জাতিতে হিংসা, হানাহানি, জিঘাংসা সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। বিশাল-বিপুলভাবে সন্ত্রাস বিস্তার লাভ করে। একক সত্তা, বহু সত্তা এমনকি শত সহস্র মানব সত্তা জীবন হানি ঘটে। স্থানীয়, জাতীয়, এমনকি বৈশ্বিক শান্তি-শৃঙ্খলা হুমকীর সম্মুখীন হয়। অতীতে উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের কারণে বহু বড় বড় রক্তক্ষয়ী, বহু জীবন ও বিপুল সম্পদ ধ্বংসকারী যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ- নাৎসী জার্মানীদের উগ্র জাতীয়তাবাদের কারণেই প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছে সামরিক ও বেসামরিক মিলিয়ে যথাক্রমে ১,৫৫,৯৬,০৭৯ জন। আহত হয়েছে ২,২৩,৭৯,০৫৩ জন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা সামরিক বেসামরিক মিলিয়ে প্রায় ৫ কোটি। কারও কারও মতে এমৃতের সংখ্যা ৮.৫ কোটি পর্যন্ত হতে পারে। আহতের সংখ্যা মৃতের সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি এবং অসংখ্য মানুষ, স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদ যাতে জন্ম না নেয় এবং বিস্তার লাভ না করে সে লক্ষ্যে নিজ জাতির ইতিহাস ও অন্যান্য জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য জানা এবং নিজ জাতি ও অন্যান্য সকল দেশ জাতির প্রতি দায়িত্ববোধ মানবিক আচরণ শিক্ষা দেয়া উগ্র জাতীয়তাবাদের কারণে সন্ত্রাস ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস সষ্টি না হওয়ার জন্য এবং নিয়ন্ত্রণে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আবার যাতে এ প্রবণতা কোন মানুষ ও নেতৃত্বের মধ্যে সৃষ্টি ও বিস্তার লাভ না করে সেদিকে সকল স্তরের মানুষের নজর রাখা বাঞ্চনীয়। এ সন্ত্রাস সময়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভয়াবহ সমস্যায় পরিণত হয়। কাজেই উগ্র সাম্প্রদায়িতকা ও জাতীয়তাবাদ যাতে সৃষ্টি না হয় এবং বিস্তার লাভ না করে সেজন্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপেরও খুবই প্রয়োজন।

তথ্য সংগ্রহ, সমার্থক সংবাদ প্রকাশ এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ-

১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ — লেখক: সাহাদত হোসেন খান।
২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — লেখক: ভিক্তর মাওসুলেনকো, রূপান্তর: ফারুক নেওয়াজ।
৩) গুগল, ফেস বুক
৪) দৈনিক জনকণ্ঠ — তারিখঃ- ২০/০৮/২০১৭ খ্রি.
৫) বাংলাদেশ প্রতিদিন — তারিখঃ- ২৭/০৪/২০১৮ খ্রি.
৬) দৈনিক জনকণ্ঠ — তারিখঃ- ২৯/০৭/২০১৮ খ্রি.
৭) দৈনিক জনকণ্ঠ — তারিখঃ- ২৭/০১/২০১৯ খ্রি.
৮) সময় সংবাদ — তারিখঃ- ০৪/১২/২০১৯ খ্রি.
৯) দৈনিক জনকণ্ঠ — তারিখঃ- ০২/০৩/২০২০ খ্রি.
১০) দৈনিক জনকণ্ঠ — তারিখঃ- ০৭/০৬/২০২২ খ্রি.
১১) দৈনিক জনকণ্ঠ — তারিখঃ- ২৯/০৫/২০১৯ খ্রি.
১২) সময় টিভি — তারিখঃ- ০৪/১২/২০১৯ খ্রি.

সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রকৌশলী মো. রুহুল আমীন ১৯৬৪ খ্রি. ২৯ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল শহরস্থ প্যাড়াডাইস পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা- মরহুম মো. মতিউর রহমান বিন্দুবাসিনী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল এর একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। মাতা- মরহুম মোসা. রোকেয়া খাতুন সুগৃহিণী ছিলেন। মাতামহ ও পিতামহ যথাক্রমে আলহাজ মরহুম মো. হোসেন আলী ও মরহুম মৌ. আহাম্মদ আলী উচ্চ শিক্ষিত, আধ্যাত্মিক জ্ঞানী ও সাধক পুরুষ ছিলেন। প্রকৌশলী মো. রুহুল আমীন টাঙ্গাইল শহরেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) ও উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় তিনি যথাক্রমে ১ম ও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিপ্লোমা) এ ১ম শ্রেণি অর্জন করেন। শিক্ষা শেষে কিছুদিন ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। সমাজসেবা অধিদফতরের অধীনে সরকারি চাকরি প্রাপ্ত হয়ে অদ্যবধি কর্মরত আছেন। তিনি আই.ডি.ই.বি, গাজীপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও টঙ্গী ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি সংগঠন, সংস্কৃতি ও জনকল্যাণমূলক কাজে আগ্রহী ছিলেন। বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিন্তাভাবনা করছেন। তার চিন্তার বিশেষ দিক হল- সমাস্যা নিয়ে নয়, সমাধান এর বিষয় বেশি ভাবতে হয়। সমকালীন সমস্যা ও সমাধান তাঁর লেখা ও প্রকাশিত ১ম গ্রন্থ। উন্নয়ন ভাবনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ তার লেখা ও প্রকাশিত ২য় গ্রন্থ। তার লেখা ও প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থ ধর্মীয় বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা। পতিতাবৃত্তি : সমস্যা কারণ ও প্রতিকার তার রচিত চতুর্থ গ্রন্থ। তার লেখা পঞ্চম গ্রন্থ উন্নয়নশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। পেশাগত দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি তিনি লেখার কাজ সম্পন্ন করেছেন। বিবাহিত জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক। স্ত্রী কানিজ তাহ্‌মিনা, পুত্র- মো. আমীন শাহ্‌রিয়ার (তাজরিয়ান), কন্যা- তানজি্লা তাবাস্‌সুম (অনন্যা) সহ টাঙ্গাইল শহর উপকন্ঠ পাড়দিঘুলীয়ায় বসবাস করছেন।

মোবাইল নং- ০১৭১৫৩২৬৫৩৬, ০১৯৬৫০৩০৪১০।